ব্যাচেলর অব এডুকেশন

রসায়ন শিক্ষণ

Teaching Chemistry

EDBN 1423

রচনা

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী
মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম
বিমলেন্দু ভৌমিক
মোঃ আব্দুস সামাদ মণ্ডল
জোবেদা বেগম
জেসমিন নাহার

মূল্যায়ন

অধ্যাপক ড. আবুল এহসান
ড. মোঃ মমিনুল ইসলাম
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

সম্পাদনা

অধ্যাপক মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

স্কুল অব এডুকেশন

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

রসায়ন শিক্ষণ
EDBN 1423
বিএড প্রোগ্রাম

প্রধান সমন্বয়ক
মোঃ জহির উদ্দিন বাবর
প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট-২ (টিকিউআই-২) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

সমন্বয়ক
রায়হানা তসলিম, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. রেহেনা খাতুন, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
কাজী সাখাওয়াৎ হোসেন, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রিজওয়ানুল হক, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প

সহযোগিতায়
প্রফেসর মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
ড. সুধাংশু রঞ্জন রায়, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
আবু সাঈদ মজুমদার, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
রওশন আরা বেগম, সহকারী প্রকল্প পরিচালক (প্রশিক্ষণ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
মাকসুদা বেগম, প্রকল্প কর্মকর্তা (প্রশাসন ও অর্থ), টিকিউআই-২ প্রকল্প
গাজী মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন, হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, টিকিউআই-২ প্রকল্প

গ্রন্থস্বত্ব
শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গ্রন্থস্বত্ব সংরক্ষিত। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের লিখিত অনুমতি ব্যতীত এ বইয়ের সম্পূর্ণ বা আংশিক মুদ্রণ, পুনঃমুদ্রণ সংশোধিত আকারে প্রকাশ ও বিক্রয় নিষিদ্ধ। এ ক্ষেত্রে কপিরাইট আইন প্রযোজ্য। তবে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণামূলক কার্যক্রমে এ বই ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রথম মুদ্রন: ডিসেম্বর ২০১৮
পুন:মুদ্রন: মার্চ ২০২০

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফদ্দীন আব্বাস

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর– ১৭০৫।

(স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৮২.১৪.০০৫.১৮.১০০ তারিখ: ৩১ জুলাই ২০১৯ ইংরেজি, ১৬ শ্রাবণ ১৪২৬ বাংলা অনুযায়ী অনুমোদনক্রমে TQI-II প্রকল্পের আওতায় প্রণীত জাতীয় বিএড প্রোগ্রামের পাঠ্যপুস্তক বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পুন:মুদ্রন করা হলো।)

ISBN: 978-984-34-0113-7

মুদ্রণে:

সূচিপত্র

ইউনিট	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
ইউনিট-১	**রসায়ন এবং রসায়ন শিক্ষা**	**০১-১৫**
১.১	বিজ্ঞান ও রসায়নের ধারণা ও প্রকৃতি, রসায়নের কাজ, গুরুত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক	০১
১.২	বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও রসায়ন শিক্ষা	০৭
১.৩	রসায়ন শিক্ষায় অনুসন্ধান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ	১১
ইউনিট-২	**মাধ্যমিক পর্যায়ে রসায়ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক**	**১৬-২৩**
২.১	শিক্ষাক্রমে রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও ফোকাস	১৬
২.২	রসায়ন পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য	২০
ইউনিট-৩	**সামাজিক গঠনবাদের আলোকে রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল**	**২৪-৩২**
৩.১	ধারণা পরিবর্তন মডেল, ব্রেইনস্টর্মিং, ধারণা মানচিত্র	২৪
৩.২	ধারণা পরিবর্তন মডেল অনুসারে শিখন-শেখানো কৌশল : মাইন্ডম্যাপিং, ৫ই, পি ও ই	২৮
৩.৩	সহযোগিতামূলক শিখন, রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনে শিক্ষার্থীর ভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা বিবেচনা	৩০
ইউনিট-৪	**পাঠ পরিকল্পনা ও শিখন মূল্যায়ন**	৩৩-৪২
৪.১	একক (ইউনিট) পরিকল্পনা - প্রয়োজনীয়তা ও প্রণয়নের ধাপসমূহ, গঠনবাদের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা - তত্ত্বীয় রসায়ন	৩৩
৪.২	ব্যবহারিক রসায়ন পাঠ পরিকল্পনা, পি সি কে এর ধারণা, পেশাগত শিখন : লেসন স্টাডি, প্রতিফলনমূলক অনুশীলন	৪০
৪.৩	তত্ত্বীয় রসায়ন শিখন মূল্যায়ন - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন	৪৫
৪.৪	রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি	৪৮
৪.৫	ব্যবহারিক রসায়নের শিখন মূল্যায়ন - মনোপেশিজ ও আবেগিক শিখন মূল্যায়ন	৪৯
ইউনিট-৫	**পরমাণুর গঠন, পর্যায় সারণি ও রাসায়নিক বন্ধন**	**৫৩-৭৮**
৫.১	পরমাণুর ধারণার বিকাশ	৫৩
৫.২	রাদারফোর্ড ও বোরের পরমাণু মডেল	৫৬
৫.৩	পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস	৫৯
৫.৪	আধুনিক পর্যায় সারণির ভিত্তি	৬২
৫.৫	মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম	৬৫
৫.৬	নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও এদের স্থিতিশীলতা :	৭১
৫.৭	রাসায়নিক বন্ধন	৭৩
৫.৮	সমযোজী বন্ধন ও ধাতব বন্ধন	৭৫
ইউনিট-৬	**রাসায়নিক গণনা**	**৭৯-৯৩**
৬.১	প্রতীক ও সংকেত	৭৯
৬.২	রাসায়নিক সমীকরণ	৮৩
৬.৩	যৌগের শতকরা সংযুক্তি থেকে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয়	৮৭
৬.৪	মোল (mole)-এর ধারণা	৮৯
৬.৫	বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতি	৯২

ইউনিট-৭	**রসায়ন শিখনে ব্যবহারিক কাজ**	**৯৪-১০৩**
৭.১	রসায়নের ব্যবহারিক কাজের লক্ষ্য ও শিখন এবং ব্যবহারিক কাজে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন	৯৪
৭.২	ব্যবহারিক কাজে অনুসন্ধানের মডেল, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুসারে নমুনা অনুসন্ধান	৯৭
৭.৩	ব্যবহারিক কাজের জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার	৯৯
ইউনিট-৮	**রসায়ন শিখন-শেখানোর উপকরণ**	**১০৪-১১৩**
৮.১	শিক্ষা উপকরণের ধারণা ও প্রকারভেদ, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের নীতি	১০৪
৮.২	স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের উপকরণ তৈরি, সংগ্রহ, ব্যবহারের মূল্য ও উপকরণ সংরক্ষণের নীতি ও কৌশল	১০৮
৮.৩	রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে তথ্য প্রযুক্তি	১১০
ইউনিট-৯	**শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানো**	**১১৪-১২১**
৯.১	শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর ধারণা, ক্ষেত্র ও প্রয়োজনীয়তা	১১৪
৯.২	শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিচালনা	১১৮
ইউনিট ১০	**জৈব রসায়ন পরিচিতি**	**১২২-১৬২**
১০.১	জৈব যৌগ, জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ ও কার্যকরী মূলক পরিচিতি	১২২
১০.২	হাইড্রোকার্বন- শ্রেণিবিভাগ, প্রস্তুতি, ধর্ম ও এদের ব্যবহার	১২৮
১০.৩	পেট্রোলিয়াম ও উপাদানসমূহ এবং এদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এর যথাযথ ব্যবহার	১৪০
১০.৪	অ্যালকোহল	১৪৬
১০.৫	কার্বনিল ও কার্বক্সিলিক যৌগ	১৫১
১০.৬	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন	১৬২
	তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি	**১৬৯-১৭০**

ইউনিট ১ : রসায়ন এবং রসায়ন শিক্ষা

বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। বিজ্ঞানের অন্যতম প্রধান একটি শাখা রসায়ন । রসায়ন মূলত পদার্থের গঠন ও গুণাবলি এবং এর সাথে শক্তির সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান। রসায়ন আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যালয় পর্যায়ে আমরা বিজ্ঞান ও রসায়ন শেখাই মূলত দু'টি লক্ষ্যে - শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সাক্ষরতাসম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যতে রসায়ন সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান পড়ার জন্য তাদের ভিত্তি শক্তিশালী করা। এ দু'টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য রসায়নের তত্ত্ব, তথ্য ও ধারণা শেখানোর পাশাপাশি শিক্ষার্থীকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ শেখানো দরকার। এ অধ্যায়ে আমাদের আলোচ্য বিষয় বিজ্ঞান ও রসায়ন কী এবং কীভাবে কাজ করে, বিজ্ঞানের জ্ঞান ও প্রক্রিয়ার প্রকৃতি, রসায়নের গুরুত্ব, বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও রসায়ন শিক্ষা এবং বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে রসায়নের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ শিখন-শেখানো। এই আলোচ্য বিষয়সমূহকে নিম্নরূপে সাজানো হয়েছে–

১.১ বিজ্ঞান ও রসায়নের ধারণা, রসায়নের কাজ, গুরুত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক
১.২ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও রসায়ন শিক্ষা
১.৩ রসায়ন শিক্ষায় অনুসন্ধান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ

১.১ বিজ্ঞান ও রসায়নের ধারণা, রসায়নের কাজ, গুরুত্ব ও অন্যান্য বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

বিজ্ঞান কী?

আপনারা বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বলতে কী বুঝে থাকেন? বিশেষ জ্ঞান বা বিশেষায়িত জ্ঞান? আপনারা কি মনে করেন, এভাবে বিজ্ঞান শব্দের অর্থের মাধ্যমে বিজ্ঞান কী তা বোঝা যায়? নবাব শায়েস্তা খাঁ-এর শাসন আমল সম্পর্কিত জ্ঞানও তো এক ধরনের বিশেষ জ্ঞান; তাই বলে কি এ জ্ঞান বিজ্ঞান বলে স্বীকৃত? এ জ্ঞানকে তো আমরা ইতিহাস বলে জানি।

প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। যা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত। এসিড বৃষ্টি কীভাবে হয় এ সম্পর্কিত জ্ঞান হলো বিজ্ঞানের জ্ঞানের উদাহরণ। কারণ এটি প্রকৃতিতে ঘটা কোনো ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান। বিজ্ঞানকে তা হলে সংক্ষেপে কী বলা যায়? **বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত**। অথবা এভাবেও বলা যায় যে, **বিজ্ঞান হলো পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রাপ্ত বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত জ্ঞান যার দ্বারা প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলিকে বোঝা যায় ও ব্যাখ্যা করা যায়।**

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া রয়েছে। বিজ্ঞানীরা যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানেন তাকে আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান বলে থাকি।

বিজ্ঞানের জ্ঞান ও অনুসন্ধানের প্রকৃতি

বিজ্ঞান কী- এই বিষয়ের আলোচনায় আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞানের জ্ঞান হলো পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বা পরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত জ্ঞান। অর্থাৎ পরীক্ষা বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তবে বিজ্ঞান সব সময় পরীক্ষার উপর নির্ভর করে না। বিজ্ঞানের জ্ঞান নানা উপায়ে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের জ্ঞান ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়ার তিনটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো (ক) বিজ্ঞানের জ্ঞানের কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি রয়েছে, (খ) বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে নির্দিষ্ট কিছু উপায় রয়েছে এবং (গ) বিজ্ঞানের জ্ঞানের অনুসন্ধানকারী বৈজ্ঞানিকদের একটি কমিউনিটি রয়েছে যারা বিজ্ঞানের জ্ঞানের যাচাই-বাছাই ও স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা এখন উপরিউক্ত তিনটি বিষয়ে আলোচনা করবো।

(ক) বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রকৃতি

বিজ্ঞানের জ্ঞানের কতকগুলো প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান শিক্ষা গবেষক, দার্শনিক ও বিজ্ঞান ইতিহাসবিদগণ একমত পোষণ করে থাকেন। বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি স্বরূপ বা প্রকৃতি (Nature of Science) নিম্নে আলোচনা করা হলো–

- **বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পর্যবেক্ষণলব্ধ (empirical) ভিত্তি :** রসায়নসহ বিজ্ঞানের সকল জ্ঞান প্রকৃতিজগত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্য-প্রমাণের (Empirical data and evidence) ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের জ্ঞান কারও কল্পনা বা স্বপ্ন থেকে পাওয়া কিছু নয়, কোনো অভিমত নয়, কোনো ব্যক্তি বা সত্ত্বার তৈরিকৃত নির্দেশাবলিও নয় কিংবা কোনো গণকের ভবিষ্যদ্বাণীও নয়। বিজ্ঞানের বেশির ভাগ জ্ঞান সরাসরি ও পুরোপুরি পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য-প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে অর্জিত। যেমন– খাবার লবণকে পানিতে মেশালে তা পুরোপুরি দ্রবীভূত হয় - এই জ্ঞানটুকু সরাসরি পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য থেকে প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের কিছু জ্ঞান প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করে পাওয়া। অর্থাৎ এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্য পরোক্ষভাবে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সমর্থন করে। যেমন- পদার্থের গাঠনিক একক পরমাণু। পরমাণুতে ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে। ইলেকট্রন খালি চোখে বা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা যায় না। কিন্তু ইলেকট্রনের অস্তিত্ব বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ তথ্য থেকে পরোক্ষভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। একইভাবে বিবর্তনবাদের জ্ঞান প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সরাসরি প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, কারণ কয়েক মিলিয়ন বছর ধরে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত জীবাশ্ম বিশ্লেষণ করে এবং প্রকৃতিতে একই ধরনের জীব পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়।

- **বিজ্ঞানের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যার (Inference) ফসল :** বিজ্ঞান শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জানা দরকার যে, বিজ্ঞানের জ্ঞান পর্যবেক্ষণ ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যার দু'টিরই ফসল। পর্যবেক্ষণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মৌলিক ধাপ। পর্যবেক্ষণ হলো আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহে (কখনও প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে) যা ধরা পড়ে। তবে যা আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহে ধরা পড়ে তার অর্থ বা কারণ বুঝতে হয়। পর্যবেক্ষণে যা ধরা পড়ে তার সম্ভাব্য কারণ বা ব্যাখ্যা হলো সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। যেমন আপনি সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ যোগ করলেন। টেস্টটিউবে সাদা অধঃক্ষেপ পড়ল। এটি আপনার পর্যবেক্ষণ। কিন্তু সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বা **Inference** হলো এখানে সিলভার ক্লোরাইড তৈরি হয়েছে যা পানিতে অদ্রবণীয়। ফলে অধঃক্ষেপ তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানে শুধু পর্যবেক্ষণ করলেই হয় না, পর্যবেক্ষণ থেকে একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তৈরি করা হয়। পরবর্তীতে আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাটিকে নিশ্চিত করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
- **বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র :** বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্র বিজ্ঞানের জ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীদের আরও জানা দরকার যে, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও সূত্রের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বিজ্ঞানীরা পর্যবেক্ষণলব্ধ তথ্যের মধ্যে বিভিন্ন সম্পর্ক ও প্যাটার্ণ খোঁজেন। বৈজ্ঞানিক সূত্র হলো পর্যবেক্ষণযোগ্য দুটি বিষয়ের মধ্যে সম্পর্ক বা নির্ভরশীলতা নিয়ে একটি বিবৃতি। অপরদিকে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব পর্যবেক্ষণযোগ্য বিভিন্ন বিষয়কে ব্যাখ্যা করে। যেমন, *স্থির তাপমাত্রায় কোনো গ্যাসের আয়তন কমালে তার চাপ বাড়ে* - এটি একটি সূত্র (বয়েলের সূত্র)। কারণ এটি কেবল গ্যাসের আয়তনের সাথে চাপের সম্পর্ক বিবৃত করেছে। কিন্তু কেন আয়তন কমালে চাপ বাড়ে তা ব্যাখ্যা করে কোনো একটি তত্ত্ব (গ্যাসের গতিতত্ত্ব)। গাসের গতিতত্ত্ব কেবল চাপ ও আয়তনের সম্পর্ক নয়, অন্যান্য বিষয় যেমন চার্লসের সূত্রকেও ব্যাখ্যা করতে পারে।
- **বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিবর্তনশীলতা বা প্রগতিশীলতা :** বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অপরিবর্তনীয় নয়; বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব, সূত্র ও তথ্য নতুন তথ্য- প্রমাণের ভিত্তিতে পরিবর্তিত হতে পারে। নতুন প্রযুক্তি ও তত্ত্ব ব্যবহারের ফলে বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্য ও প্রমাণ পান, কখনও কখনও পুরনো উপাত্ত নতুন করে বিশ্লেষণ করে নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাই আমরা বিজ্ঞানের ধারণা পরিবর্তিত হতে দেখি। তবে এ পরিবর্তন খুব ঘন ঘন বা সহজে হয় না। বিজ্ঞানের জ্ঞান যেহেতু তথ্য ও প্রমাণের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, তাই এই জ্ঞান অন্য যে কোনো ধরনের জ্ঞান, মতামত বা বিশ্বাসের চেয়ে বেশি নির্ভরযোগ্য। আরও একটি বিষয় মনে রাখা দরকার যে, বিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব বিজ্ঞানের ধারণা পড়ানো হয়, তা অনেকটা অপরিবর্তনীয়। এসব বিষয় অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা যাচাই-বাছাইয়ের পর সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়েছে।

(খ) বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য বিজ্ঞানীরা নির্দিষ্ট কিছু প্রক্রিয়া অনুসরণ করে থাকেন। আমাদের মাঝে একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান মানেই কোনো কিছু নিয়ে একটি হাইপোথিসিস বা অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তারপর পরীক্ষণের মাধ্যমে সেই হাইপোথিসিসটি যাচাই করা হয়। আসলে ধারণাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। এ ধরনের পরীক্ষণ বিজ্ঞান অনুসন্ধানের একটি প্রক্রিয়া। অনেক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রয়েছে যেখানে পরীক্ষণ পদ্ধতির দরকার হয় না। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানসমূহকে সাধারণভাবে তিন ভাগে ভাগ করা যায় (Lederman & Lederman, 2004)।

- **বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি :** বর্ণনামূলক গবেষণা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রথম পর্যায়ে হয়ে থাকে। বিজ্ঞানীরা এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে একটি বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের অথবা সমস্যার সমাধানের জন্য তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। যেমন– যেমন ঢাকা শহরে বিক্রি হওয়া শাকসবজিতে কী পরিমাণ লেড বা সীসা রয়েছে তা জানার জন্য বিভিন্ন বাজার থেকে শাকসবজি সংগ্রহ করে মেপে দেখা হলো তাতে কী পরিমাণ সীসা রয়েছে। এ ধরনের গবেষণা বর্ণনামূলক গবেষণা বা অনুসন্ধান।

- **সহ-সাম্পর্কিক গবেষণা (Co-relational research) :** এ ধরনের গবেষণায় সাধারণত দুটি চলক বা নিয়ামকের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে। নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণের সাথে আর্সেনিকোসিস রোগের সম্পর্ক বোঝার জন্য কি করা যেতে পারে? একজন মানুষকে আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করিয়ে দেখা হবে মানুষটি আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয় কি না? না। যেটা করা হয় তা হলো বিভিন্ন নলকুপের পানিতে আর্সেনিক পরিমাপ করা হয় এবং ঐ নলকূপসমূহের পানি ব্যবহারকারীদের পর্যবেক্ষণ করা হয়। হয়তো দেখা যাবে যে, যে সকল মানুষের আর্সেনিকোসিস রোগ হয়েছে তারা বেশি আর্সেনিকযুক্ত পানি পান করেছে। এরকম গবেষণাতে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে তুলনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়েছে; এ ধরনের গবেষণা **সহ-সাম্পর্কিক গবেষণা**।

- **পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental method) :** বিজ্ঞান গবেষণায় পরীক্ষণ পদ্ধতি একটি গুরূত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একজন বিজ্ঞানী কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য প্রথমে জানা/বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চেষ্টা করেন পরীক্ষণের মাধ্যমে ঐ অনুমিত সিদ্ধান্তটি ঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করা। কোনো হাইপোথিসিস যাচাই করার জন্য বিজ্ঞানীরা যেটি করেন তা হলো কোনো নিয়ামক/চলক পরিবর্তন করে এ পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করেন। এটিই পরীক্ষণ। পরীক্ষণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় যে অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা আবার যাচাই করেন। কখনও কখনও বিজ্ঞানীরা অনুমিত সিদ্ধান্ত পরিবর্তন না করে নতুন পরীক্ষণের মাধ্যমে সমাধান বের করেন। পরীক্ষণ পদ্ধতিতে একজন গবেষক অবশ্যই বাকি সব চলক স্থির রেখে কোনো একটি চলক পরিবর্তন করে এ পরিবর্তনের প্রভাব নির্ণয় করেন। উপরে বর্ণিত দু'ধরনের গবেষণার চেয়ে পরীক্ষণের মূল পার্থক্য হলো বর্ণনামূলক ও সহ-সাম্পর্কিক গবেষণায় গবেষক কোনো কিছু পরিবর্তন করেন না, কেবল বিদ্যমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ বা পরিমাপ করেন; কিন্তু পরীক্ষণে গবেষক একটি চলক পরিবর্তন করে তার প্রভাব লক্ষ করেন। যেমন– অ্যামোনিয়া উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব কী তা বোঝার জন্য একজন গবেষক চাপ ও অন্যান্য চলক স্থির রেখে শুধু তাপমাত্রা পরিবর্তন করে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উৎপাদের পরিমাণ নির্ণয় করে দেখেন যে, তাপমাত্রা পরিবর্তনে উৎপাদের পরিমাণ কমে বা বাড়ে কিনা।

(গ) বৈজ্ঞানিক কমিউনিটি ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি

বৈজ্ঞানিক কমিউনিটি : প্রকৃতি কিংবা প্রাকৃতিক ঘটনাবলি সম্পর্কে জানতে বিজ্ঞানীরা কি এককভাবে কাজ করেন না দলগতভাবে কাজ করেন? এককভাবে কাজ করলেও একজন বিজ্ঞানী কি অন্যের কাজের ওপর নির্ভর করেন? করলে কীভাবে বা কতুটুকু নির্ভর করেন? বিজ্ঞানের নানা আবিষ্কারের সাথে আমরা ব্যক্তি বিজ্ঞানীর নামের কথা শুনলেও বিজ্ঞানের গবেষণা বর্তমানে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দলগতভাবে হয়ে থাকে। কখনও কখনও বিজ্ঞানীদের একাধিক দল একটি নির্দিষ্ট সমস্যা নিয়ে কাজ করেন। আবার কোনো কোনো বিজ্ঞানী এককভাবে কাজ করলেও তিনি অন্য বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ জ্ঞান ব্যবহার করে অগ্রসর হন। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা বর্তমানে একে অপরের উপরে নির্ভর করেই বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এগিয়ে নেন। একে অপরের সহযোগিতার উপর বর্তমানে বৈজ্ঞানিক কাজের সফলতা নির্ভর করে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের স্বীকৃতি : একজন বা একদল বিজ্ঞানী বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান থেকে নতুন জ্ঞান আবিষ্কার করলে সাথে সাথেই তা বৈজ্ঞানিক সমাজে বা কমিউনিটিতে স্বীকৃত বা গৃহীত হয়ে যায় না। অন্যান্য বিজ্ঞানীরা নতুন জ্ঞানটিকে নিরীক্ষা করে দেখেন। দেখেন যে, নতুন জ্ঞানটি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্জিত হয়েছে কিনা, নতুন জ্ঞানটির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ আছে কিনা, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানটির ফলাফলের পুনরাবৃত্তি ঘটানো যায় কিনা। বৈজ্ঞানিক সমাজ যখন নিশ্চিত হন যে, বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞানটি যথাযথ বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় হয়েছে, এটির যথেষ্ট পরীক্ষালব্ধ ভিত্তি রয়েছে তখন নতুন জ্ঞানটি স্বীকৃতি লাভ করে।

রসায়ন ও রসায়নের কাজ

প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞানকে আমরা নানা শাখায় ভাগ করতে পারি। সাধারণভাবে বিজ্ঞানকে বড় দু'টি ভাগে ভাগ করা হয় - জীববিজ্ঞান ও ভৌতবিজ্ঞান। প্রকৃতিতে যা কিছু আছে তাদের মোটা দাগে দু'টি ভাগে ভাগ করা হয় - জীব ও জড়। সহজভাবে বলা যায় - জীব সম্পর্কিত জ্ঞান হলো জীববিজ্ঞান; পক্ষান্তরে, জড় সম্পর্কিত জ্ঞান হলো ভৌতবিজ্ঞান। তবে দেখা যায়, জীববিজ্ঞান জীবের পাশাপাশি জড় পদার্থ নিয়েও কাজ করে আবার ভৌতবিজ্ঞান জীবদের সম্পর্কেও অনুসন্ধান করে। ভৌতবিজ্ঞানের একটি শাখা রসায়ন। রসায়ন মূলত পদার্থের গঠন ও গুণাবলি এবং এর সাথে শক্তির সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করে।

আমাদের এ মহাবিশ্ব পদার্থ, শক্তি ও শূন্যস্থান নিয়ে গঠিত। পদার্থের গঠন এবং শক্তির প্রভাবে পদার্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেটিই রসায়নের আলোচনার বিষয়। আমাদের চারপাশের যা কিছু দেখতে পাই, গন্ধ নিতে পারি, ছুঁতে পারি, স্বাদ নিতে পারি - সবই কোনো না কোনো পদার্থ (রাসায়নিক পদার্থ) দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে ১১৮ টি মৌলিক পদার্থ এবং অসংখ্য যৌগিক পদার্থ রয়েছে। রসায়ন প্রথমত সকল রাসায়নিক পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে। প্রকৃতপক্ষে, মৌলিক পদার্থসমূহ একে অন্যের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। মৌলিক পদার্থসমূহ কী অনুপাতে ও কী রকম বিন্যাসে যুক্ত হয় তার উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ তৈরি হয়। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, গ্লুকোজ ও ইথানল দু'টি পদার্থই কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন দ্বারা গঠিত। কিন্তু গঠন ভিন্নতার জন্য এদের গুণাগুণও ভিন্ন হয়।

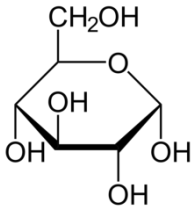

গ্লুকোজ অণু

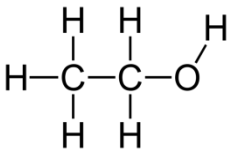

ইথানল অণু

রসায়নের দ্বিতীয় কাজটি হলো, পদার্থসমূহ কীভাবে, কী গতিতে ও কীসের প্রভাবে রূপান্তরিত হয় সেটি অনুসন্ধান করা। এ অনুসন্ধান সত্যিই চমৎকার। পদার্থসমূহ একে অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়া (interaction) করে নতুন ধর্মবিশিষ্ট নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে। উদাহরণ হিসেবে একটি বহুল ব্যবহৃত রাসায়নিক খাবার লবণের কথা ধরা যাক - খাবার আমরা জানি, খাবার লবণ হলো সোডিয়াম ক্লোরাইড। অর্থাৎ খাবার লবণের গঠন উপাদান হলো সোডিয়াম ও ক্লোরিন। খাবার লবণকে ভাঙলে সোডিয়াম ধাতু ও ক্লোরিন গ্যাস পাওয়া যায়। একবার ভাবুন তো, আপনি আলাদা আলাদা করে সোডিয়াম খাচ্ছেন এবং ক্লোরিন গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে নিচ্ছেন। আমরা জানি বিশুদ্ধ সোডিয়াম পানির স্পর্শে আসা মাত্রই আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। কোনোভাবে আমরা যদি এক টুকরো সোডিয়াম গিলে ফেলি তাহলে এটি পাকস্থলীতে গিয়ে কী করবে? একইভাবে, ক্লোরিন গ্যাস নিঃশ্বাসের সাথে নেওয়া বিপজ্জনক। অথচ সোডিয়াম ও ক্লোরিনের সংযোগে তৈরি খাবার লবণ ক্ষতিকর তো নয়ই বরং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি। আমরা লবণ মুখে নিয়ে ও খেতে পারি, এতে আমাদের তেমন সমস্যা হয় না।

পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে শক্তি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যে কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই প্রাথমিকভাবে শক্তির দরকার হয়। তবে পরিবর্তন শেষে সামগ্রিকভাবে শক্তি উৎপন্ন হয়েছে বা শক্তি শোষিত হয়েছে এ দুইটি ঘটনাই দেখা যায়। পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে শক্তির পরিবর্তনও রসায়নের অনুসন্ধানের একটি বিষয়।

আমরা আগেই জেনেছি যে, কোটি কোটি রাসায়নিক পদার্থের প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও গুণাগুণ রয়েছে। রাসায়নিক পদার্থসমূহের কোন কোন বৈশিষ্ট্য মানুষ ও তার পরিবেশকে কীভাবে প্রভাবিত করে, কীভাবে কোন কোন বৈশিষ্ট্যকে আমরা কীভাবে কোন কাজে লাগাতে পারি তা অনুসন্ধানও রসায়নের একটি কাজ।

কোনো পদার্থ জীবের অংশ হোক বা জড় পদার্থ হোক, রসায়ন উভয়ক্ষেত্রেই পদার্থটির গঠন ও গুণাবলি নিয়ে কাজ করে। যেমন পানি প্রকৃতিতে প্রাপ্ত একটি সহজলভ্য পদার্থ। পানির বৈশিষ্ট্য কী, পানির গঠন একক (পানির অণু) কী, এই অণু কী দ্বারা কীভাবে গঠিত হয়, পানি অন্য পদার্থের সাথে কীভাবে বিক্রিয়া করে কিংবা অন্য পদার্থকে কীভাবে কতটুকু দ্রবীভূত করে - এ সবই রসায়নের আলোচ্য বিষয়। তবে পানি যখন আমাদের শরীরে অবস্থান করে তখন এটি কীভাবে আমাদের জীবন ধারণে সহায়তা করে তাও রসায়নের আলোচ্য বিষয়।

রসায়নের গুরুত্ব

মানুষের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে রসায়নের জ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রসায়নের জ্ঞানকে ব্যবহার করে আমরা আমাদের জীবনকে আরও সহজ, নিরাপদ বা টেকসই এবং আরামপ্রদ করতে পারি। রসায়নের জ্ঞান আমরা জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে পারি তা নিচের চিত্রে ও বর্ণনায় উপস্থাপন করা হলো :

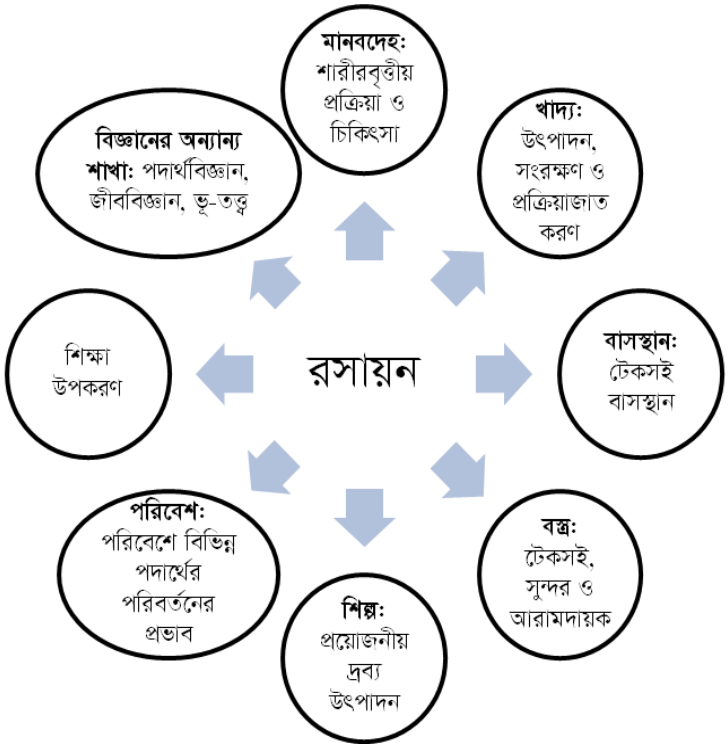

চিত্র ১.১ : বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের জ্ঞানের প্রয়োগ

ক. **মানবদেহ :** আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মধ্যে প্রথমে আমরা যদি মানবদেহের কথা চিন্তা করি তাহলে রসায়নের গুরুত্ব বোঝা যাবে। আমরা জানি, আমরা যে খাবার খাই তা প্রথমে সরলীকৃত হয়। যেমন– আমরা ভাত খেলে তা ভেঙে গ্লুকোজে পরিণত হয়। খাবার সরল উপাদানে ভাঙতে এসিড ও এনজাইমের দরকার হয়। তারপর গ্লুকোজের দহনের ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এসিড ও এনজাইম কীভাবে কাজ করে এবং কীভাবে গ্লুকোজ ভেঙে শক্তি উৎপন্ন হয়, এসবই রসায়ন থেকে জানা যায়। আমাদের খাদ্য পরিপাকের জ্ঞান ভালো থাকলে আমরা সঠিক খাবার নির্বাচন করতে পারি। যেমন– আমাদের অনেকের এসিডিটি হয়। এসিডিটি হয় পাকস্থলীতে অধিক পরিমাণে এসিড নিঃসরণের ফলে। আমরা যদি জানি কোন ধরনের খাবার বেশি এসিড নিঃসরণ করে তাহলে আমরা সেই খাবারটি গ্রহণ থেকে আমরা বিরত থাকতে পারি।

শারীরিক সমস্যা সারাতেও রসায়ন কাজ করে। আমাদের এসিডিটি হলে আমরা এন্টাসিড ট্যাবলেট খাই। রসায়নের গবেষণা আমাদের জানিয়েছে যে, এসিডকে প্রশমিত করে ক্ষার। এন্টাসিড বা খাবার সোডা খেলে এসিডিটি প্রশমিত হয় কারণ এন্টাসিড

পাকস্থলীতে গিয়ে ক্ষারীয় দ্রবণে পরিণত হয়। বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে আমরা যে ওষুধ সেবন করি তা বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সমন্বয়ে তৈরি। ওষুধের উপাদান শরীরে প্রবেশ করে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে রোগের নিরাময় করবে তা রসায়নই বলে দেয়।

খ. খাদ্য উৎপাদন, সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ : রাসায়নিক সার ও কীটনাশক খাদ্য উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি করেছে। মাছ, জ্যাম, জেলী, আঁচার, জুস, পানীয় ইত্যাদি সংরক্ষণে লবণ, চিনি, সোডিয়াম বেনজোয়েট, ভিনেগার ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহৃত হয়। তবে এক্ষেত্রে খেয়াল রাখা দরকার যে প্রিজারভেটিভটি (যেমন– ফরমালিন) আমাদের জন্য ক্ষতিকর কি।

গ. বাসস্থান : আমাদের টেকসই বাসস্থান নির্মাণে রসায়নের ভূমিকা অনেক। বাংলাদেশে বেশিরভাগ বাড়ির ছাউনি এখন সম্ভবত ঢেউটিনের। লোহার আকরিক থেকে এই ঢেউটিন তৈরিতে রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়। একইভাবে পাকা ঘর নির্মাণে ব্যবহৃত সিমেন্ট বা যে কোনো টাইলস তৈরিতে রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়। যে কোনো বাড়ি নির্মাণে ব্যবহৃত লোহা, রং কিংবা কাঁচ এসবই রাসায়নিক শিল্পে রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করা হয়।

ঘ. বাসস্থান : সমগ্র পৃথিবীতে ব্যবহৃত বস্ত্র তৈরিতে বর্তমানে প্রাকৃতিক তন্তুর (সূতা) চেয়ে কৃত্রিম তন্তু যেমন– পলিস্টার ও নাইলন বেশি ব্যবহৃত হয়। আপনারা জানেন যে, নাইলন এবং পলিস্টার তৈরি হয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায়। আবার প্রাকৃতিক তন্তু উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহৃত হয়। তুলা (কার্পাস) চাষে প্রচুর রাসায়নিক কীটনাশক ও সার ব্যবহার করতে হয়। আবার তুলা থেকে তন্তু উৎপাদনে তন্তুকে টেকসই ও রঙিন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক রঞ্জক ব্যবহার করতে হয়।

ঙ. শিক্ষা উপকরণ : শিক্ষার কাজে প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্য হলো কাগজ ও কলম। কাগজ কিংবা কালি-কলম এসব কিছুই তৈরি হয় রাসায়নিক শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে।

চ. শিল্প : প্রায় সকল শিল্পেই রাসায়নিক দ্রব্যের এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার কম-বেশি ব্যবহার রয়েছে। রাসায়নিক শিল্পে মূল উৎপাদ কোন রাসায়নিক দ্রব্য; এ ধরনের শিল্পে কাঁচামালও কোনো রাসায়নিক দ্রব্য কিংবা তার আকরিক। যেমন– ইউরিয়া সার শিল্পের কাঁচামাল হলো দু'টি রাসায়নিক দ্রব্য-অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। আবার ইস্পাত শিল্পের মূল কাঁচামাল লোহার বিভিন্ন আকরিক, আয়রন অক্সাইড সমৃদ্ধ হেমাটাইট, ম্যাগনেটাইট ইত্যাদি।

যে সকল শিল্প রাসায়নিক শিল্প নয়, সেসব শিল্পেও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার হয়। খনিজ উত্তোলন শিল্প (Mining) আর রসায়ন শিল্প একে অন্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। খনি থেকে মূল্যবান পদার্থসমূহ উত্তোলনে ভৌত প্রক্রিয়ার সাথে সাথে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে। যেমন– লোহার আকরিকের আয়রন অক্সাইড থেকে আয়রন পেতে আয়রন অক্সাইডের নিম্নলিখিত বিক্রিয়াসমূহ ঘটানো হয়।

$$3Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2Fe_3O_4 + CO_2$$
$$Fe_2O_3 + CO \rightarrow 2FeO + CO_2$$
$$Fe_3O_4 + CO \rightarrow 3FeO + CO_2$$
$$CO_2 + C \rightarrow 2CO$$
$$FeO + C \rightarrow Fe + CO$$

বর্তমানে বাংলাদেশের প্রধান শিল্প হলো তৈরি পোষাক শিল্প। আর পোশাক শিল্পের একটি প্রধান অংশ ডায়িং। ডায়িং শিল্পের মূল কাজ বিভিন্ন ধরনের ডাই বা রাসায়নিক রং ব্যবহার করে কাপড়কে আকর্ষণীয় করা। বাংলাদেশের আরেকটি শিল্প ওষুধ শিল্প। ওষুধ তৈরি পুরোপুরিভাবে রাসায়নিক প্রক্রিয়া। এখানে বিভিন্ন রকমের রাসায়নিক কাঁচামাল থেকে কাঙ্ক্ষিত একটি যৌগ বা একাধিক যৌগের মিশ্রণ তৈরি করা হয়।

ছ. পরিবেশ ও রসায়ন : রসায়নের একটি শাখা হলো পরিবেশ রসায়ন যা পরিবেশকে বুঝতে ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান শক্তির প্রভাবে কীভাবে পরিবর্তিত হয় এবং জীবের জীবনকে প্রভাবিত করে তা অনুসন্ধান করে পরিবেশ রসায়ন। আমাদের উৎপাদিত ও ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি পরিবেশের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়ায়। আবার ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য যাতে পরিবেশকে দূষিত করতে না পারে সেজন্যও রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগানো হয়। যেমন, বিভিন্ন শিল্পের বর্জ্য সরাসরি নদীর পানিতে মিশলে তা নদীর জলজ জীবের জন্য ক্ষতিকর। এক্ষেত্রে নিষ্কাশনের পূর্বে শিল্পবর্জ্যকে রাসায়নিক দ্রব্য দ্বারা পরিশোধিত করা হয়।

জ. রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞান : বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন পদার্থবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ব ইত্যাদি রসায়নের জ্ঞানকে কাজে লাগায়। একইভাবে রসায়নও অন্যান্য বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগায়। নিচে আমরা দেখবো রসায়ন কীভাবে অন্য বিজ্ঞানকে কাজে লাগায় ও অন্য বিজ্ঞানের কাজে লাগে।

রসায়নের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

রসায়নের সাথে পদার্থবিজ্ঞানের সম্পর্ক : রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান উভয়ই পদার্থ ও শক্তি নিয়ে কাজ করে। এ কারণে বিজ্ঞানের এ দু'টি শাখার মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। পদার্থবিজ্ঞান শক্তির প্রভাবে সময়ের সাপেক্ষে পদার্থের অবস্থানের পরিবর্তন নিয়ে কাজ করে আর রসায়ন কাজ করে শক্তির প্রভাবে পদার্থের গঠনের পরিবর্তন ও পদার্থের গঠনের পরিবর্তনের প্রভাবে শক্তির পরিবর্তন নিয়ে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। পরমাণুতে বিভিন্ন কণার অবস্থান, গতি ও ধর্ম মূলত পদার্থবিজ্ঞানের অনুসন্ধানের বিষয়; এ সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞানীদের গবেষণার ফল রসায়নে কাজে লাগানো হয়। একজন রসায়নবিদ মূলত কাজ করেন কোন কণার স্থানান্তরের বা অদল-বদলের ফলে অণু-পরমাণুর গঠন ও ধর্ম কীভাবে পরিবর্তিত হয়।

রসায়নের সাথে জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক : জীববিজ্ঞান জীবের জৈবিক প্রক্রিয়া, জীবের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি নিয়ে কাজ করে। জীবের জৈবিক প্রক্রিয়া ঘটে থাকে মূলত জীবদেহে শক্তি ও পদার্থের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। জীবদেহে শক্তি ও পদার্থের পরিবর্তন বুঝতে হলে দরকার রসায়নের জ্ঞান। যেমন– জীবদেহে কীভাবে খাদ্য পরিপাক হয়ে খাদ্য উপাদান ও শক্তি পরিবাহিত হয় তা জীববিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু খাদ্য থেকে গ্লুকোজ তৈরি এবং কোষে গ্লুকোজ ও অক্সিজেন থেকে কীভাবে শক্তি, কার্বন ডাই-অক্সাইড ও পানিতে পরিণত হয় তা রসায়নের অনুসন্ধানের বিষয়।

রসায়নের সাথে ভূ-তত্ত্বের সম্পর্ক : ভূ-তত্ত্ব পৃথিবীর গঠন উপাদান নিয়ে কাজ করে। এদিক থেকে রসায়নের সাথে এর সম্পর্ক নিবিড়। যেমন– ভূ-তত্ত্ব পেট্রোলিয়ামের অবস্থান, উত্তোলন প্রভৃতি নিয়ে কাজ করে। রসায়ন পেট্রোলিয়াম-এর ধর্ম, পেট্রোলিয়ামকে অন্য পদার্থে কীভাবে পরিণত করা যায় তা নিয়ে কাজ করে।

১.২ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও রসায়ন শিক্ষা

কোন লক্ষ্যকে সামনে রেখে আপনি শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞান পড়াবেন? আপনি কি চান শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়ে ভবিষ্যতে বিজ্ঞানী হবে? নাকি শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে তার অর্জিত জ্ঞানকে ব্যবহার করে দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে? এটি ঠিক যে, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মধ্যেই বিজ্ঞানী হওয়ার সম্ভাবনা লুকিয়ে আছে, কিন্তু বাস্তবে আমরা কী দেখি? হয়তো একশ শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন-দু'জন বিজ্ঞানী হবে বা বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট কাজ করবে। তদুপরি একটি সমাজে তো সকলের বিজ্ঞানী হওয়ার দরকার নেই, তাই না? সেক্ষেত্রে শতকরা নিরানব্বই জন যেখানে বিজ্ঞানী হবে না সেক্ষেত্রে আপনি কি সকলকে বিজ্ঞানী হিসেবে তৈরি করতে বিজ্ঞান পড়াবেন? নিশ্চয়ই না।

বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়ানোর লক্ষ্য হিসেবে দু'টি লক্ষ্য একে অপরের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। একটি হলো, পেশাজীবী (যেমন– ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, রসায়নবিদ, ফার্মাসিস্ট, প্রযুক্তিবিদ ইত্যাদি) হিসেবে তৈরি করার লক্ষ্যে উচ্চতর শ্রেণিতে বিজ্ঞানের বিষয়সমুহ পড়ানোর জন্য প্রস্তুত করা। দ্বিতীয়টি হলো, শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর (Scientifically literate) নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

বর্তমানে প্রথম লক্ষ্যটি অর্থাৎ বিজ্ঞানী এবং বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পেশাজীবী তৈরির উপর জোর দেওয়া হয় মাধ্যমিক পরবর্তী বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে। আর প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান শিক্ষায় বেশি জোর দেওয়া হয় দ্বিতীয় লক্ষ্যটির ওপরে অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর (Scientifically literate) নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ওপরে। প্রকৃতপক্ষে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে সকল শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর করা গেলে বিজ্ঞানী গড়ার লক্ষ্য অর্জনেরও সহায়তা হয়।

আমরা অনেক সময়ই বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী বা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে শুনতে পাই যে, আমাদের জাতিকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর করে গড়ে তোলা গেলে এ দাবীও পূরণ হবে অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে গড়ে উঠবে। অথবা অন্যভাবে বলা যায় যে, বিজ্ঞানমনস্কতা অর্জন বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনের একটি পূর্বশর্ত। আমরা এখন দেখবো বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা বলতে কী বোঝায়?

বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা (Scientific literacy)

বর্তমানে ভাষাগত সাক্ষরতা (Language/linguistic literacy) ও গাণিতিক সাক্ষরতার (numeracy) সাথে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনও শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য (OECD, 2006)। একজন মানুষ ভাষাগতভাবে সাক্ষর– এটি বলতে আমরা বুঝি যে, মানুষটি কোনো একটি লেখা পড়ে বুঝতে পারেন, দৈনন্দিন কাজে লিখতে পারেন, কোনো কিছু শুনে বুঝতে পারেন ও প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলতে পারেন। এ হিসেবে একজন মানুষ বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর - এটি বলতে কী বোঝায়? নিচের চিত্রের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করা যায়। আমরা চিত্রে উল্লিখিত পরস্পর সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলো যদি বিশ্লেষণ করি তা হলে কী দেখতে পাই? নিচে বৈশিষ্ট্যগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

(ক) বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার প্রথম শর্তই হলো একজন মানুষ তার চারপাশের প্রকৃতি ও পরিবেশকে বুঝতে বা অনুধাবন করতে আগ্রহী হবেন। একজন মানুষের আগ্রহ না থাকলে কোনো ভাবেই তাকে কোনো বিষয়ে জানানো সম্ভব নয়। কারো যদি কোনো কিছু সম্পর্কে আগ্রহ/কৌতূহল থাকে তা হলে সে নিজেই প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করে নিতে পারে।

(খ) দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো বিজ্ঞান সম্পর্কিত ইস্যু বা বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষম হওয়া। বিজ্ঞানবিষয়ক ইস্যুতে আলোচনা অংশ নেওয়ার একজন মানুষের বিজ্ঞানী হওয়ার বা বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই। তবে তাকে অবশ্যই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞানের জ্ঞান ও বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে তা বুঝতে হবে। যেমন পত্রিকায় খবর বের হলো যে সম্প্রতি মানুষের বুড়িয়ে যাওয়া প্রতিরোধ করা সম্ভব। অর্থাৎ ভবিষ্যতে মানুষ হয়তো আর বৃদ্ধ হবে না। বিজ্ঞানী ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে ইঁদুরের বুড়িয়ে যাওয়া বিলম্বিত করা গেছে। যিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না তিনি হয়তো বিষটি একদম উড়িয়ে দেবেন অথবা বিনা প্রশ্নে মেনে নেবেন। কিংবা আলোচনা থেকে বিরত থাকবেন। কিন্তু একজন ব্যক্তি যদি জানেন যে বৈজ্ঞানিক অনেক আবিষ্কারই প্রথমে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। তা হলে তিনি উপরোক্ত খবরটি জেনে আরো জানতে উৎসাহিত হবেন এবং আলোচনায় অংশ নেবেন।

(গ) বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর একজন ব্যক্তির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো তিনি একদিকে অন্যের বক্তব্য/মত/দাবি খোলা মনে শুনবেন অর্থাৎ গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবেন কিন্তু কোনো বক্তব্য বা দাবিই বিনা প্রশ্নে বা বিচারে মেনে নেবেন না বা গ্রহণ করবেন না। যাচাই বাছাই করেই তবে তা গ্রহণ করবেন। যেমন, আমরা অনেক সময়ই শুনে থাকি কোনো বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তি (পীর, ফকির, ওঝা, সাধু, সন্নাসী) ঝাঁড় ফুঁক দিয়ে পানি পড়া দিলে রোগ ভালো হয়। এক্ষেত্রে একজন বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর ব্যক্তি যাচাই না করে চিকিৎসার জন্য ঐ ব্যক্তির কাছে ছুটে যাবেন না। তিনি বরং যাচাই করে জানার চেষ্টা করে দেখবেন আসলেই এসবে রোগ ভালো হয় কীনা। খোঁজ নিয়ে হয়তো দেখা যাবে যে, একশ জন রোগীর মধ্যে নিরানব্বই জন রোগীর-ই কোনো উপকার হয় না। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর একজন ব্যক্তি পীর-ফকির বা সাধু সন্নাসীর কাছে না গিয়ে ডাক্তারের কাছেই চিকিৎসার জন্য যাবেন।

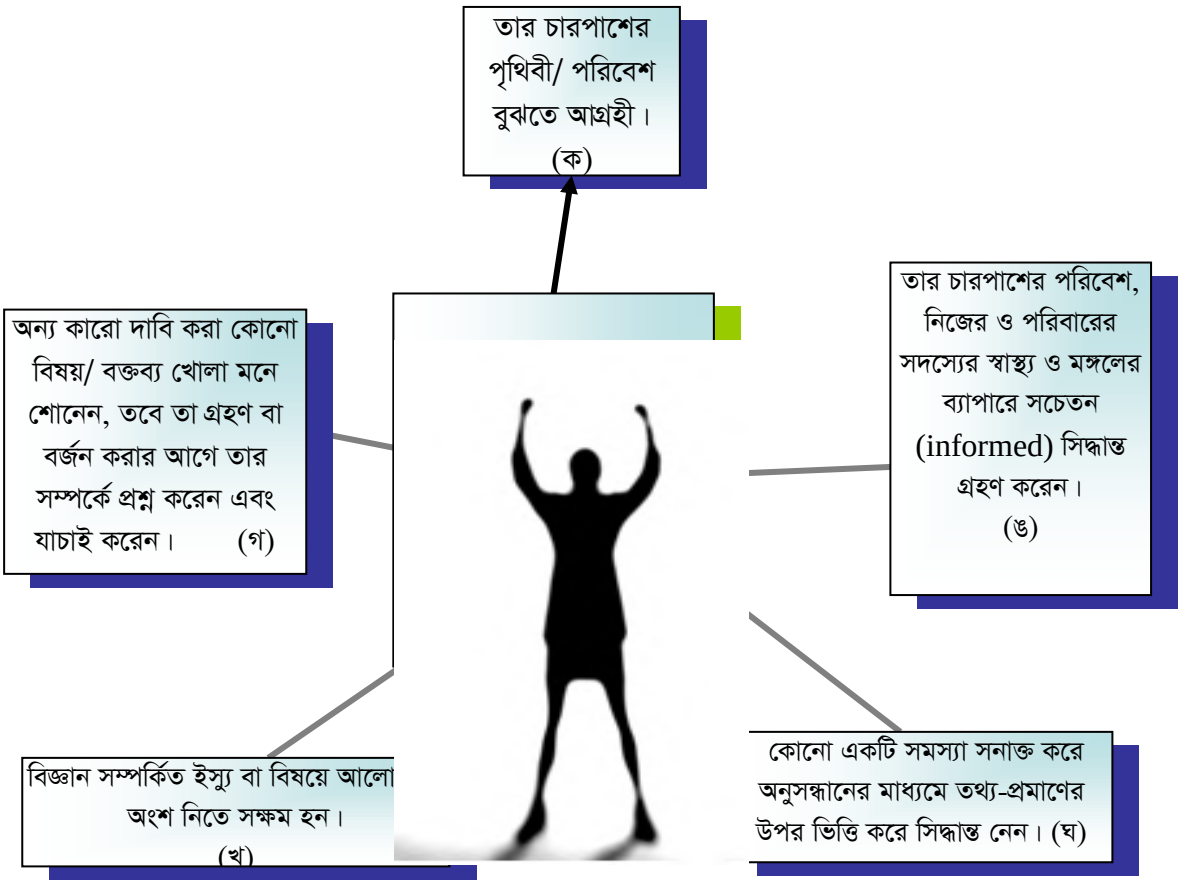

চিত্র ১.২ : বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা

(ঘ) সমস্যা সনাক্ত করে অনুসন্ধান করে তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ একজন বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আমাদের শিক্ষার্থীদের একটি বড় অংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরোতে পারে না। যারা মাধ্যমিক পর্যায়ে ভর্তি হয় তাদের মধ্যেও অনেক শিক্ষার্থীই ধীরে ধীরে বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করে কেউ বা পারিবারিক কৃষিকাজে যুক্ত হয়, কেউ বা পারিবারিক ক্ষুদ্র ব্যবসা (যেমন মুদি দোকানদারি), আবার কেউ হয়েতো কায়িক শ্রমে পোশাক শিল্পে নিয়োজিত হয়ে পড়ে। খুব কম অংশই বর্তমানে বিজ্ঞান শাখায় (নবম শ্রেণিতে) যায়। শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞান নিয়ে উচ্চ শিক্ষা নেয় বড় জোর ১/২ শতাংশ। বাকি ৯৮-৯৯ শতাংশ মানুষের বিজ্ঞান সরাসরি বিজ্ঞান সংশ্লিষ্টতা থাকে না। কিন্তু ১০০ শতাংশ মানুষকেই বিজ্ঞানের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করতে হয়। যে কোনো মানুষকে তার দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমাধান করতে হয়, যেসব সমস্যার মধ্যে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট সমস্যাও রয়েছে। যেমন– গ্রামের একজন নারী তার বাড়ির সাথে একখণ্ড পতিত জমিতে লাউ চাষ করেছেন। কিন্তু দু'মাস পার হওয়ার পরেও দেখা গেল গাছগুলো সেভাবে বাড়ছে না। এক্ষেত্রে তিনি কী করতে পারেন? তিনি যদি পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করতে পারেন এবং সমাধান বের করতে পারেন (হয়তো ঐ জমিতে সারের অভাব ছিল, গোবর সার প্রয়োগেই গাছগুলো বেড়ে উঠলো) তবে ঐ নারীকে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর বলতে পারি।

(ঙ) সবশেষে, একজন বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর মানুষ তার চারপাশের পরিবেশ নিজের ও পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য ও মঙ্গলের ব্যাপারে বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। বিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তাকে অবশ্যই বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জনে আগ্রহী হতে হবে। তাকে অনুসন্ধানী হতে হবে, তাকে বৈজ্ঞানিক ইস্যুতে আলোচনায় অংশগ্রহণে সক্ষম হতে হবে, এবং অন্যদের দাবিকৃত বক্তব্য প্রশ্ন করে যাচাই বাছাই করতে হবে। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্যটি অর্থাৎ বিবেচনা প্রসূত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ইতোমধ্যে বর্ণিত চারটি বৈশিষ্ট্যই তাকে অর্জন করতে হবে। একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি ভালোভাবে বোঝা যাবে। আমরা টিভি বিজ্ঞাপনে প্রতিদিনই দেখি যে, অমুক খাবারটি (হরলিক্স, কমপ্লান ইত্যাদি) খাওয়ালে শিশুরা লম্বা হয়, বুদ্ধিমান হয়, পড়াশোনায় ভালো হয়, খেলাধুলায় ফার্স্ট হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। একজন মা-বাবা এসব বিজ্ঞাপন দেখেই কি তার সন্তানকে ঐ খাবারটি খাওয়ানো শুরু করবেন? যদি কোনো বাবা-মা খাওয়াতে শুরু করেন তবে তাকে আমরা বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর বলবো? একদমই না। একজন বাবা/মা তার সন্তানকে ঐ খাবারটি খাওয়ানো শুরু করার আগে বোঝার চেষ্টা করবেন যে, বিজ্ঞাপনে যে দাবিটি করা হচ্ছে (যেমন হরলিক্স লম্বা করে বা বুদ্ধি বাড়ায়) তার কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি না। যদিও বিজ্ঞাপনে দাবি করা হয়েছে যে তারা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কিন্তু আসলে কি শিশুদের ওপর পরীক্ষা করা যায়? তিনি আরও যেটি করবেন তা হলো এ বিষয়ে আরও জ্ঞানী ব্যক্তিদের (যেমন ডাক্তার, পুষ্টিবিদ) পরামর্শ নেবেন। এভাবে একজন বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর বাবা/মা কোনো কিছু শুনেই তা গ্রহণ করবেন না। আগে পদ্ধতিগতভাবে যাচাই বাছাই করে তারপরই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

আপনারা এতক্ষণ বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর মানুষের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানলেন। এবার ভাবুন তো এরকম একজন বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর মানুষ হতে হলে তার কী শিখতে হবে? তার কি বিজ্ঞানের জ্ঞান/তত্ত্ব, সূত্র, তথ্য ইত্যাদি মনে রাখতে পারলেই হবে ?
ধরুন, একজন শিক্ষার্থী রসায়নে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স পাস করলো। তিনি জানেন যে, কী কারণে আর্সেনিকোসিস হয় এবং এ থেকে কীভাবে দূরে থাকা যায়। অথচ তিনি আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত রোগীকে অচ্ছুৎ ভাবলেন। তিনি কী বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর? কেন তিনি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে এ রোগ সম্পর্কে আরও জানার চেষ্টা করলেন না? তিনি তো বিজ্ঞানের অনেক কিছু জানেন! তা হলে সমস্যা কোথায়? আসলে তার সমস্যা মানসিকতায়। তিনি বিজ্ঞানের জ্ঞান জানেন কিন্তু সেই জ্ঞান প্রয়োগের মানসিকতা তার নেই। এ জন্যই আমরা বুদ্ধিজীবী ও গবেষকদের কাছ থেকে শুনি যে আমাদের বিজ্ঞানমনস্ক হতে হবে। এবার দেখা যাক, বিজ্ঞানমনস্কতা কী ?

বিজ্ঞানমনস্কতা কী?

আমাদের দেশে বিজ্ঞানমনস্কতা বহুল প্রচলিত ও বহুল ব্যবহৃত একটি শব্দ হলেও এর সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যেটুকু পাওয়া যায় তা হলো এরকম-কোনো কিছুকে বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বা আলোকে দেখা বা বিচার করার মানসিকতাই বিজ্ঞানমনস্কতা। এটি কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদির বিপরীত। আমাদের দেশে জ্বীনে ধরা বলে একটা ব্যাপার খুব পরিচিত এবং তার চিকিৎসা অনেকক্ষেত্রেই অপচিকিৎসা হয়ে থাকে যা বিপজ্জনক। একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ এ ধরনের সমস্যাকে জ্বীনে ধরা হিসেবে বিবেচনা না করে একটি রোগ হিসেবে বিবেচনা করবেন এবং চিকিৎসকের কাছে রোগীকে নিয়ে যাবেন।

একটি আগ্রহ উদ্দীপক ব্যাপার হলো জ্ঞান বিজ্ঞানে এগিয়ে থাকা দেশে (যেমন– ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া) বিজ্ঞানমনস্কতা শব্দটি খুব প্রচলিত নয়। বরং সেসব দেশে শিক্ষা-গবেষকগণ বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতার কথাই বলেন যা তুলনামূলকভাবে সুনির্দিষ্ট বা সুসংজ্ঞায়িত। আমরা যদি বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর একজন মানুষের বৈশিষ্ট্য ভালোভাবে বিশ্লেষণ করি তা হলে দেখবো যে, বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনের জন্য একজন মানুষের যা দরকার তা হলো :

(ক) বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি বা আগ্রহ

(খ) জ্ঞান : বিজ্ঞানের জ্ঞান তথা বিজ্ঞানের ধারণা, তথ্য, তত্ত্ব, সূত্র ইত্যাদি এবং বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে সে সম্পর্কে জ্ঞান

(গ) দক্ষতা : সমস্যা সমাধানের দক্ষতা, প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা, অনুসন্ধান করার দক্ষতা

(ঘ) বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ : অণুসন্ধিৎসা/কৌতূহল, খোলামনস্কতা, যাচাই প্রবণতা, প্রশ্ন করার মানসিকতা, পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের ওপর নির্ভর করার মনোভাব ইত্যাদি।

সংক্ষেপে বলা যায়, বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর হতে হলে একজন মানুষকে বিজ্ঞানের জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে, তার বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে হবে এবং সবশেষে তাকে কিছু বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ অর্জন করতে হবে। একজন মানুষের বিজ্ঞানমনস্ক হওয়ার হওয়ার জন্য বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধগুলো অর্জন অবশ্যক; এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন হয়তো ততটা জরুরি নয় তবে তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর হওয়ার জন্য দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করতে হবে।

উচ্চতর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার ভিত্তি তৈরিতে রসায়ন শিক্ষা

এবার রসায়ন শিক্ষার আরেকটি লক্ষ্য নিয়ে আলোচনা করা যাক। এটি হলো শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার জন্য শক্ত ভিত্তি তৈরি করা। বিজ্ঞান শাখায় এসএসসি সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ পড়তে পারে (যেমন– রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিদ্যা, ফার্মেসি, প্রাণ রসায়ন)। শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে বা অনুষদে (যেমন– পূরকৌশল, কেমিকৌশল, জেনেটিক প্রকৌশল), কৃষি বিশ্বদ্যিালয়ে, মেডিকেল কলেজে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এসব বিষয়ে পড়ার জন্য শিক্ষার্থীর রসায়ন এর মৌলিক বিষয়ে শক্ত ভিত্তি থাকা দরকার। এ ভিত্তি তৈরির জন্য শিক্ষার্থী তথ্য জানার চেয়ে ধারণা বা তত্ত্ব বোঝাটা বেশি জরুরি। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক, অনেকে হয়তো পর্যায় সারণিতে বিভিন্ন মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা ও পারমাণবিক ভর মুখস্থ করার দিকে জোর দেন। কিন্তু রসায়নের একটি শক্ত ভিত্তির জন্য বেশি দরকার পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি, মৌলের পর্যাবৃত্ত ধর্ম ইত্যাদি ভালোভাবে বোঝা। তাই রসায়ন শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে জোর দিতে হবে রসায়নের তত্ত্ব ও ধারণা এবং এদের তাৎপর্য বোঝার দিকে। আবার উচ্চতর বিজ্ঞান শিক্ষা ও পরবর্তীতে বিজ্ঞান চর্চার জন্য শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধান দক্ষতা ও বিজ্ঞান প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা অর্জনও আবশ্যক। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে বিজ্ঞান গবেষণা শুরু করতে হয় যার জন্য এসব দক্ষতা প্রয়োগ করতে হয়। তাই শিক্ষার্থীদের রসায়নের তথ্য, তত্ত্ব ও ধারণা বোঝার সাথে সাথে তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির দিকেও জোর দিতে হবে।

১.৩ রসায়ন শিক্ষায় অনুসন্ধান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি যে, একজন শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে বিজ্ঞান পেশাজীবী হিসেবে দেখতে চাই কিংবা বিজ্ঞানসাক্ষরতা সম্পন্ন একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে দেখতে চাই - উভয় ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের তত্ত্ব, তথ্য ও ধারণা শেখানোর পাশাপাশি তাকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ শেখানো দরকার। বিজ্ঞানের যে কোনো বিষয় অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এবং দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে হয়। আবার বিজ্ঞানের চর্চা ও শেখার মধ্য দিয়ে একজন শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কিছু দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ এবং দক্ষতার বিকাশ ঘটাতে পারে। আমরা এরকম কিছু দৃষ্টিভঙ্গি, মূলবোধ ও দক্ষতা নিচে আলোচনা করবো।

বিজ্ঞানে প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা

আমাদের বিদ্যালয়ে সাধারণত বিজ্ঞানের শুধু জ্ঞানই শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে, বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতা তেমন গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয় না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট দক্ষতাগুলো বিজ্ঞান শেখা ও গবেষণার জন্য যেমন দরকার হয়, তেমনি আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও দরকার হয়। তাই বিজ্ঞান শিক্ষাবিদগণ এ ধরনের দক্ষতাগুলো অর্জনকে বিজ্ঞান শেখার একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হিসেবে বিবেচনা করেন। আমাদের নতুন শিক্ষাক্রমে কয়েকটি প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা যেমন পর্যবেক্ষণ, সম্ভাব্য ব্যাখ্যা, পূর্বানুমান, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অনুমিত সিদ্বান্ত যাচাই, পরীক্ষণ এগুলো অর্জনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

একটি উদাহরণের সাহায্যে এ ধরনের প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা বোঝা যাবে। আমরা যখন রাস্তা পার হই তখন কী করি? আমরা প্রথমে পর্যবেক্ষণ করি একটি গাড়ি কতদূরে আছে এবং কত গতিতে আসছে। তার ওপর ভিত্তি করে আমরা অনুমান করি যে, গাড়িটি আসার আগে আমরা রাস্তা পার হতে পারবো কি না? আমরা যদি ভুলভাবে পূর্বানুমান (Prediction) করি তাহলে দূর্ঘটনায় পড়বো। তাই পূর্বানুমান করা জীবনের জন্য আবশ্যকীয় একটি দক্ষতা। পূর্বানুমান বিজ্ঞান চর্চা বা অনুসন্ধানের জন্যও আবশ্যকীয় একটি দক্ষতা।

বিজ্ঞান প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা মূলত দুই ধরনের - মৌলিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা ও সমন্বিত প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা। মৌলিক প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতার মধ্যে আছে পর্যবেক্ষণ, পরিমাপকরণ, শ্রেণিকরণ, পূর্বানুমান, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান ও যোগাযোগকরণ।
সমন্বিত প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাগুলোর মধ্যে রয়েছে পরীক্ষণ যা প্রকৃতপক্ষে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও চলক নিয়ন্ত্রণ প্রভৃতি কিছু দক্ষতার সমন্বয়।

(ক) পর্যবেক্ষণ : পর্যবেক্ষণ বিজ্ঞানের বিশেষ করে রসায়ন অনুসন্ধানে একটি আবশ্যকীয় দক্ষতা। সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ বলতে কেউ কেউ কোনো কিছুকে মনোযোগ দিয়ে দেখাকে বোঝেন। কিন্তু পর্যবেক্ষণ কি শুধু চোখ দিয়েই হয়? আসলে তা নয়। আমরা আমাদের সকল ইন্দ্রীয় ব্যবহার করে পর্যবেক্ষণ করে থাকি। পর্যবেক্ষণ হলো ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য প্রত্যক্ষণ। শিক্ষক হিসেবে

আমাদের দায়িত্ব হলো কোনো বস্তু বা ঘটনা পর্যবেক্ষণ করতে শিক্ষার্থীদের সবগুলো ইন্দ্রীয় ব্যবহারে সাহায্য করা। চোখ দিয়ে দেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থী বস্তু/বস্তুসমূহের আকার, আকৃতি ও রং নির্ণয় করতে পারে। চোখ দিয়ে আরও নির্ণয় করতে পারে বস্তুসমূহ একে অপরের সাথে কীভাবে মিথস্ক্রিয়া করছে। শোনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শব্দের তীব্রতা বা ছন্দ প্রত্যক্ষণ করতে পারে। স্পর্শ করে শিক্ষার্থী বুঝতে পারে বস্তুর গঠনশৈলী (Texture) ও আকৃতি। জিহ্বার সাহায্যে স্বাদ গ্রহণ করে রাসায়নিক দ্রব্যের স্বাদ (লবণাক্ততা, তিক্ততা) ইত্যাদি বুঝতে পারা যায়। নাকের সাহায্যে শিক্ষার্থী পারে গন্ধ নির্ণয় করতে।

শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ দক্ষতা শেখাতে ও অনুশীলন করাতে শিক্ষক একটি রাসায়নিক পদার্থ একজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে তার আকৃতি, রং, গন্ধ, গঠনশৈলী (শক্ত বা নরম) ইত্যাদি নির্ণয় করতে বলতে পারেন। তবে কোনো কিছুর স্বাদ পরীক্ষা করতে দেওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান হতে হবে। কোনো অজানা দ্রব্যের স্বাদ নিতে না দেওয়াই ভালো কারণ অজানা কোনো দ্রব্যে ক্ষতিকর বা বিষাক্ত কোনো কিছু থাকতে পারে।

(খ) সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান (Inferring) : সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান পর্যবেক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত একটি দক্ষতা। এটি হলো আমরা যে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করি তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা প্রদান। রসায়নে সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহুলব্যবহৃত দক্ষতা। বাংলাদেশের অনেক লেখক একে 'সিদ্ধান্ত' হিসেবে লেখেন যা প্রকৃত অর্থ বহন করে না। যেমন– একটি পরিষ্কার দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মেশানো হলো। একটি সাদা অধঃক্ষেপ পড়লো। এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হিসেবে বলা যেতে পারে যে, এটি সিলভার ক্লোরাইডের অধঃক্ষেপ। অর্থাৎ প্রথম দ্রবণটিতে ক্লোরাইড আয়ন রয়েছে।

সারণি ১.১: সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বা Inferring
পরিষ্কার নমুনা দ্রবণের কিছু অংশ একটি টেস্টটিউবে নিয়ে এর সাথে কিছু পরিমাণ সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মেশাই।	সাদা অধঃক্ষেপ পড়লো	যেহেতু সিলভার নাইট্রেট দ্রবণে সিলভার আয়ন রয়েছে এবং সিলভার ক্লোরাইড সাদা বর্ণের ও পানিতে অদ্রবণীয়, সেহেতু বলা যায় যে, অধঃক্ষেপটি সম্ভবত সিলভার ক্লোরাইডের। অর্থাৎ নমুনা দ্রবণে ক্লোরাইড আয়ন ছিল।

সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। আমরা জানি অধঃক্ষেপটি সিলভার ক্লোরাইডের; এটি নিশ্চিত হতে পারলে নিশ্চিত হতে পারবো যে নমুনাতে ক্লোরাইড আয়ন রয়েছে। এটি করার জন্য অধঃক্ষেপটিতে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হয়। অধঃক্ষেপটি দ্রবীভূত হয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় যে অধঃক্ষেপটি সিলভার ক্লোরাইডের-ই ছিল এবং মূল নমুনাতে ক্লোরাইড আয়ন আছে।

(গ) পরিমাপ/মাপকরণ : কোনো কিছুর পরিমাণ জানার জন্য পরিমাপ করা হয়। রসায়নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিমাপ করতে হয়। কোনো দ্রবণ প্রস্তুতিতে সঠিক ভরের দ্রব এবং সঠিক আয়তনের দ্রাবক নিতে হয়। গুণগত বিশ্লেষণে যদিও একদম সঠিক পরিমাণ জানতে হয় না তবুও সঠিক ফল পেতে ও রাসায়নিক দ্রব্য অপচয় রোধ করতে পরিমাপের দরকার হয়। আর যে কোনো ধরনের গুণগত বিশ্লেষণে তো সঠিক পরিমাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(ঙ) যোগাযোগ বা ফল প্রকাশ : পর্যবেক্ষণ হতে পাওয়া উপাত্তকে কোনো নির্দিষ্টরূপে লিপিবদ্ধ বা প্রকাশ করতে হয় যাতে অন্যরা উপাত্তসমূহকে বুঝতে পারে অথবা পর্যবেক্ষণকারী নিজেই পরে কোনো এক সময়ে তা বুঝতে পারে। বিভিন্নভাবে যোগাযোগ করতে বা উপাত্ত উপস্থাপন করতে হয়। সঠিক চিত্র আঁকা, সঠিক চার্ট ও লেখচিত্র (Graph) তৈরি, যথাযথ মডেল নির্মাণ এবং পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনার মাধ্যমে কোনো বস্তু বা ঘটনাকে প্রকাশ করতে হয়।

(চ) পূর্বানুমান (Prediction) : আমরা দৈনন্দিন জীবনে নানাক্ষেত্রে পূর্বানুমান করি। পূর্বানুমান হলো জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে ভবিষ্যতে বা অন্য কোনো ক্ষেত্রে কী ঘটতে পারে তার পূর্বাভাস। বৈশাখ মাসে উত্তর পশ্চিম আকাশে কালো মেঘ দেখলে আপনি কী করবেন? নিশ্চয়ই তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন? আমরা পূর্বানুমান করি যে, কিছুক্ষণ পরেই কালবৈশাখী শুরু হবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি ঘটে থাকে কারণ পূর্বানুমানটি অনেক বছরের জানা তথ্যের উপর ভিত্তি করে করা। এক্ষেত্রে আপনি বছরের পর বছর দেখে এসেছেন যে, বৈশাখ মাসে উত্তর-পশ্চিম আকাশের কোণে কালো মেঘ করলে তার পরই কালবৈশাখী শুরু হয়। বিজ্ঞানে পূর্বানুমান একটি মৌলিক দক্ষতা। রসায়ন চর্চায় বা গবেষণায় ও বিজ্ঞান শিখন-শেখানোতে পূর্বানুমান একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন– আপনি ২৫০ মিলিলিটার- এর একটি সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করবেন। এখানে নিশ্চয়ই

আপনি পূর্বানুমান করবেন যে, কতটুকু দ্রব আপনি যোগ করবেন। আপনি নিশ্চয়ই আন্দাজে দ্রব যোগ করে ফেলবেন না। **মনে রাখতে হবে পূর্বানুমান কখনই শুধু আন্দাজ বা অনুমানের বিষয় নয়, পূর্বানুমান অবশ্যই জানা তথ্যের ভিত্তিতে হতে হবে।**

(ছ) পরীক্ষণ : সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি পরীক্ষণ হলো "কী ঘটবে তা দেখার জন্য কিছু একটা করা" (O'Brien, 2006, p. 99)। আমরা পূর্বে বর্ণিত দক্ষতাগুলোতে দেখেছি যে, ঐ ধরনের কজে আমরা নিজেরা কোনো কিছু পরিবর্তন করি না। যা আছে বা ঘটছে তা-ই পর্যবেক্ষণ করি, বর্ণনা করি, পরিমাপ করি, সম্ভাব্য ব্যাখ্যাদান করি, শ্রেণিকরণ করি অথবা পূর্বানুমান করি। কিন্তু পরীক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো কিছু (বস্তু, উপাদান বা ঘটনা) পরিবর্তন করে দেখি তার ফল কী হয়? একটি উদাহরণ দিলেই পরীক্ষণের ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে। একটি পাত্রে এক লিটার পানি রয়েছে। পাত্রসহ পানিকে যদি শুধু রেখে দেওয়া হয় তাহলে কী ঘটবে? আমরা দেখবো যে আধঘণ্টা সময়ে তেমন কিছুই হয়তো ঘটবে না। কিন্তু একই সময়ে আমরা যদি আরেকটি পাত্রে (একই ধরনের) এক লিটার পানি নিয়ে চুলার উপরে বসিয়ে তাপ দিই তা হলে দেখা যাবে কিছুক্ষণ পরে পানি ফুটতে শুরু করেছে এবং আধঘণ্টা পরে পানি অনেকটা কমে গেছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আমরা নিজেরা কিছু একটা করেছি (তাপ দিয়েছি)। এটি একটি পরীক্ষণ।

পরীক্ষণ দক্ষতা মূলত একটি সমন্বিত প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা। কারণ একটি পরীক্ষণে অন্যান্য প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। যেমন, ওপরে বর্ণিত পরীক্ষণে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপ (পানি মেপে নেওয়া ও পরীক্ষণ শেষে আবার মাপা) দক্ষতাসমূহ প্রয়োগের দরকার হবে। পরীক্ষণের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। একটি হলো কী পরীক্ষা করা দরকার তার একটি ধারণা (অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ) এবং অন্যটি হলো চলক (variable) নিয়ন্ত্রণ করা।

অনুমিত সিদ্ধান্ত : কোনো কিছু পরিবর্তন ঘটানোর মাধ্যমে পরীক্ষা (Test) বা যাচাই করার আগে 'কী পরিবর্তন করলে কী ঘটবে' এ সম্পর্কে অনুসন্ধানকারীর (বিজ্ঞানী হতে পারেন, শিক্ষার্থী অনুসন্ধানকারী হতে পারেন) ধারণা করা দরকার। এই অগ্রিম ধারণা গ্রহণ করায় অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। যেমন, পানি নিয়ে কোনো পরীক্ষণের আগে শিক্ষার্থীরা নানা ধরনের অনুমিত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যেমন, পানিকে তাপ দিলে পানির অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। অথবা পানিকে তাপ দিলে পানি ফুটবে এবং বাষ্প হয়ে উড়ে যাবে। শিক্ষার্থীদের এসব ধারণা অবশ্যই তাদের অভিজ্ঞতা ও পূর্বজ্ঞান থেকে করে থাকে। ওপরে উল্লিখিত দু'টি অনুমিত সিদ্ধান্তই যাচাই করে দেখা যেতে পারে সত্যিই তা ঘটে কিনা। এভাবে অনুমিত সিদ্ধান্ত হলো 'এটি করলে এটি ঘটবে' এমন একটি ধারণা যা পরীক্ষা করার যোগ্য।

চলক নিয়ন্ত্রণ : পরীক্ষণের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হতে পারি কোনো কিছু পরিবর্তন করলে কী ঘটে অথবা কোনো ঘটনার ওপর কোনো নিয়ামক কীরূপ প্রভাব ফেলে। আমরা যদি সঠিকভাবে নির্ণয় করতে চাই কোনো একটি নিয়ামক কোনো ঘটনা বা বস্তুর ওপর কীরূপ প্রভাব ফেলে তা হলে আমরা কেবল ঐ নিয়ামক বা চলকটিই কেবল পরিবর্তন করতে পারবো; অন্য সব নিয়ামক বা অবস্থা একই বা স্থির রাখতে হবে। যেমন, অ্যামোনিয়া উৎপাদনে তাপমাত্রার প্রভাব কী তা বোঝার জন্য একজন গবেষক চাপ ও অন্যান্য চলক স্থির রেখে শুধু তাপমাত্রা পরিবর্তন করে বিভিন্ন তাপমাত্রায় উৎপাদের পরিমাণ নির্ণয় করে দেখেন যে, তাপমাত্রা পরিবর্তনে উৎপাদের পরিমাণ কমে বা বাড়ে কি না।

বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আস্থা

বিজ্ঞান শেখা, বিজ্ঞানের চর্চা, দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার - সবগুলো ক্ষেত্রেই একজন মানুষের সর্বাগ্রে দরকার বিজ্ঞানের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও আস্থা। তাকে এই মনোভাব পোষণ করতে হবে যে, প্রকৃতি জগতের সবকিছু মানুষের কাছে বোধগম্য বা মানুষের পক্ষে বোঝা সম্ভব এবং প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনাবলি বোঝার জন্য বা ব্যাখ্যা করার জন্য বিজ্ঞানই সর্বোত্তম। জ্ঞানের অন্যান্য শাখা অন্যান্য ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে পারে তবে প্রকৃতি সম্পর্কিত কোনো ঘটনা, রহস্য কিংবা সমস্যা উন্মোচনে বিজ্ঞানের বিকল্প নেই। আমাদের কাছে অনেক ঘটনাকে আপাত দৃষ্টিতে অতি-প্রাকৃতিক মনে হতে পারে, কিন্তু আমাদের আস্থা থাকতে হবে যে, কেবল বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মাধ্যমেই ঐ ঘটনা উন্মোচন করা যাবে।

বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধ

মূল্যবোধ শব্দটিকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। আমরা কোনো কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করলে সে অনুযায়ী কাজ করি। আপনি যদি সততাকে মূল্য দেন, তা হলে আপনি ব্যক্তিজীবনে সৎ থাকবেন। এখানে সততা আপনার একটি নীতি। তেমনি আপনি যদি কোনো একটি বিষয় সম্পর্কে যে কোনো ব্যাখ্যা খোলা মনে শোনেন বা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকেন তাহলে বলা যায় যে, আপনার 'খোলামনস্কতা' রয়েছে। উপরিউক্ত দু'টি নীতি বা আদর্শ - সততা ও খোলামনস্কতা - কে আমরা মূল্যবোধ বলতে পারি। সহজভাবে বলা যায় যে, মূল্যবোধ হলো আমাদের ভেতরকার কিছু আদর্শমান, নীতি বা জীবনাদর্শ যা আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আচরণ বা কাজকে নির্দেশনা (Guide) দেয়।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও মূল্যবোধ গঠন : প্রকৃতপক্ষে, আমরা বিভিন্নভাবে মূল্যবোধ গঠন বা অর্জন করে থাকি। যেমন, পরিবার থেকে, সমাজ থেকে, ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে। এখন অবশ্য শিক্ষাব্যবস্থা থেকেই মূল্যবোধ অর্জনের গুরুত্ব দেওয়া হয়। আপনাদের হয়তো অনেকেরই মনে আছে আমরা স্কুল জীবনের পাঠ্যবইয়ে অনেক গল্প কবিতা পড়েছি যা থেকে মূল্যবোধ অর্জন করেছি। যেমন সোনার হরফে লেখা নাম গল্পে দেখেছি একজন মানুষ অন্যদেরকে বাঁচাতে গিয়ে কীভাবে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। অথবা বীরশ্রেষ্ঠ ও অন্যান্য মুক্তিযোদ্ধারা কীভাবে নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন। এসব গল্প থেকে আমরা দেশপ্রেম ও মানবতা অর্জন করি। একইভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের বেশ কিছু মূল্যবোধ গঠন করতে পারি। নিচে এরকম কয়েকটি মূল্যবোধ, তাদের ব্যাখ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে মূল্যবোধটি গঠনের উপায়সমূহ আলোচনা করা হলো। মনে রাখতে হবে যে, একটি মূল্যবোধ বিভিন্ন উপায়ে প্রসার ঘটানো যেতে পারে। নিচের তালিকায় দু'একটি কাজের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মাত্র।

সারণি ১.২: কয়েকটি মূল্যবোধ, তাদের অর্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনে মূল্যবোধ গঠন ও চর্চার উপায়

মূল্যবোধ (সমার্থক শব্দ বন্ধনীতে দেওয়া হয়েছে)	**মূল্যবোধটিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে**	**মূল্যবোধটিকে যেভাবে শিক্ষার্থীদের মনে গঠন করা যেতে পারে**
অনুসন্ধিৎসা (কৌতূহল)	নতুন কিছু সম্পর্কে জানার/ অনুসন্ধান করার ইচ্ছা।	শিক্ষার্থীদের তার নিকট পরিবেশের বিভিন্ন বস্তু ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীকে এ নিয়ে প্রশ্ন করতে সবসময় উৎসাহ দেবেন।
খোলামনস্কতা (মুক্ত মানসিকতা)	নতুন কোনো ধারণাকে বিবেচনা ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক থাকা, নতুন তথ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে নিজের ধারণা ও বিশ্বাস পরিবর্তনে প্রস্তুত থাকা, পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ না থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।	বিজ্ঞানের যে কোনো ধারণা/তত্ত্ব সম্পর্কে একজন শিক্ষার্থীর ব্যাখ্যা মনোযোগ দিয়ে শিক্ষক শুনবেন। শিক্ষক কখনও বিজ্ঞান বা অন্য কোনো ধরনের জ্ঞান বা বিশ্বাসকে পরম সত্য হিসেবে তুলে ধরবেন না কিংবা কোনো জ্ঞান বা বিশ্বাসকে পরম মিথ্যা হিসেবেও তুলে ধরবেন না। একজন শিক্ষার্থীর বক্তব্য অন্যদের শুনতে উৎসাহিত করবেন।
যাচাই প্রবণতা	এটি খোলামনস্কতার পরিপুরক। একজন মানুষ যে কোনো নতুন ধারণা বিবেচনা ও গ্রহণ করতে ইচ্ছুক/প্রস্তুত থাকবেন। কিন্তু কোনো কিছুই আবার বিনা প্রশ্নে বা যাচাই না করে গ্রহণ করবেন না। যে কোনো কিছু বিশ্বাস বা গ্রহণ করার আগে সে সম্পর্কে ভালোভাবে যাচাই করে, প্রশ্ন করে নেবেন।	শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কোনো কিছু বা বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত ধারণা সম্পর্কে প্রশ্ন করতে উৎসাহিত করবেন। এমনকি শিক্ষক তার নিজের বক্তব্য সম্পর্কেও প্রশ্ন করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন। কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ফলস্বরূপ সমাজে সংঘটিত যেসব দুঃখজনক ঘটনা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয় সেসব নিয়ে প্রশ্ন করতে ও যাচাই করতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন।
পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের উপর নির্ভরশীলতা	কোনো কিছু ব্যাখ্যা করা বা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণলব্ধ উপাত্তের উপর নির্ভর করা	বিজ্ঞানকে অন্য কোনো বিষয়ের মত মুখস্থ করাবেন না বা কোনো ধারণা কেবল তত্ত্বীয়ভাবে ব্যাখ্যা করবেন না, চেষ্টা করবেন পর্যবেক্ষণ, প্রদর্শন ও পরীক্ষণ এর মাধ্যমে বিজ্ঞানের ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ সম্ভব না হলে পরীক্ষালব্ধ যে উপাত্ত পাওয়া যায় তা উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ করে শিক্ষক ধারণাটি উপস্থাপন করবেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. রসায়ন কী?
২. একটি উদাহরণের সাহায্যে বৈজ্ঞানিক সূত্র বলতে কী বোঝায় তা ব্যাখ্যা করুন।
৩. রসায়নের সাথে জীববিজ্ঞানের সম্পর্ক একটি উদাহরণের সাহায্যে দেখান।
৪. একটি উদাহরণের সাহায্যে 'সম্ভাব্য ব্যাখ্যা' দক্ষতাটি বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. রসায়ন কী কী নিয়ে কাজ করে? উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করুন।
২. বিজ্ঞানের জ্ঞানের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করুন।
৩. আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের ব্যবহার তুলে ধরে রসায়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।
৪. রসায়ন শিক্ষা কীভাবে বৈজ্ঞানিক সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা করতে পারে তা আলোচনা করুন।
৫. রসায়ন শিক্ষা কী কী মূল্যবোধ অর্জনে সহায়তা করতে পারে তা আলোচনা করুন।

ইউনিট ২ : মাধ্যমিক পর্যায়ে রসায়ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

একটি দেশের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষার্থীরা কী জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ অর্জন করবে তা বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা থাকে শিক্ষাক্রমে। শিক্ষার্থীরা কোন স্তরে, কোন শ্রেণিতে, কোন বিষয়ে কী অর্জন করবে তার তালিকা শিক্ষাক্রমে নির্ধারণ করা থাকে। আরো অন্তর্ভুক্ত থাকে শিক্ষার্থীরা কী ধরনের শিখন অভিজ্ঞতা পাবে এবং কীভাবে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা হবে। শিক্ষাক্রমে যে শিখন উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ থাকে তা অর্জনের জন্য পাঠ্যপুস্তকে নির্দিষ্ট বিষয়ের বিষয়বস্তু বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করা হয়। আমাদের এ অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় হলো নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন বিষয়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক। এ ইউনিটটি নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

২.১ শিক্ষাক্রমে রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও ফোকাস

২.২ রসায়ন পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

২.১ শিক্ষাক্রমে রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও ফোকাস

আমরা প্রথম ইউনিটে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এটি এখন বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, বিদ্যালয়ে বিশেষ করে নবম-দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শেখানোর মূল লক্ষ্য হলো তাদের বৈজ্ঞানিকভাবে সাক্ষর করে গড়ে তোলা। এর পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শেষের দিকে শিক্ষার্থীদের পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন ও জীববিজ্ঞানের একটি শক্ত ভিত্তি গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় যাতে তারা উচ্চতর শ্রেণিতে বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশল ও প্রযুক্তির নানা বিষয়ে পড়ার সক্ষমতা অর্জন করে। রসায়ন শিক্ষাবিদেরা রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য হিসেবে এই দু'টি লক্ষ্যকে গ্রহণ করে রসায়ন শিখন-শেখানো পরিচালনা করার কথা বলেন।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১২ সালে নতুন শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষাক্রমের অন্যতম ভিত্তি হলো ২০১০ সালে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি। আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষানীতিতে বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীদের এমনভাবে প্রস্তুত করা যেন প্রতিভা বিকাশ, জ্ঞান সাঅণুা এবং সৃজনশীলতায় তারা আন্তজার্তিক মান অর্জন করতে পারে।
- বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে প্রযুক্তি শিক্ষা এবং মানবিক শিক্ষার যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের একটি যে অন্যটির পরিপূরক এই বিষয়টি মাথায় রেখে একটা সমন্বিত শিক্ষার অংশ হিসেবে বিজ্ঞান শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরা। (জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, পৃষ্ঠা ২৯)

আমরা যদি প্রথম লক্ষ্যটি লক্ষ করি তাহলে দেখা যাচ্ছে, আমাদের বিজ্ঞান তথা রসায়ন শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানের করার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে আমরা ধরে নিতে পারি যে, বিশ্বব্যাপী রসায়ন শিক্ষার যে লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিখানো-শেখানো পদ্ধতি এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি রয়েছে, আমদেরও তা অনুসরণ করা দরকার। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই আমরা এখন দেখবো আমাদের শিক্ষাক্রমে রসায়ন শিক্ষার কী লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে কিংবা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে কী বিষয়ের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মাধ্যমিক রসায়ন শিক্ষাক্রমের ভূমিকাতে এই শিক্ষাক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এছাড়া নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য থেকে শিক্ষার্থীরা কেন রসায়ন পড়বে তার ধারণা পাওয়া যায়। শিক্ষাক্রমের ভূমিকাতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, এ শিক্ষাক্রমে "দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের প্রয়োগ, হাতে কলমে কাজ ও রসায়নের প্রক্রিয়ার প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে" যাতে বাস্তব উদাহরণের সাথে সম্পর্কিত করে শিক্ষার্থীরা বিষয়বস্তুকে সহজে অনুধাবন ও বিশ্লেষণ করতে পারবে। আরো বলা হয়েছে যে, মুখস্থ বিদ্যা নিরুৎসাহিত করে শিক্ষার্থীদের কর্ম দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদ হিসেবে তৈরি করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীদের রসায়নের প্রতি উৎসাহ বাড়ানোর জন্য এই শিক্ষাক্রমের কলেবর না বাড়িয়ে জীবনঘনিষ্ঠ করা হয়েছে। একইসাথে প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে সংঘটিত ঘটনাবলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধিৎসা মেটানোর দিকেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষাক্রমের ভূমিকাতে উল্লিখিত বক্তব্যে প্রতিফলন ঘটেছে শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত উদ্দেশ্যগুলোতে। এ উদ্দেশ্যগুলোতে দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার্থীরা রসায়ন কী তা সম্পর্কে জানবে; রসায়নের তথ্য, তত্ত্ব ও কৌশল সম্পর্কে জানবে ও অনুসন্ধিৎসু হবে; আমাদের দৈনন্দিন জীবনে এবং কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও গৃহে ব্যবহার্য সামগ্রীর রসায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এদের

প্রভাব সম্পর্কে জেনে তা প্রয়োগ করতে পারবে। শিক্ষার্থীরা হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান দক্ষতাও অর্জন করবে। বিজ্ঞান সাক্ষরতা অর্জন এবং বিজ্ঞানের শক্ত ভিত্তি তৈরি - বিজ্ঞান তথা রসায়ন শিক্ষার দু'ধরনের লক্ষ্যের সাথেই সঙ্গতিপূর্ণ এ উদ্দেশ্যগুলো।

উদ্দেশ্য

১. রসায়নের ধারণা, স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

২. রসায়নের তথ্য, তত্ত্ব ও কৌশল সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর প্রতি অনুসন্ধিৎসু হওয়া।

৩. পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

৪. মোল-এর ধারণা লাভ করে রাসায়নিক গণনা করতে পারা।

৫. পদার্থসমূহের পরিবর্তনের সাথে শক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ, পরিবর্তন ও শক্তিকে যৌক্তিকভাবে ব্যবহার এবং শক্তি উৎপাদনে উপযুক্ত পদ্ধতি নির্বাচন করতে সক্ষমতা অর্জন করা।

৬. রাসায়নিক সমতা সম্পর্কে জেনে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সক্ষমতা অর্জন করা।

৭. দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় ধাতব ও অধাতব পদার্থ সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর পুনঃব্যবহারে উৎসাহী হওয়া।

৮. আমাদের জীবনে কার্বন যৌগের ব্যবহার ও গুরুত্ব অনুধাবন করা।

৯. কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য ও গৃহে ব্যবহার্য সামগ্রীর রসায়ন এবং স্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর এদের প্রভাব সম্পর্কে জেনে স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব দ্রব্য ব্যবহারে আগ্রহী হওয়া।

১০. ব্যবহারিক/ হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে অনুসন্ধান দক্ষতা অর্জন করা।

(মাধ্যমিক বিজ্ঞান শিক্ষাক্রম, ২০১২, পৃষ্ঠা - ১৬৮)

রসায়ন শিক্ষাক্রমের ফোকাস

শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত রসায়ন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন, প্রথম অধ্যায়টি হলো রসায়নের ধারণা। এতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়বস্তু শিক্ষাক্রমে প্রথম উদ্দেশ্যটি অর্জনে সহায়ক।

প্রথম উদ্দেশ্য : ১. রসায়নের ধারণা, স্বরূপ ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানা।

প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু : রসায়ন পরিচিতি, রসায়নের পরিধি, রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক, রসায়ন পাঠের গুরুত্ব, রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা, অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষণ, রসায়নে অনুসন্ধানের সময়ে, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

আমরা দেখতে পাচ্ছি, প্রথম অধ্যায়ে রসায়ন কী, এর পরিধি বা এটি কী নিয়ে কাজ করে, রসায়নের সাথে অন্যান্য বিজ্ঞানের কী সম্পর্ক, রসায়নে কীভাবে অনুসন্ধান করা হয় এ সম্পর্কে বিস্তারিত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ক জ্ঞান শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান সাক্ষরতা অর্জনে সহায়তা করে। একইসাথে ভবিষতে বিজ্ঞান অধ্যয়ন ও চর্চায় আগ্রহী করে তোলে।
প্রথম অধ্যায়ের মতো অন্যান্য অধ্যায়ের ফোকাসগুলো নিচে উপস্থাপন করা হলো।

অধ্যায় ২ : পদার্থের বিভিন্ন অবস্থা ও ঘটনা কণার গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। রসায়ন পাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাপন ও নিঃসরণের ধারণা দেওয়া হয়েছে। কঠিন পদার্থের গলন, ঊর্ধ্বপাতন ও তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া নির্ণয়ের জন্য হাতে কলমে কাজ করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

অধ্যায় ৩ : এই অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু পদার্থের গঠন একক পরমাণুর গঠন। একটি পরমাণু কী ধরনের কণিকা দিয়ে গঠিত এবং তারা কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এ অধ্যায়ে। পরমাণুর গঠন সম্পর্কে রাদারফোর্ড ও বোরের মডেল এবং পরমাণুতে বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রন কীভাবে বিন্যস্ত রয়েছে তা জানার ব্যাপারে এ অধ্যায়ে জোর দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ৪ : আধুনিক রসায়নের সাথে পরিচিত করার লক্ষ্যে সর্বাধুনিক পর্যায় সারণি দেওয়া আছে। পর্যায় সারণির বিকাশের পটভূমি, পর্যায় সারণির ভিত্তি ও গুরুত্ব, পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থানের সাথে এর রাসায়নিক ধর্মের সম্পর্ক, পর্যায় সারণির পর্যায় ও গ্রুপের নামকরণ এই বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এর সাথে পর্যায় সারণির একই গ্রুপের মৌলদের রাসায়নিক ধর্মের পরীক্ষা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

অধ্যায় ৫ : রাসায়নিক বন্ধন এই অধ্যায়ের আলোচ্যসূচি। অষ্টক ও দুই এর নিয়মের আলোকে বন্ধন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আয়নিক ও সমযোজী বন্ধন গঠনের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আয়নিক, সমযোজী ও ধাতব বন্ধনযুক্ত পদার্থের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর হয়েছে। পরীক্ষার মাধ্যমে আয়নিক ও সমযোজী যৌগ সনাক্তকরণ বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৬ : বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে মোলের ধারণা দেওয়া হয়েছে। রাসায়নিক গণনার মূল ধারণা মোল; এই মোলের ধারণার বিভিন্ন প্রয়োগ দেখানো হয়েছে এই অধ্যায়ে। যেমন, মোলার দ্রবণ প্রস্তুতকরণ, উৎপাদের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় এবং শতকরা সংযুতি থেকে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। রাসায়নিক সমীকরণের মাত্রিক তাৎপর্য থেকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ভরভিত্তিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান এ অধ্যায়ের অন্যতম আলোচ্য। এছাড়াও তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় পদ্ধতি বর্ণনা করা হয়েছে।

অধ্যায় ৭ : এ অধ্যায়ে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ, বিক্রিয়ার হার, বাস্তবজীবনে বিভিন্ন বিক্রিয়া ও তার প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে। বিক্রিয়ার দিক, বিক্রিয়ার তাপের পরিবর্তন ও ইলেকট্রন স্থানান্তর এর উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। প্রকৃতিতে ও পরীক্ষাগারে সংঘটিত বিক্রিয়ার সাথে পরিচয় ঘটানো হয়েছে। বিশেষ করে আমাদের বাস্তব জীবনে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও কাজ তুলে ধরা হয়েছে এ অধ্যায়ে।

অধ্যায় ৮ : এ অধ্যায়টি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সাথে শক্তির সম্পর্ক নিয়ে। একটি রাসায়নিক বিক্রিয়ায় হয় শক্তি শোষিত হয় অথবা শক্তি উৎপন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন শক্তিকে বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত করে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজে ও শিল্পে ব্যবহার করি। রাসয়নিক শক্তিকে কাজে লাগানো সম্পর্কে ধারণা প্রদান এ অধ্যায়ের ফোকাস।

অধ্যায় ৯ : রাসায়নিক পদার্থসমূহের মধ্যে অম্ল ও ক্ষারক ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুই ধরনের পদার্থ। এরা একে অন্যকে প্রশমিত করে লবণ উৎপন্ন করে। মানুষসহ অন্যান্য জীবের জীবন অম্ল ও ক্ষারের সাম্যাবস্থার উপরে নির্ভরশীল। এ অধ্যায়ে অম্ল ও ক্ষারের বৈশিষ্ট্য এবং এদের সাম্যাবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পরিচিত পরিবেশের পদার্থগুলোর মধ্যে অম্ল, ক্ষার ও লবণকে সনাক্ত করানোর উপায় দেওয়া হয়েছে। এছাড়া পানির খরতা ও পানির দূষণ এবং আমাদের জীবনে এই দু'টি বিষয়ের প্রভাব এ অধ্যায়ের অন্যতম ফোকাস।

অধ্যায় ১০ : ভূ-ত্বকে রয়েছে বিভিন্ন মূল্যবান পদার্থ যা আমাদের নানা প্রয়োজন মেটাতে পারে। এদের আমরা খনিজ পদার্থ বলি। খনিজ পদার্থসমূহ ভূ-ত্বকে যেভাবে থাকে সেভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারি না। খনিজ পদার্থসমূহকে আমাদের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক প্রক্রিয়া প্রয়োগ করতে হয়। খনিজ পদার্থসমূহের মধ্যে মূল্যবান ধাতু ও অধাতুকে ব্যবহার উপযোগী করার প্রক্রিয়াসমূহ এ অধ্যায়ে উপস্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের খনিজ সম্পদের ব্যবহারে সতর্কতা ও সংরক্ষণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়েছে।

অধ্যায় ১১ : খনিজ পদার্থের মধ্যে অন্যতম প্রয়োজনীয় হলো জীবাশ্ম জ্বালানি। জীবাশ্ম জ্বালানি পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এদের থেকে প্রাপ্ত জৈব যৌগ এ অধ্যায়ের আলোচ্য। এ অধ্যায়ে আমাদের জীবন ও পরিবেশের উপর জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহারের প্রভাব ব্যাখ্যা করে জীবাশ্ম জ্বালানির সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সঠিক দিক নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

অধ্যায় ১২ : পূর্ববর্তী সবগুলো অধ্যায়েই প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও শিল্পে রাসায়নিক সামগ্রীর ব্যবহার আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে বিশেষ করে গৃহে ও কৃষি কাজে ব্যবহার্য কতিপয় সামগ্রীর আহরণ ও প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহারসহ এদের সুফল এবং নেতিবাচক প্রভাব আলোচনা করা হয়েছে।

রসায়ন শিক্ষাক্রমের বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- এতে রসায়ন কী সে সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা দেওয়া হয়েছে।
- **'জীবনের জন্য রসায়ন'** হিসেবে বর্তমান শিক্ষাক্রমটি উপস্থাপন করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট রসায়ন বোঝার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। রসায়নের তাত্ত্বিক বিষয়বস্তুকে বাস্তব জীবনে সংঘটিত ঘটনার সাথে সম্পর্কিত করার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। বাস্তব জীবনের প্রয়োজনে প্রয়োগ করার উপযোগী ব্যবহারিক কাজ সংযুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় যে, এই শিক্ষাক্রম **দূষণমুক্ত পরিবেশ** গঠনে সাহায্য করবে; এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে **স্বাস্থ্য সচেতন** করার চেষ্টাও নেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় যে, এ শিক্ষাক্রম সমাপনান্তে শিক্ষার্থীরা স্বাস্থ্য ও পরিবেশ উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য নির্বাচন ও ব্যবহার করতে পারবে।

- বিজ্ঞান তথা রসায়ন শিখন-শেখানো কার্যক্রম **শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক** করার ওপরে এ শিক্ষাক্রমে জোর দেওয়া হয়েছে। এজন্য শিখন-শেখানো কাজ পরিকল্পনা ও পরিচালনা করার ক্ষেত্রে গঠনবাদী শিখন-শেখানো এপ্রোচ অনুসরণের কথা বলা হয়েছে।
- শিখন-শেখানো কাজে **সহজলভ্য ও স্বল্পমূল্যের দ্রব্য (শিখন সামগ্রী)** ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে।
- **ব্যবহারিক কাজকে** তত্ত্বীয় বিষয়বস্তুর সাথে সংগতি রেখে ও তত্ত্বীয় বিষয়বস্তু শেখানোর সাথে সাথে সম্পন্ন করার জন্য সাজানো হয়েছে। এজন্য ব্যবহারিক বা অনুসন্ধানমূলক কাজ প্রতিটি অধ্যায়ে প্রযোজ্য তত্ত্বীয় ধারণার সাথে সমন্বিতভাবে দেওয়া হয়েছে। কার্যত রসায়ন শিখনকে অনুসন্ধান ভিত্তিক (Inquiry Based Learning) করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা রসায়নের কোন ধারণা শেখার জন্য **হাতে-কলমে সক্রিয় অনুসন্ধানের** মাধ্যমে ধারণাটি গঠন করার চেষ্টা করবে। অনুসন্ধানমূলক কাজকে **'শিক্ষার্থীর কাজ'** নামে একক কাজ, দলগত কাজ ও বাড়ির কাজ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে।

রসায়নে মূল্যায়নের নতুন দিক

রসায়ন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের অর্জিত জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ মূল্যায়নে নতুন কিছু কৌশলের কথা বলা হয়েছে । এগুলো হলো প্রশ্নোত্তর, পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন যাচাই। নিচে এগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো :

প্রশ্নোত্তর : প্রশ্নোত্তর গাঠনিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য একটি সহজ কৌশল। তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক যাই হোক না কেন, কোনো একটি বিষয় শিক্ষার্থী কতটুকু বুঝলো তা সহজেই যাচাই করা যায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে। প্রশ্ন হতে পারে বদ্ধ বা উন্মুক্ত উভয় রকমের।

পর্যবেক্ষণ : পর্যবেক্ষণ শিক্ষার্থীর মনোপেশীজ ও আবেগিক শিখনের মূল্যায়নের জন্য সবচেয়ে ভালো উপায়। এটি গাঠনিক ও ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য একটি কার্যকরী কৌশল। একজন শিক্ষার্থী একটি অনুসন্ধান কাজ বা দলগত কাজে কীভাবে অংশ নিচ্ছে, অনুসন্ধানের ধাপগুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কিনা, কোনো কিছু সঠিকভাবে পরিমাপ করছে কি না এসব কেবল পর্যবেক্ষণের মাধ্যমেই বোঝা সম্ভব। পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়ায় মূলত শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকার তথ্যাদি সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে শিক্ষককে পূর্বেই তার পর্যবেক্ষণের মানদণ্ড ঠিক করে নিতে হবে। সে কোন কোন দক্ষতার জন্য প্রমাণাদি খুঁজছে তা আগেই নির্ধারণ করতে হবে। এরপর একটি চেকলিস্ট তৈরি করে তা পূরণ করে সংরক্ষণ করতে হবে। একটি চেকলিস্ট হতে পারে এরকম :

সারণি ২.১ : প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতাসমূহের পরিমাপ

দক্ষতা	দক্ষতার স্তর				
	১ (সর্বনিম্ন)	২	৩	৪	৫ (সর্বোচ্চ)
পর্যবেক্ষণ : এক বা একাধিক ইন্দ্রিয়ের ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ। কোনো কোনো ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায়।					
যোগাযোগকরণ : মৌখিক বা লিখিত উপায়ে তথ্য দেওয়া বা আদান প্রদান করা। ছক, গ্রাফ, চিত্র এগুলোর সাহায্যে তথ্য উপস্থাপন					
শ্রেণিকরণ : পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা।					
সম্ভাব্য ব্যাখ্যা : পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য থেকে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা তৈরি।					

শিক্ষার্থীর আবেগিক শিখনের মূল্যায়ন করার জন্য পর্যবেক্ষণ অত্যাবশ্যক। যেমন, একজন শিক্ষার্থীর অনুসন্ধানমূলক কাজে কতটা আগ্রহী তা মূল্যায়নের জন্য পর্যবেক্ষণ করা দরকার।

প্রতিবেদন : প্রতিবেদন বিজ্ঞান শিখন মূল্যায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হতে পারে। শিক্ষার্থী বাড়ির কাজ বা কোনো অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পাদন করে তার ওপর প্রতিবেদন জমা দেবে। তবে কেবল প্রতিবেদন এর ওপর নির্ভর করে কোনো শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা উচিত নয়। কারণ কোনো শিক্ষার্থী কোনো অনুসন্ধান না করেই ভালো প্রতিবেদন লিখতে পারে। তাই প্রতিবেদনের সাথে পর্যবেক্ষণ সমন্বয় করে কোনো শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন করা ভালো।

বাংলাদেশে পরীক্ষা উন্নয়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধানে ধারাবাহিক মূল্যায়নের কৌশল প্রণয়ন করা হচ্ছে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের মতো রসায়নের শিক্ষার্থীদের অর্জিত দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়নের সুযোগ থাকবে।

২.২ রসায়ন পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে প্রণীত নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন পাঠ্যপুস্তকের বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো :

ক. অধ্যায় বিন্যাস : নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যবইয়ে **১২** টি অধ্যায় বা ইউনিট রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পৃষ্ঠাটি লক্ষ করি। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতেই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট এক বা একাধিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। এটি করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা অধ্যায়টির বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এরপর একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে যেখানে অধ্যায়টির আলোচ্য বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা দেওয়া হয়েছে। এই ভূমিকাটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কে অধ্যায়টিতে কী কী আছে তা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট কোনো চিত্র

প্রথম অধ্যায়

রসায়নের ধারণা

(The Concepts of Chemistry)

অধ্যায়ের ভূমিকা : বিষয়বস্তু সম্পর্কে সক্ষিপ্ত ধারণা

তোমরা যারা নবম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র তারা রসায়ন বইটি হাতে পেয়েছ। [illegible] হাতে পেয়ে কিছু প্রশ্ন তোমাদের মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে—রসায়ন বিষয়টি কী? কেনই [illegible]মরা রসায়ন পড়ব? অর্থাৎ রসায়ন আমাদের কী কাজে লাগে? রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার কি কোনো সম্পর্ক আছে? এসব বিষয়ের উত্তর এ অধ্যায়টি পড়লে জানতে পারবে।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা

- রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।
- রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর সম্প[illegible] করতে পারব।
- রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার বর্ণনা করতে পারব।
- বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষা করতে পারব।
- রসায়নে ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারব।
- প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনফল

ভূমিকার পর পরবর্তী পৃষ্ঠায় রাখা হয়েছে অধ্যায়ের জন্য শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত শিখনফলসমূহ, যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই পরিষ্কার ধারণা পান যে, শিক্ষার্থীরা এ অধ্যায় থেকে কী শিখবে তৃতীয় পৃষ্ঠা থেকে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়কে সাব-ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে। মূলত শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশীজ শিখনফলসমূহ চিন্তা করে এই সাব-ইউনিটগুলো তৈরি করা হয়েছে। অনেকক্ষেত্রেই একটি সাব-ইউনিট একটি পিরিয়ডে পড়ানো যাবে, তবে কোনো কোনো সাব-ইউনিট সম্পন্ন করতে একাধিক ক্লাস বা পিরিয়ড দরকার হতে পারে।

প্রথম অধ্যায়ের সাব-ইউনিট এবং তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট শিখনফলগুলো হলো :

সারণি ২.২ : সাব-ইউনিট ও শিখনফল

সাব-ইউনিট	শিখনফল
১.১ রসায়ন পরিচিতি	১. রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.২ রসায়নের পরিধি	২. রসায়নের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে।
১.৩ রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক	৩. রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.৪ রসায়ন পাঠের গুরুত্ব	৪. রসায়ন পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবে।
১.৫ রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়া	৫. নির্দিষ্ট ধাপসমূহ অনুসরণ করে রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণার পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবে। ৬. বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানমূলক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমিত সিদ্ধান্ত (hypothesis) গঠন ও পরীক্ষণ (testing) করতে পারবে।
১.৬ রসায়নে অনুসন্ধানের সময়ে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা	৭. রসায়নে ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করতে পারবে।

একটি সাব-ইউনিট বা ধারণা উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বর্ণনা, ব্যাখ্যা, চিত্র ইত্যাদি যেমন রাখা হয়েছে, তেমনি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের জন্য অনুসন্ধানমূলক কাজ রাখা হয়েছে। একটি অধ্যায়ের প্রতিটি সাব-ইউনিট উপস্থাপন শেষে অনুশীলনী রাখা হয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টার মধ্য দিয়ে ঐ অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ধারণাসমূহ পাকাপোক্ত করার সুযোগ পাবে।

খ. অনুসন্ধানমূলক কাজ ও ব্যবহারিক কাজ

বর্তমানে নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো রসায়নের ব্যবহারিক কাজ সংশ্লিষ্ট তাত্ত্বিক ধারণার সাথেই আছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কাজ তত্ত্বীয় ধারণা যাচাই ও শক্তিশালী করার জন্য দেওয়া আছে, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তত্ত্বীয় ধারণা গঠনের উদ্দেশ্যে ব্যবহারিক কাজটি আগেই করানোর সুযোগ আছে। কার্যত রসায়ন শিখনকে অনুসন্ধান ভিত্তিক (Inquiry Based Learning) করার চেষ্টা করা হয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা রসায়নের কোনো ধারণা শেখার জন্য **হাতে-কলমে সক্রিয় অনুসন্ধানের** মাধ্যমে ধারণাটি গঠন করার চেষ্টা করবে। অনুসন্ধানমূলক কাজকে পরীক্ষণ এবং **'শিক্ষার্থীর কাজ'** নামে একক কাজ, দলগত কাজ ও বাড়ির কাজ হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। নিম্নের বক্সে এরকম একটি ব্যবহারিক কাজের উদাহরণ দেওয়া হলো। ব্যবহারিক কাজটি পাঠ্য বইয়ের ষষ্ঠ (মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা) অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এরকম পরীক্ষণ কাজের সাথে সাথে স্ব-শিখনের জন্য শিক্ষার্থীদের একক, দলগত ও বাড়ীর কাজও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে।

পরীক্ষণ

পরীক্ষণের নাম: তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়।

মূলনীতি: তুঁতের রাসায়নিক নাম ব্লু ভিট্রিয়ল (Blue Vitriol) বা পেন্টাহাইড্রেট কপার সালফেট। এর সংকেত $CuSO_4.5H_2O$। কপার সালফেট ও 5 অণু পানির সমন্বয়ে তুঁতে গঠিত। এটি খাবার লবণ সোডিয়াম ক্লোরাইডের মতো কেলাস আকৃতির দানাদার পদার্থ। খাবার লবণের বর্ণ সাদা, তুঁতের বর্ণ নীল। তুঁতের মধ্যে 5 অণু পানি থাকে। তুঁতেকে উত্তপ্ত করলে ঐ 5 অণু পানি বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তখন তুঁতের মধ্যে কোনো পানি থাকে না এবং তুঁতের বর্ণ সাদা হয়ে যায়। এই 5 অণু পানিকে কেলাস পানি বলে।

$$\underset{\text{নীল বর্ণ}}{CuSO_4.5H_2O} \longrightarrow \underset{\text{সাদা বর্ণ}}{CuSO_4} + 5H_2O$$

প্রয়োজনীয় উপকরণ: তুঁতে (ব্লু ভিট্রিয়ল), ডেসিকেটর, নিক্তি, তুঁতে, সিরামিক বাটি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, তারজালি, বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প।

কার্যপদ্ধতি:

1. নিক্তি দিয়ে একটি পোর্সেলিন ক্রুসিবল মেপে নেওয়া হলো। ধরা যাক ক্রুসিবল এর ওজন a গ্রাম। এবার এই পোর্সেলিন ক্রুসিবলের মধ্যে কিছু তুঁতে নেওয়া হলো এবং তুঁতেসহ ক্রুসিবলের ওজন পাওয়া গেল b গ্রাম। কাজেই তুঁতের ভর b - a গ্রাম।
2. একটি ত্রিপদী স্ট্যান্ডের উপর তারজালি স্থাপন করে তারজালির উপরে তুঁতেসহ ক্রুসিবলকে বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প দিয়ে তাপ দেওয়া হলো।
3. তাপ প্রদান করার সময় দিকে লক্ষ রাখা হলো। যে তুঁতের বর্ণ নীল ছিল সেই তুঁতের বর্ণ আস্তে আস্তে সাদা হয়ে যাবে। তাপ প্রয়োগের ফলে তুঁতে থেকে পানি অপসারিত হওয়ার কারণে তুঁতের বর্ণ সাদা হয়ে যাবে।
4. তুঁতের বর্ণ একেবারে সাদা হয়ে যাওয়ার পর বুনসেন বার্নার বা স্পিরিট ল্যাম্প বন্ধ করে তাপ দেওয়া বন্ধ করা হলো।
5. এবার পোর্সেলিন ক্রুসিবলকে দ্রুত ডেসিকেটরে নিয়ে যাওয়া হলো এবং দ্রুত শীতল করে পোর্সেলিন ক্রুসিবলের ওজন নেওয়া হলো। এটি দ্রুত করতে হবে, তা না হলে তুঁতে আবার পানি শোষণ করে নীল বর্ণ ধারণ করবে। ধরা যাক এই ওজন c গ্রাম।

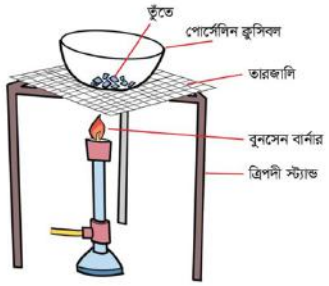

চিত্র 6.04: তুঁতের কেলাস পানির পরিমাণ নির্ণয়

তাহলে পানি অপসারিত হবার পর তুঁতের ওজন c - a গ্রাম
তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ (b - a) - (c- a) গ্রাম

হিসাব:

(b-a) গ্রাম তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ (b - c) গ্রাম

কাজেই 100 গ্রাম তুঁতে থেকে অপসারিত পানির পরিমাণ $\frac{(b-c)}{(b-a)} \times 100$ গ্রাম

তুঁতেতে কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ $\frac{(b-c)}{(b-a)} \times 100$ %

সতর্কতা:

পোর্সেলিন বাটিতে তুঁতে উত্তপ্ত করার সময় ধীরে ধীরে এবং সমানভাবে তাপ দিতে হবে। তাপ দিয়ে পানি বাষ্পীভূত করার পর দ্রুত পোর্সেলিন সহ তুঁতের ওজন নিতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ: তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের জন্য এইরূপ একটি পরীক্ষাকার্য সম্পাদন করো।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। রসায়ন পাঠ্যপুস্তকে শিখনফল কেন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

২। রসায়ন শিক্ষাক্রমে কোন কোন ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যাদির ব্যবহারের ওপর বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে?

৩। রসায়ন পাঠ্যপুস্তকের প্রতি অধ্যায়ের শুরুতে অধ্যায়ের ভূমিকায় কী সম্পর্কে বলা হয়েছে?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রসায়ন শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

২। রসায়ন পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায় কীভাবে সাজানো বা বিন্যস্ত হয়েছে আলোচনা করুন।

৩। রসায়ন পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহারিক কাজ হিসেবে কোন কোন ধরনের কাজকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে? এসব কাজের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

ইউনিট ৩ : সামাজিক গঠনবাদের আলোকে রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল

বর্তমানে সামাজিক গঠনবাদ অনুসরণ করে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করা হয়। এ মতবাদ অনুসারে শিখন হলো মূলত পূর্বঅভিজ্ঞতা থেকে কোন কিছুর সক্রিয় অর্থ গঠন। শিক্ষার্থী যে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ধারণা নিয়ে শ্রেণিকক্ষে আসে তা বিজ্ঞানের কোন নতুন ধারণা নির্মাণে জোরালো ভূমিকা রাখে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পূর্ব ধারণা নতুন ধারণা নির্মাণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ প্রেক্ষাপটে আমরা কীভাবে শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কার্যাবলি নির্বাচন করবো? সামাজিক গঠনবাদের আলোকে কীভাবে শিখন শেখানোকে কার্যকর করা যায় তার একটি সাধারণ কৌশল 'ধারণা পরিবর্তন মডেল' প্রথমে আমরা আলোচনা করবো। এরপর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট শিক্ষণ কৌশল যেমন- ব্রেইনস্টর্মিং (Brainstorming), ধারণা মানচিত্র, পিওই, ৫ই, মাইন্ডম্যাপিং (mind mapping) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করব। এই ইউনিটের বিষয়বস্তুসমূহকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৩.২ ধারণা পরিবর্তন মডেল, ব্রেইনস্টর্মিংও ধারণা মানচিত্র

৩.২ মাইন্ডম্যাপিং, ৫ই, পি ও ই

৩.৩ সহযোগিতামূলক শিখন, রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনে শিক্ষার্থীর ভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা বিবেচনা

৩.১ সামাজিক গঠনবাদের আলোকে রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল - ধারণা পরিবর্তন মডেল, মাইন্ডম্যাপিং, ব্রেইনস্টর্মিং এবং ধারণা মানচিত্র

গবেষণায় দেখা গেছে যে, শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের ক্লাসে পূর্বে থেকেই বিজ্ঞানের বিষয়সমূহ বা ঘটনাবলি সম্পর্কে তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে নিজস্ব একটি ধারণা নিয়ে আসে। শিক্ষার্থীর এই পূর্বজ্ঞান (Prior Knowledge) বিজ্ঞানের স্বীকৃত ধারণার সাথে মিলতে পারে আবার পুরোপুরি ভ্রান্তও হতে পারে। শিক্ষার্থী কখনও কখনও প্রকৃতির কোন বিষয় সম্পর্কে নিজের মতো করে একটি বিকল্প ধারণাও তৈরি করতে পারে। যাই হোক, তাদের এই পূর্বধারণাসমূহ অনেক ক্ষেত্রে কাজে লাগে, কেননা শিক্ষার্থীদের এই পূর্ব-ধারণা বা পূর্বজ্ঞানকে ভিত্তি ধরে বিজ্ঞানস্বীকৃত নতুন ধারণা দেওয়া যায়। আবার অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের এই পূর্বজ্ঞান পরিবর্তন করা কষ্টসাধ্য, ফলে তা অনেক সময় বিজ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শেখার ক্ষেত্রে তাদের পূর্বজ্ঞানের প্রভাবকে সামাজিক গঠনবাদ স্বীকার করে। শিক্ষার্থীর শিখন সম্পর্কে সামাজিক গঠনবাদের মূল কথাগুলো নিম্নরূপ :

- শিক্ষার্থীর শিখন মূলত পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে কোনো কিছু সম্পর্কে সক্রিয় অর্থ গঠন করা (Active construction of meaning)।
- শিশুরা শ্রেণিকক্ষে দেখে, শুনে বা অন্যভাবে অভিজ্ঞতা থেকে যে অর্থ গঠন করে তা শিক্ষকের ঈপ্সিত ধারণা থেকে ভিন্ন হতে পারে। শিশুর গঠনকৃত অর্থ বা ধারণা তাদের পূর্ব ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হয়; এ পূর্ব ধারণা কখনও কখনও নতুন ধারণা গঠনে সহায়ক হতে পারে, কখনও বা বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা অন্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের সাথে মিথষ্ক্রিয়ার/ মাধ্যমে কোনো বিষয় সম্পর্কে সম্মিলিত অর্থ গঠন করে (Co-construction of shared meaning) । এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর শিখন বেশি পরিমাণে হয়ে থাকে।
- শিখনের দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীর-ই। শিক্ষক এক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করবেন।

আমরা যদি সামাজিক গঠনবাদের মূল কথাগুলো গ্রহণ করি তাহলে শিক্ষার্থীর রসায়ন শিখনে শিক্ষক হিসেবে আমাদের ভূমিকা বা কাজ কী হবে? সামাজিক গঠনবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রসায়ন শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষকের মূল কাজ হলো শিক্ষণ-শিখন কার্যাবলি এমনভাবে সংগঠিত করা যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার পূর্বজ্ঞান পরিমার্জন ও পূনর্গঠন করে বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গঠন বা নির্মাণ করে। গঠনবাদে যে ধরনের শিক্ষণ কৌশলগুলোর সুপারিশ করা হয় তাদের একটি সাধারণ মডেল রয়েছে যেটি 'ধারণা

পরিবর্তন মডেল' নামে পরিচিত। ধারণা পরিবর্তন মডেলের মূল কাজ হলো শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান ও ধারণাকে উদঘাটন করে তার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা চিহ্নিত করে নতুন ধারণা নির্মাণ এবং সবশেষে শিক্ষার্থীর ধারণা কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে তার মূল্যায়ন বা অনুচিন্তন। এ ধরনের একটি মডেলে মূল ধাপগুলোর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে দেওয়া হলো :

১. **ওরিয়েন্টেশন বা বিষয়ের সাথে সম্পৃক্তকরণ :** শুরুতেই পাঠের শিরোনাম বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ট কোন ঘটনা উপস্থাপন করা হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের এই ঘটনার কারণ, ধরন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশ্ন করে তাদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহী করে তোলা হয়।

২. **শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান/বিকল্প ধারণা উদঘাটন :** পাঠের বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান শ্রেণিকক্ষে উন্মোচন করা এই ধাপের মূল লক্ষ্য। কুইজ, ব্রেইন স্টর্মিং, ধারণা মানচিত্র এসবের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থী বা একদল শিক্ষার্থীর বিকল্প ধারণা উদঘাটন করা যায়।

৩. **শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পুনর্গঠন :** এ ধাপটি আবার কতকগুলো ছোট ধাপে বিভক্ত। ছোট ধাপগুলোর মধ্যে ধারণা স্পষ্টীকরণ ও বিনিময় (Clarification and exchange of ideas), শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় ফেলা, নতুন ধারণা নির্মান ও মূল্যায়ন উল্লেখযোগ্য।

   ক. **ধারণা স্পষ্টীকরণ ও বিনিময় (Clarification and exchange of ideas) :** এই ধাপে শিক্ষার্থীদের একে অন্যের সাথে তাদের পূর্বজ্ঞানকে বিনিময়ের মাধ্যমে স্পষ্টীকরণ করার সুযোগ দেওয়া হয়। জোড়ায় বা দলগত আলোচনার মাধ্যমে এটি করা যেতে পারে।

   খ. **শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে সাংঘর্ষিক অবস্থায় ফেলা (Exposure to conflict situation) :** এই ধাপে শিক্ষার্থীরা কিছু কাজে অংশ নেবে যেটি তাদের পূর্বজ্ঞানের সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান ধারণার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা ধরা পড়বে। পি ও ই (পূর্বানুমান-পর্যবেক্ষণ-ব্যাখ্যা), বিতর্ক ইত্যাদি কৌশল অবলম্বন করে এই ধাপটি সম্পন্ন করা যায়। এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞানের দুর্বলতা উপলব্ধি করে নতুন ধারণা নির্মাণে উদ্বুদ্ধ হবে।

   গ. **নতুন ধারণা নির্মাণ :** এই ধাপে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানসম্মত ধারণা গঠনের জন্য শিক্ষক সহায়তা করবেন। আগের ধাপে সৃষ্ট সাংঘর্ষিক অবস্থায় পড়ার পর শিক্ষার্থীরা নিজেরা প্রতিফলন, একক চিন্তন ও দলগত আলোচনার মাধ্যমে বিজ্ঞানসম্মত সঠিক ধারণা গঠন করতে পারে। শিক্ষার্থীর সঠিক ধারণা গঠনে শিক্ষক সহায়তা করবেন; পক্ষান্তরে শিক্ষার্থীরা ধারণা গঠনে ভুলদিকে অগ্রসর হলে তাদের সঠিক দিকে এগোনোর নির্দেশনা দিবেন।

   ঘ. **মূল্যায়ন :** এ পর্যায়ে, শিক্ষার্থীদের গঠনকৃত ধারণা সঠিক হলো কিনা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে মূল্যায়ন করবে।

৪. **নতুন ধারণার প্রয়োগ ও বর্ধন :** এই ধাপে শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিতে হবে যাতে তারা নতুন ধারণা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে পূনর্গঠিত ধারণাকে শক্তিশালী ও বর্ধিত করতে পারে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করা যেতে পারে যাতে তারা তাদের পুনর্গঠিত জ্ঞান দ্বারা তাদের দৈনন্দিন জীবনের কোন ঘটনা ব্যাখ্যা করতে পারে।

৫. **শিক্ষার্থীর ধারণা পরিবর্তন পর্যালোচনা :** সবশেষে এই ধাপে শিক্ষার্থী অনুচিন্তনের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করবে বিষয়টি সম্পর্কে তার পূর্বধারণা কীভাবে ও কতটুকু পরিবর্তিত হয়েছে। শিক্ষার্থীর পূর্বধারণা যথেষ্ট পরিবর্তন হলে সে পরবর্তী শিখনে উৎসাহিত হবে আর ধারণার পরিবর্তন যথেষ্ট না হয়ে থাকলে শিক্ষার্থী নিজেই বুঝতে পারবে তার কী করা উচিত। তাই বিজ্ঞান শিক্ষাবিদেরা এই শেষের ধাপটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে বলে থাকেন।

ধারণা পরিবর্তন মডেলে মূল কৌশল হলো শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞানকে উদঘাটন করে তার সীমাবদ্ধতা ও দুর্বলতা বের করে নতুন ধারণা নির্মাণ এবং শেষে ধারণা পরিবর্তন কতটুকু হয়েছে তার মূল্যায়ন বা অনুচিন্তন। নিম্নে ধারণা পরিবর্তন মডেলের ধাপসমূহ চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

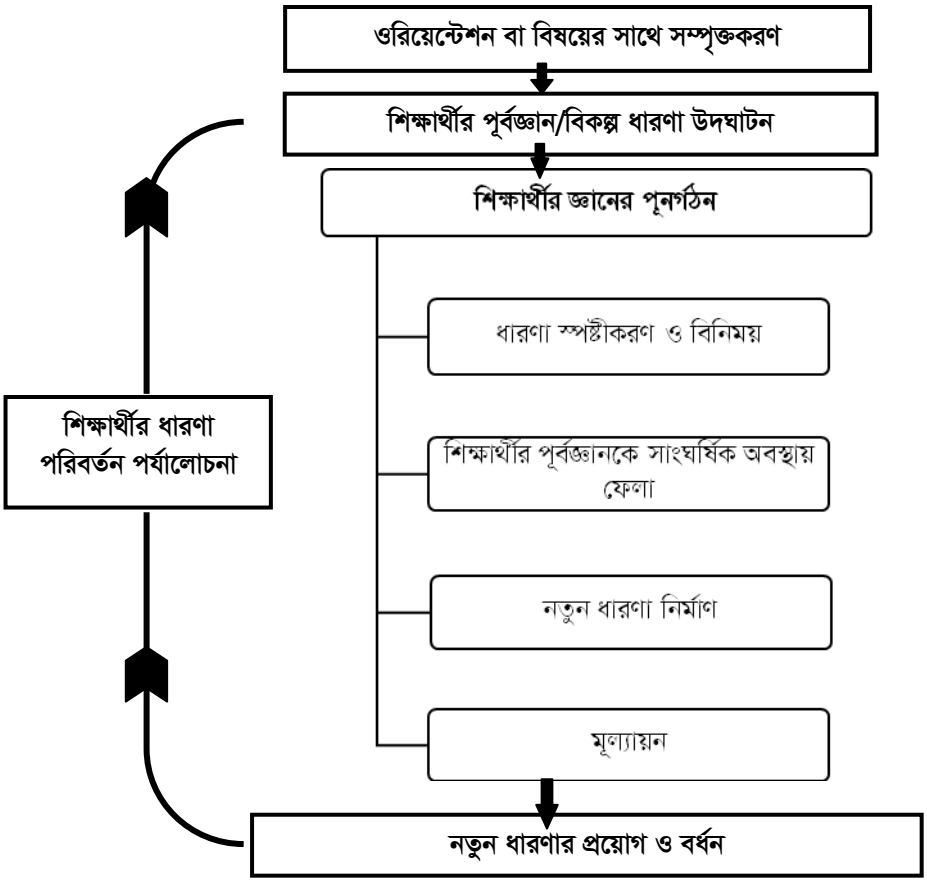

চিত্র ৩.১: ধারণা পরিবর্তন মডেলের মূল ধাপসমূহ

ধারণা পরিবর্তন মডেলের ওপর ভিত্তি করে রসায়ন শিখন শেখানো কাজে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করা যায়। এদের মধ্যে কয়েকটি কৌশল কীভাবে রসায়ন শিখন শেখানোতে প্রয়োগ করা যায় তা উদাহরণসহ নিচে আলোচনা করা হলো।

ব্রেইনস্ট্রর্মিং (Brainstorming)

ব্রেইনস্ট্রর্মিং দ্বারা শিক্ষক কোনো বিষয় সম্পর্কে দ্রুত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান/ধারণাসমূহ সংগ্রহ করতে পারেন। এটি মূলত কোনো পাঠ শুরুর পূর্বে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ে ব্যবহৃত হয়।

কীভাবে কাজ করে : প্রথমে একটি বিষয় নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীরা এই সম্পর্কে কী জানে তা ৩০ সেকেন্ড থেকে ১ মিনিট সময়ের মধ্যে বলতে বা লিখতে বলা হয়। এরপর শিক্ষার্থী যেভাবে বলবে সেভাবেই বোর্ডে লিখতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক কোন ধারণার জন্য সমালোচনা করা যাবে না। কারণ এটির উদ্দেশ্যই হলো শিক্ষার্থীদের পূর্ব ধারণা বের করে আনা। এই ধারণা থেকে শিক্ষক পাঠটি সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য পেতে পারেন। সমালোচনা করলে বা ভুল ধরলে শিক্ষার্থীরা এই প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে পারে অর্থাৎ পরবর্তীতে খোলা মনে তাদের ধারণা প্রকাশ করবে না।

উদাহরণ

মনে করুন, আপনি শ্রেণিকক্ষে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর পড়াবেন ঠিক করেছেন। এজন্য আপনার আগে জানা দরকার শিক্ষার্থীরা শক্তির রূপসমূহ জানে কি। প্রথমে নিজে না বলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে কেবলমাত্র একটি করে শক্তি রূপের নাম খাতায় লিখতে বলুন। এবার প্রত্যেককে আলাদা আলাদা করে জিজ্ঞাসা করুন। দেখবেন অনেকাংশ প্রায় সব শক্তির রূপের নামই চলে এসেছে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, কোন শিক্ষার্থী যদি কোন শক্তির রূপের নাম যথাযথ ভাষায় না বলতে পারে তাও গ্রহণ করুন। কারণ এখানে আপনি পাঠটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও ফলাবর্তন নিচ্ছেন। পরবর্তীতে আপনার পাঠ উপস্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ থেকেই তার ধারণা সংশোধনের সুযোগ পাবে।

কনসেপ্ট ম্যাপিং (Concept Mapping) বা ধারণা মানচিত্র

কনসেপ্ট ম্যাপিং আজকাল রসায়ন শিখন-শেখানোতে একটি বহুল প্রচলিত কৌশল। এতে মূলত শিক্ষার্থীদের একটি মানচিত্র উপস্থাপন করতে বলা হয় যার মাধ্যমে একটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ধারণার সংযোগ ও সম্পর্কসমূহ তুলে ধরা যায়। এর মাধ্যমে প্রথমত শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান উপস্থাপনের সুযোগ করে দেওয়া হয় এবং তাদের সেই ধারণায় কোনো ভ্রান্ত বা বিকল্প ধারণা রয়েছে কিনা তা সম্পর্কে শিক্ষক জানতে পারেন। মূলকথা হলো, কনসেপ্ট ম্যাপিং-এর সাহায্যে শিক্ষার্থীরা তাদের বিষয় সম্পর্কিত ধারণাসমূহ সংগঠিত করতে এবং তাদের সামগ্রিক চিন্তা চেতনাকে উপস্থাপন করার সুযোগ পায়।

এই কৌশলটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে সকল শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। প্রথমে কোনো বিষয় সম্পর্কিত সকল মূল ধারণাগুলো তাদের ভাবতে বলতে হবে। পরবর্তীতে সে ধারণাগুলোর মধ্যে কাছাকাছি ধারণাগুলোকে একত্রে গ্রুপিং করতে হবে। এখানে মনে রাখতে হবে যে, একটি ধারণা কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করা যাবে। বিভিন্ন ধারণার মধ্যে সংযোগগুলো তীর চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করতে হবে এবং সম্পর্কসমূহ উল্লেখ করতে হবে। এভাবে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধারণাসমূহের মধ্যে সম্পর্ক চিহ্নিত ও লেবেলিং করে কনসেপ্ট ম্যাপ তৈরি করতে পারবে।

উদাহরণ : একটি উদাহরণের মাধ্যমে কনসেপ্ট ম্যাপিং ধারণাটিকে পরিষ্কার করা যাক। মনে করুন, আপনি ক্লাসে রাসায়নিক বন্ধন বিষয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছেন। এখন ক্লাসে বোর্ডে রাসায়নিক বন্ধন বিষয়টি লিখুন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন রাসায়নিক বন্ধন এর সাথে আর কি কি ধারণা সম্পর্কযুক্ত রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যখন বলবে তখন আপনি শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন এবং প্রত্যেকটি শব্দকে একটি বক্স দ্বারা আবদ্ধ করুন। এবার শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন, কোন ধারণার সাথে অপর কোন ধারণার সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষার্থীদের উত্তর গ্রহণ করে ধারণাগুলোর মধ্যে তীর চিহ্ন দিয়ে এদেরকে যুক্ত করুন। তীর চিহ্নের ওপরে-নিচে বা পাশে সংক্ষেপে সম্পর্কটিও লিখুন শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে। আপনি হয়তো দেখবেন রাসায়নিক বন্ধনের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধারণা হবে শক্তি, আয়ন, ইলেকট্রন ইত্যাদি। ধারণাগুলোকে সংযুক্ত করার পর এটিকে দেখতে মনে হবে একটি নেটওয়ার্কের মতো। এভাবে একজন শিক্ষক পুরো ক্লাসের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ধারণা মানচিত্র তৈরি করতে পারেন। আবার, শিক্ষার্থীদের একক কাজ বা দলগতভাবেও এটি করতে দেওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের কোন একটি বিষয়ে কনসেপ্ট ম্যাপ বা ধারণা মানচিত্র থেকে আপনি ধারণা পাবেন যে, শিক্ষার্থীরা ঐ বিষয়টি সম্পর্কে কী জানে। তাই কনসেপ্ট ম্যাপিং শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য ব্যবহার করা যায়। আবার পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণা কতটুকু গ্রহণ করতে পেরেছে তাও বের করা যায়। শিক্ষার্থীরা প্রথম ধারণা চিত্র ও শেষের ধারণাচিত্র তুলনা করে নিজেরাও বুঝতে পারবে তাদের ধারণার কতটুকু পরিবর্তন হয়েছে।

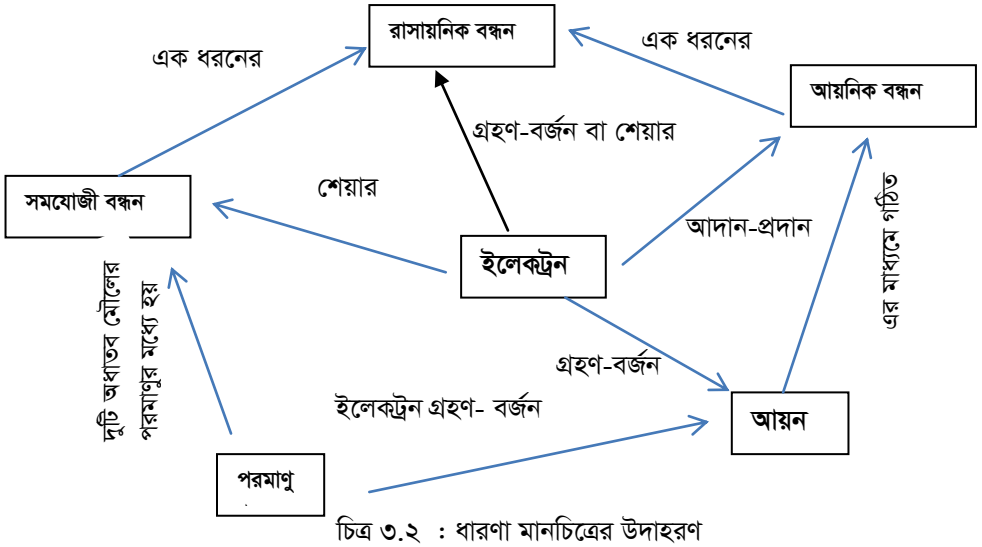

চিত্র ৩.২ : ধারণা মানচিত্রের উদাহরণ

৩.২ ধারণা পরিবর্তন মডেল অনুসরণে শিখন-শেখানো কৌশল : মাইন্ডম্যাপিং, 5E, POE

ধারণা পরিবর্তন মডেল অনুসরণে রসায়ন শ্রেণিকক্ষে যে শিখন-শেখানো কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আগের পাঠে ব্রেইনস্টর্মিং ও ধারণা মানচিত্র আলোচনা করা হয়েছে। এ পাঠে আমরা আলোচনা করবো মাইন্ডম্যাপিং, ৫ই ও পিওই।

মাইন্ডম্যাপিং (Mind mapping)

এটি মূলত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নতুন আইডিয়া বা ধারণা সৃষ্টি, প্রয়োগ ও পরিবর্ধনে ব্যবহৃত হয়। কোন একটি ইস্যুতে শিক্ষার্থীরা তাদের অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে কোন সমস্যা সমাধানের সুপারিশ করতে পারে, নতুন পরিস্থিতিতে অর্জিত জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে। যেমন, রাসায়নিক দ্রব্যের কারণে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে আলোচনার পর শিক্ষার্থীদের বলা যায় পানি দূষণ রোধে পদক্ষেপ নির্ধারণের জন্য মাইন্ডম্যাপ তৈরি করতে। শিক্ষার্থীরা নিজের খাতায় একটি পৃষ্ঠার মাঝখানে 'পানি দূষণ রোধ' লিখবে এবং এই মূল ধারণাটির চারদিকে পানি দূষণ রোধে পদক্ষেপ সম্পর্কে তাদের আইডিয়া বা ধারণা লিখবে। একইভাবে শিক্ষক পুরো শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সহায়তায় একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করতে পারেন। এক্ষেত্রে তিনি বোর্ডের মাঝখানে 'পানি দূষণ রোধ' কথাটি লিখবেন এবং শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উত্তর নিয়ে একটি মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করবেন।

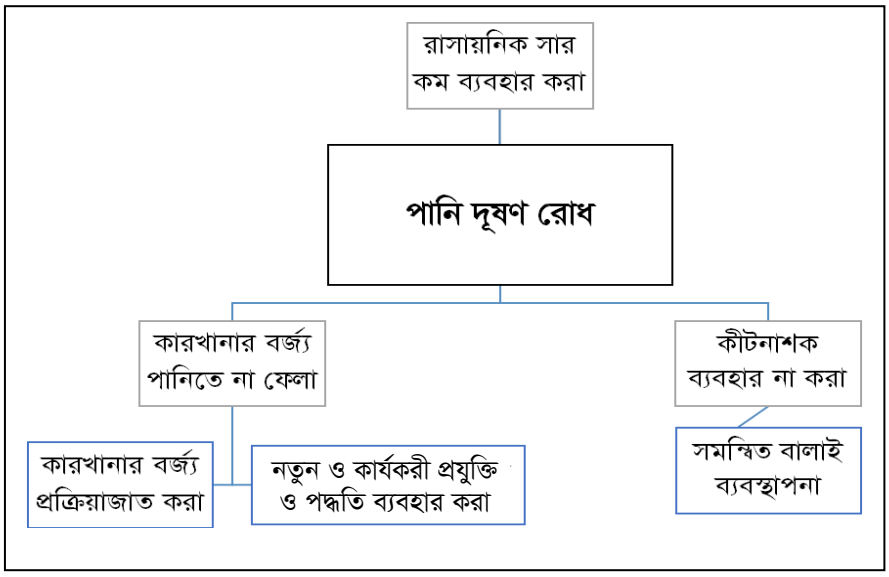

চিত্র ৩.৩: মাইন্ডম্যাপের উদাহরণ

মনে রাখতে হবে, মাইন্ডম্যাপিং তৈরির ক্ষেত্রে একটি **মূল ধারণাকে** কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীরা নতুন নতুন idea (বা সমাধান) সৃষ্টি করে। মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে যে আইডিয়া সৃষ্টি হয় সেটির আবার ছোট ছোট অংশ থাকতে পারে। ধারণা মানচিত্র থেকে মাইন্ডম্যাপিং-এর মূল পার্থক্য হলো ধারণা মানচিত্রে অনেকগুলো ধারণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হয় আর মাইন্ডম্যাপে একটি মূল ধারণাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন আইডিয়া সৃষ্টি করতে হয়।

৫ই মডেল (5E Model)

৫ই মডেল এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখনের জন্য যেমন তাদের নিবিড়ভাবে জড়িত রাখে, ঠিক তেমনি তারা শিখনকে নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করারও সুযোগ পায়। এই মডেলটি ধারণা পরিবর্তন মডেলের অনুরূপ। এই মডেল পাঁচটি ভিন্ন কিন্তু সম্পর্কযুক্ত ধাপে সজ্জিত। নিম্নে এ ধাপগুলোকে আলাদা আলাদা করে বর্ণনা করা হলো :

Engage বা নিবিড়ভাবে জড়িত করা : শুরুতেই শিক্ষক ঐ পাঠের টপিক বা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ও শিক্ষার্থীদের জীবনঘনিষ্ট কোনো ঘটনা উপস্থাপন করে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আহ্বান করে তাদের বিষয়ের প্রতি আগ্রহী ও কৌতূহলী করে তোলা হয়। শিক্ষক পাঠের বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান যাচাই করেন, শিক্ষার্থীদের জন্য শিখন টার্গেট ও মূল্যায়ন নীতিমালা নির্ধারণ করেন। যেমন, ব্যাপন প্রক্রিয়া সম্পর্কে পাঠ পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রথমে ব্যাপনের একটি বাস্তব প্রয়োগ উপস্থাপন করা হয় এবং পরবর্তিতে তাদের প্রশ্ন করে বিদ্যমান ধারণা জানার মাধ্যমে তাদের শিখনে জড়িত করা যেতে পারে।

Explore বা অনুসন্ধান : এই ধাপে শিক্ষার্থীরা একটি সমস্যা বা ধারণা সম্পর্কে হাতে কলমে কাজ করে বা তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি অনুসন্ধান করে। শিক্ষক এই ধাপে শিক্ষার্থীদের কোন একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ দেন এবং শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশনায় অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন নির্ধারণ করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে। যেমন ব্যাপন ক্রিয়া বোঁঝা যায় এরকম একটি কাজ শিক্ষার্থীদের দিয়ে করানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে একটি স্বচ্ছ টিউবের একপ্রান্তে HCl ভেজানো তুলা ও অন্যপ্রান্তে NH_3 ভেজানো তুলা রাখলে কী ঘটে তা দেখা যেতে পারে।

Explain বা ব্যাখ্যা প্রদান : এই ধাপে শিক্ষার্থীদের কাছে অনুসন্ধানে সময়লব্ধ পর্যবেক্ষণ এর ব্যাখ্যা চাওয়া হয় এবং শিক্ষকও শিক্ষার্থীর নতুন ধারণা গঠনে সহায়তা প্রদান করেন। পূর্ববর্তী ধাপে দেখানো পরীক্ষাটির পর্যবেক্ষণকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী ব্যাপনের ধারণার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। এর ফলে শিক্ষার্থীরা ব্যাপন সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা গঠন করে।

Elaborate বা পরিবর্ধন : এ ধাপে শিক্ষার্থীরা যা শিখল তা নতুন পরিবেশ পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করে। এক্ষেত্রে তারা নতুন অর্জিত ধারণাকে পাকাপোক্ত করে। ব্যাপনের ধারণাকে এ ধাপে শিক্ষার্থীরা অন্য ঘটনা - যেমন সুগন্ধি ছড়িয়ে যাওয়া- এমন ঘটনা ব্যাখ্যা করে ও তাদের নির্মিত ধারণাকে পরিবর্ধন করে।

Evaluate বা মূল্যায়ন : শিক্ষার্থীরা কি শিখেছে তা বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ ধাপে শিক্ষক তা মূল্যায়ন করে থাকেন। শিক্ষক এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সবগুলো ধাপ থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমন্বয় করে বোঝার চেষ্টা করেন শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের আত্ম-মূল্যায়নে সহায়তা করেন এবং ফিডব্যাক দেন। সবশেষে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী শিখন লক্ষ্য নির্ধারণে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করেন।

POE (Prediction-Observation-Explanation)

এই কৌশলটি শিক্ষার্থীদের কোনো প্রাকৃতিক ঘটনায় গভীরভাবে এবং সূক্ষ্মভাবে চিন্তা করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে। প্রথমেই শিক্ষার্থীদের কোনো একটি কাজের ফল কেমন হতে পারে তা পূর্বানুমান করতে বলা হয়। তাদের উত্তরের পেছনের কারণ বা ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের উত্তরের কারণ অনুসন্ধান করার মাধ্যমে উক্ত ঘটনার সাথে তাদের বিদ্যমান ধারণা সংযোগ করার সুযোগ পাবে। এ থেকে শিক্ষার্থীর ভ্রান্ত বা বিকল্প ধারণা আছে কিনা শিক্ষক তা বুঝতে পারবে। এবার শিক্ষার্থীদের ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করতে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা তাদের পর্যবেক্ষণের সাথে তাদের অনুমানের মিল বা অমিল খুঁজে দেখার সুযোগ পাবে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পূর্বানুমান এর সাথে পর্যবেক্ষণ মিলবে না। পর্যবেক্ষণের পর শিক্ষার্থীরাই ঘটনার ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সঠিক নির্দেশনা দিবেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্বজ্ঞানকে পূনর্গঠিত করে সঠিক ধারণা নির্মান করতে শিখবে। একই সাথে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ও সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই দুটি প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা গঠন করতে পারবে।

উদাহরণ :

পূর্বানুমান : একটি স্বচ্ছ টিউবের একপ্রান্তে HCl ভেজানো তুলা ও অন্যপ্রান্তে NH_3 ভেজানো তুলা রেখে দিলে কী ঘটবে? শিক্ষার্থীদের পূর্বানুমানের পক্ষে যুক্তি দিতে বলবেন। কোনো শিক্ষার্থী আন্দাজে সঠিক পূর্বানুমান করলেও হয়তো তার পক্ষে যুক্তি দিতে পারবে না।

পর্যবেক্ষণ : দ্বিতীয় পর্যায়ে শিক্ষক ঘটনাটি প্রদর্শন করবেন। শিক্ষার্থীরা পর্যবেক্ষণ করবে ঘটনাটা। বেশির ভাগ শিক্ষার্থীদের পূর্বানুমান এক্ষেত্রে সঠিক হবে না। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা তাদের বিদ্যমান ধারণা পাল্টাতে আগ্রহী হবে।

ব্যাখ্যা : শেষ পর্যায়ে শিক্ষকের নির্দেশনায় শিক্ষার্থীরা নতুন ধারণার সমন্বয়ে ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেবে।

৩.৩ সহযোগিতামূলক শিখন, রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনে শিক্ষার্থীর ভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা বিবেচনা

সহযোগিতামূলক শিখন হলো শিক্ষার্থীদের দলে বিভক্ত হয়ে একে অন্যের সাথে কাজ করার মাধ্যমে সম্মিলিত শিখন। সামাজিক গঠনবাদের মূল ধারণাতে আমরা দেখেছি শিক্ষার্থীরা একসাথে কাজ করার সুযোগ পেলে তারা কোনো ধারণার একটি সম্মিলিত অর্থ গঠন করতে পারে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের শিখন একই রকম এবং শক্তিশালী হয়ে থাকে। এর কারণ শিক্ষার্থীরা যখন কোনো দলে কাজ করে তারা পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের সুযোগ পায়। এছাড়া বিজ্ঞান শিখন-শেখানো আজকাল অনেক বেশি অনুসন্ধানভিত্তিক যেখানে শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানের ধারণা, প্রক্রিয়া ও দক্ষতা শিখে। তাই শিক্ষার্থীরা দলে কাজ করলে কোনো সমস্যা সমাধানে তাদের ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা, দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধান বিবেচনার সুযোগ পায়। এভাবে সহযোগিতা মূলক শিখন একটি এ্যাপ্রোচ যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একত্রে কাজ করার মাধ্যমে অধিকতর কার্যকর শিখনের সুযোগ পায়।

সহযোগিতামূলক শিখনের সুবিধাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো :

- **অধিকতর কার্যকর শিখন :** শিক্ষার্থীরা যখন সহযোগিতামূলকভাবে কাজ করে তখন তারা একা একা শেখার চেয়ে অধিক কার্যকরীভাবে শিখার সুযোগ পায়। একে অন্যের সাথে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণা ভাগাভাগি করার মাধ্যমে তাদের শিখন শক্তিশালী, অধিক ও উন্নত হয়।
- **সামাজিক শিখন :** দলে কাজ করার ফলে শিক্ষার্থীরা নেতৃত্ব গঠন, পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিশ্বাস স্থাপন এমনকি সংঘাত ব্যবস্থাপনার মতো সামাজিক দক্ষতাসমূহ শিখতে পারে। এই দক্ষতাসমূহ শিখন সময় সাপেক্ষ কিন্ত এর কার্যকারিতা দীর্ঘকালের জন্য ফলপ্রসূ।
- **আত্ম-বিশ্বাসের উন্নয়ন :** সকল শিক্ষার্থীই দলগত ভাবে কাজ করার ফলে অধিকতর সফল হয় যা কিনা তাদের শিখনের ক্ষেত্রে আত্ম-বিশ্বাস উন্নয়নে সহায়তা করে।
- **অধিকতর শ্রেণি ব্যবস্থাপনা :** শিক্ষার্থীরা যখন দলগতভাবে কাজ করে অভ্যস্থ হয়ে ওঠে তখন তাদের নিজের কাজ সম্পর্কে অধিকতর দায়িত্ববান হয়, ফলে শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজ হয়।

আমরা এ অধ্যায়ে বিভিন্ন শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে জেনেছি। এসব শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রেও আমরা শিক্ষার্থীদের দলে সংগঠিত করে তাদের সহযোগিতামূলক শিখন নিশ্চিত করতে পারি। আমাদের বিদ্যালয়সমূহে বিজ্ঞান শিক্ষকেরা এখন অনেকেই শিক্ষার্থীদের দলগত কাজ দিয়ে থাকেন। এরকম অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এরকম দলগত কাজ শিক্ষার্থীর শিখনের উন্নয়ন ঘটাতে পারছে না আবার শ্রেণি-ব্যবস্থাপনাও কঠিন হয়ে ওঠে। এর মূল কারণ শিক্ষার্থী ও শিক্ষক কেউই হয়তো এরকম শিখন-শেখানো কাজে অভ্যস্থ নয়। আমরা এখন দেখবো কীভাবে শ্রেণিতে দলীয় কাজকে সুসংগঠিত করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যায়।

সহযোগিতামূলক শিখন ফলপ্রসূ করার কৌশল

কিছু বিষয় অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের দলগত কাজকে ফলপ্রসূ করা যায় (Johnsons & Johnsons, 1976, 1986 cited in Hassard, 2005, p. 224)।

ক. **শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি মিথস্ক্রিয়া :** শিক্ষার্থীদের ছোট দলে মুখোমুখি বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা পরস্পরের সাথে সরাসরি সহজে নিজের নিজের চিন্তা ভাগাভাগি করতে পারে এবং অন্যকে সহায়তা করতে পারে।

খ. **শিক্ষার্থীদের একে অন্যের প্রতি ইতিবাচক নির্ভরশীলতা :** শিক্ষক এমনভাবে দলীয় কাজ এবং শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেবেন যাতে একটি দলের শিক্ষার্থীরা একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। এমন যেন কখনো না হয় যাতে একজন শিক্ষার্থী সব কাজটুকু করবে এবং অন্যেরা কেবল পাশে অলস বসে থাকবে। এক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে যে, যে কোনো দলীয় কাজে একজন শিক্ষাথী কোনো না কোনো কাজ করবে। কাজটি যদি শুধু মৌখিক আলোচনা হয় তাহলেও শিক্ষক লক্ষ রাখবেন প্রত্যেকে যেন আলোচনায় অংশ নেয়। আবার হাতে কলমে কাজ করার বিষয় হলে শিক্ষক নিশ্চিত করবেন যাতে একেক জন শিক্ষার্থী একেক অংশের কাজ করে। অর্থাৎ শিক্ষক প্রত্যেক দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট কাজের পরিধি নির্ণয় করে দিবেন।

গ. **ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা :** অনেক সময় দলগত কাজে কোনো কোনো শিক্ষার্থীকে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তারা ঠিকভাবে কাজে অংশ নেয় না; এতে তার নিজেরও শিখন হয় না আর দলগত কাজও বাধাগ্রস্ত হয়। তাই দলগত কাজে একটি শিখন দলের সকল সদস্যকে তার নিজের শিখন এবং দলগত কাজটিতে অন্যদের সহযোগিতা করার বিষয়ে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ শিক্ষক যা করবেন

- **শিক্ষার্থী নিজে শিখল কিনা সেটি নিশ্চিতকরণ :** শ্রেণি-পরীক্ষা, কুইজ, হঠাৎ কোনো শিক্ষার্থীকে (বিশেষ করে কাউকে অমনোযোগী দেখলে) শিখনের বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন করা ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করতে পারেন।
- **দলগত কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ :** দলগত কাজটিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ভূমিকা সুনির্দিষ্ট করে বিভাজন করে দিতে হবে প্রথমে। যেমন দলগত আলোচনায় কেউ হয়তো আলোচনা সঞ্চালনে থাকবে, কেউ হয়তো নোট নেবে, কেউ হয়তো প্রশ্ন উত্থাপনকারী হিসেবে থাকবে। আবার ব্যবহারিক কাজ হলে কেউ হয়তো একটি বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে, অন্যজন হয়তো আরেক ধরনের তথ্য সংগ্রহ করবে, এক বা একাধি জন হয়তো তথ্য বিশ্লেষণে মূল ভূমিকা নেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখবেন সবাই যার যার দায়িত্ব ঠিকভাবে পালন করছে কি না।

ঘ. **সহযোগিতামূলক সামাজিক দক্ষতা ও মানসিকতা :** বিজ্ঞানের শিখন-শেখানো কার্যাবলি সম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞান প্রক্রিয়াকরণ দক্ষতা যেমন পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ ইত্যাদির মতো কিছু সামাজিক দক্ষতা শিক্ষার্থীদের শেখানো দরকার যাতে তারা এগুলো প্রয়োগ করে দলগত কাজকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারে। শিক্ষার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় এই দক্ষতাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

দলীয় ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে দক্ষতাসমূহ

- কাজ পাওয়ার পর নিজ দলে দ্রুত ও নীরবে যুক্ত হওয়া
- আস্তে কথা বলা যাতে কেবল নিজ দলের সদস্যরা শুনতে পায়
- দলের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দলের সাথে অবস্থান করা

দল হিসেবে কার্যকরভাবে কাজ করার জন্য দক্ষতাসমূহ

- দলীয় কাজের সময় যে কথা বলছে তার দিকে মনোযোগ দেওয়া
- কোনরূপ বিঘ্ন ঘটানো ছাড়া অন্যের কথা শোনা
- অন্য সদস্যদের কাজের প্রশংসা করা ও গুরুত্ব দেওয়া
- অন্যদের সাথে আন্তরিক আচরণ করা
- নিজের ওপর অর্পিত কাজ সম্পন্ন করা
- নির্দিষ্ট কাজে মধ্যেই থাকা ও অন্যকেও কাজের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে না দেওয়া
- সমঝোতায় উপনীত হওয়ার দক্ষতা

শিখনের উন্নয়নের জন্য দক্ষতাসমূহ

- দলীয় অলোচনায় নিজের মতামত দিয়ে অংশগ্রহণ
- অন্যকে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা
- অন্যের ধারণা বা মতামতকে প্রশ্ন করা, যাচাই করে গ্রহণ করা
- নতুন তথ্যের আলোকে নিজ ধারণার সংশোধন করার মানসিকতা রাখা

শিক্ষার্থীদের সহযোগিতামূলক কাজে অভ্যস্থ ও দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের আরেকটি বিষয়ে অভ্যস্থ করা দরকার। এটি হলো, কাজ শেষে কাজের ওপর প্রতিফলন। প্রতিটি দলগত কাজ শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই নিজেদের দলগত কাজের মূল্যায়ন করবে- তারা নিজেদের প্রশ্ন করবে যে দল হিসেবে একত্রে তারা কাজটি কতটা কার্যকরিভাবে করতে পেরেছে। এ ধরনের প্রতিফলন শেষে তারা তাদের একসঙ্গে কাজ করার প্রক্রিয়ার সবলতা ও দুর্বলতা বের করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে দলগত কাজ ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

সহযোগিতামূলক কাজ ফলপ্রসূভাবে করার জন্য উপরিউক্ত বিষয়সমূহ ছাড়াও আরেকটি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো দল গঠন। শিক্ষক নিজেই শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করবেন, শিক্ষার্থীদের তাদের নিজের পছন্দের দলে যাওয়া থেকে বিরত রাখতে হবে। দলটিতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার্থীদের একসাথে কাজ করার সুযোগ দেওয়া দরকার। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সামর্থ ও লিঙ্গ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় আনতে হবে। একত্রে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য একই দলে বেশ কিছু দিন একই শিক্ষার্থীদের থাকতে দিতে পারেন।

সহযোগিতামূলক কাজ ও দলীয় কাজে শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব

দলীয় কাজকে ফলপ্রসূ করার জন্য দলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী আলাদা করে কাজ দেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে। কে সকলকে প্রত্যেক কাজের সাথে অভ্যস্থ করতে প্রতিটি নতুন কাজেই দলের সদস্যদের দায়িত্ব পরিবর্তন করতে হবে। নিম্নে একটি দলে চার জন শিক্ষার্থীকে কল্পনা করে তাদের বিভিন্ন রকম দায়িত্ব বিবৃত করা হলো :

ব্যবস্থাপক : দলের ব্যবস্থাপকের কাজ হলো প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফেরত দেওয়া। উপকরণাদি সংক্রান্ত সমস্যাগুলো শিক্ষকের নজরে আনাও তার দায়িত্ব।

সমন্বয়কারী : দলে সমন্বয়কারীর কাজ হলো দলের কাজে যদি কোনো বিঘ্ন ঘটে, তবে তার জন্য অন্য দল বা শিক্ষকের সহায়তা নেয়ার ব্যাপারে কথা বলা। দলের বিভিন্ন সদস্যদের সাথেও যোগাযোগের দায়িত্ব তার।

পরিচালক : দলের পরিচালকের কাজ হলো দলে প্রত্যেক সদস্যকে তার কাজকে সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া এবং প্রত্যেকে সদস্য তা সঠিক ভাবে অনুসরণ করছে কি না তা দেখা।

রিপোর্ট সমন্বয়কারী : সমন্বয়কারীর কাজ হলো দলের কাজের যথাযথভাবে রিপোর্ট তৈরির সমন্বয় করা। এ জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ বা অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে কি না তা দেখা।

রসায়ন শিখন-শেখানো কৌশল নির্বাচনে শিক্ষার্থীর ভিন্নতা ও বিশেষ চাহিদা বিবেচনা

যে কোনো শ্রেণিতে ভিন্ন ভিন্ন সামর্থ্যের, বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের, বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থার এবং কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে। রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষককে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সামর্থ্য ও শিখন চাহিদা বিবেচনা করা দরকার। রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ভিন্নতা আনয়নের মাধ্যমে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিখন নিশ্চিত করা যেতে পারে। একটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি ভালোভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরুন, আপনার শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থী পাঠ্যবই বা অন্য কোনো কিছু পড়ার মাধ্যমে ভালোভাবে শিখতে পারে। আবার অন্য কোনো এক শিক্ষার্থী হয়তো বই পড়ে শেখায় আগ্রহী নয় কিন্তু তাকে কোনো কাজ করতে দিলে আগ্রহ নিয়ে সে কাজটি করে। শিক্ষক হিসেবে আপনাকে এ দুই জনের শিখন নিশ্চিত করতে হলে আপনাকে শ্রেণিকাজে কিংবা বাড়ির কাজ হিসেবে পড়া এবং হাতে কলমে কাজ এ দুটো সূযোগই রাখতে হবে।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. গঠনবাদী শিখনতত্ত্বে শিখন বলতে কী বোঝায়?
২. সামাজিক গঠনবাদে শিখনের মূল দায়িত্ব কার?
৩. ব্রেইনস্টর্মিং প্রধানত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়?
৪. মাইন্ডম্যাপিং প্রধানত কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. সামাজিক গঠনবাদের মূল কথাগুলো লিখুন।
২. ধারণা পরিবর্তন মডেলের মূল ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন।
৩. একটি উদাহরণের সাহায্যে রসায়ন শিক্ষণে পি ও ই কৌশল প্রয়োগ উপস্থাপন করুন।
৪. রসায়ন শিখনে সহযোগিতামূলক শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য কী কী প্রয়োজন তা আলোচনা করুন।

অধ্যায় ৪ : পাঠ পরিকল্পনা ও রসায়ন শিখন মূল্যায়ন

শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের মূল ধাপ হলো শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা। শ্রেণিকক্ষে নানা ধরনের কলা-কৌশল সমন্বয়ে এ শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ কার্যক্রম ফলপ্রসূভাবে পরিচালনা করার জন্য দরকার কার্যকর পরিকল্পনা। একক ও দৈনিক পাঠ পরিকল্পনা ব্যবহারের মাধ্যমে শিখন-শিখানোর কাজকে ত্বরান্বিত ও ফলপ্রসূভাবে সম্পন্ন করা যায়। এরপর, শিখন-শেখানোর কার্যক্রম পরিচালনা শেষে আমরা বুঝতে চাই, শিক্ষার্থী তার জন্য নির্ধারিত শিখন অর্জন করেছে কি না। এটিই শিখন মূল্যায়ন। আমরা এ ইউনিটে মূলত দুইটি বিষয় আলোচনা করেছি - শিখন-শেখানো কাজের পরিকল্পনা ও শিখন মূল্যায়ন। এ দুইটি বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহকে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

৪.১ একক (ইউনিট) পরিকল্পনার ধারণা ও প্রণয়নের ধাপসমূহ, গঠনবাদের ভিত্তিতে রসায়নের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

৪.২ ব্যবহারিক রসায়ন পাঠ পরিকল্পনা, PCK (Pedagogical Content Knowledge) এর ধারণা, পেশাগত শিখন : লেসন স্টাডি, প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

৪.৩ তত্ত্বীয় রসায়ন শিখন মূল্যায়ন - বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৪.৪ রচনামূলক সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি

৪.৫ ব্যবহারিক রসায়নের শিখন মূল্যায়ন - মনোপেশীজ ও আবেগিক শিখন মূল্যায়ন

৪.১ একক (ইউনিট) পরিকল্পনা - ধারণা ও প্রণয়নের ধাপসমূহ, গঠনবাদের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা - তত্ত্বীয় রসায়ন

একক পরিকল্পনা

যে কোনো কাজ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন পূর্ব পরিকল্পনা। শ্রেণি শিক্ষণের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে হলে একজন শিক্ষকেরও প্রয়োজন একটি পূর্ব পরিকল্পনা করে নেওয়া। বছরের প্রথমেই এ পরিকল্পনা করে নিতে হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বা সারা বছরে কোনো বিষয় ধারাবাহিকভাবে শিক্ষা দিতে হলে সারাবছরে তিনি তাঁর বিষয়ে কয়টি ক্লাস পেতে পারেন তা তিনি সাপ্তাহিক রুটিন দেখে হিসেব করে বের করে নিতে পারেন। তবে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড, সাময়িক পরীক্ষা, বার্ষিক পরীক্ষা, পরীক্ষার পূর্বে বিষয়ের পুনরালোচনা, ছুটির দিন ইত্যাদি পর্যালোচনা করে মোট কার্যদিবসের সংখ্যা বের করতে হবে।

নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি পাঠ্যবিষয়কে সাধারণত কতকগুলো অধ্যায় বা এককে বিভাজন করা হয়। এই বিভাজিত অংশগুলোকে এক একটি একক (ইউনিট) নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি এককে বা অধ্যায়ে রয়েছে কয়েকটি পাঠে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা করার মতো বিষয়বস্তু। শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নবম-দশম শ্রেণির রসায়ন পাঠ্যপুস্তক ১২টি একক বা অধ্যায় নিয়ে রচিত। রসায়নের একজন শিক্ষক এই ১২টি অধ্যায়ের একেকটি অধ্যায় বা ইউনিটের বিষয়বস্তু কতটি ক্লাসে/পাঠে পড়াবেন তা নির্ধারণ করে নেবেন এবং এদের সে অনুযায়ী পাঠে বণ্টন করবেন। এ কাজটি করতে শিখন বিষয়ের উদ্দেশ্য ও শিখনফল, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, উপকরণ ও মূল্যায়ন ইত্যাদি বিবেচনা করতে হয়। শিখনফলগুলোকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পাঠে বণ্টনের পর শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো কার্যক্রম, উপকরণ ও মূল্যায়ন কৌশল নির্ধারণ করবেন। এভাবে একটি অধ্যায় বা ইউনিটের জন্য একটি রূপরেখা বা পরিকল্পনাই হলো একক পরিকল্পনা (Unit Plan)। সহজভাবে বলা যায়, প্রতিটি পাঠ/একক কতদিনে সম্পন্ন করা হবে, কীভাবে পাঠ পরিচালনা করা হবে, কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে এর সার্বিক পরিকল্পনা হলো একক পরিকল্পনা। পাঠ্যপুস্তকের একটি অধ্যায়কে নিয়ে একটি একক পরিকল্পনা তৈরি করা সহজতর। তবে কখনও কখনও একাধিক অধ্যায় নিয়েও একটি পাঠ/একক তৈরি করা যায়। নিচে একটি একক পরিকল্পনার নমুনা দেওয়া হলো।

আপনারা লক্ষ করুন যে, নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে দ্বিতীয় অধ্যায় ৮ টি শিখনফল দেওয়া আছে। এর মধ্যে দু'টি শিখনফল হলো :

(৭) প্রকৃতিতে সংঘটিত বাস্তব ঘটনা রসায়নের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণে আগ্রহ প্রদর্শন করতে পারবে এবং

(৮) রাসায়নিক দ্রব্য ও থার্মোমিটার সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারবে।

রসায়নের বিভিন্ন অনুসন্ধানমূলক কাজ থেকে শিক্ষার্থীরা উপরিউক্ত শিখনফল দু'টি অর্জন করবে। বাকি ৬টি শিখনফলকে এ অধ্যায়ের বিষয়বস্তু পড়ার মাধ্যমে সরাসরি অর্জন করা যাবে। এই ৬টি শিখনফলকে পুনর্বিন্যস্ত করে ৭টি শিখনফল করা হয়েছে। এরপর পুরো ইউনিটের শিখনফল ও বিষয়বস্তুকে বণ্টন করা হয়েছে কারিকুলামে দ্বিতীয় অধ্যায়ের জন্য ১২টি পিরিয়ড আছে। প্রতি পিরিয়ডের জন্য শিখনফল, বিষয়বস্তু, শিখন-শেখানো পদ্ধতি এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ নির্ধারণ করা হয়েছে। এই একক পরিকল্পনা তৈরি করার পর একজন শিক্ষকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, এই একক বা অধ্যায়টি পড়ানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী শিখন অর্জন করবে, কোনো শিখনফল অর্জন করানোর জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়বস্তু পড়াবেন, কীভাবে তিনি শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, কী উপকরণ দরকার হবে এতে এবং কীভাবে তিনি শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করবেন। এই একক পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে তিনি প্রতি পাঠের জন্য পাঠ পরিকল্পনা করবেন।

একক পরিকল্পনা প্রণয়ণের ধাপ

একক পরিকল্পনা তৈরি করতে হলে কতকগুলো ধাপ অনুসরণ করতে হবে। ধাপগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

প্রথম ধাপ : পাঠভিত্তিক শিখনফল বিভাজন

এই ধাপের প্রথম পর্যায়ে একজন শিক্ষক নির্ধারিত অধ্যায়ের জন্য শিক্ষাক্রমে কয়টি পাঠ সুপারিশ করা হয়েছে তা দেখে নিবেন। এরপর শিখনফলগুলোকে পাঠের সাথে মিল রেখে বিভিন্ন পাঠের মধ্যে বিভাজন করতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, একটি শিখনফল অর্জনের জন্য কখনো কখনো ২-৩টি পাঠও লাগতে পারে। এক্ষেত্রে শিখনফলকে বিভাজন করে বিভাজিত শিখনফল লিখতে হবে।

দ্বিতীয় ধাপ : বিষয়বস্তু সংগঠন

এই ধাপে শিখনফল বা বিভাজিত শিখনফল অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম অনুসারে কী কী বিষয়বস্তু দরকার তা সনাক্ত করতে হবে। এই বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় অবশ্যই প্রতি পাঠের সময়ের দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

তৃতীয় ধাপ : শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণ

এই ধাপে নির্ধারিত বিষয়বস্তুর মাধ্যমে শিখনফল অর্জনের সহায়তা প্রদানের জন্য শিখন শেখানো কার্যাবলির কৌশল নির্ধারণ করা হয়। শিখন-শেখানো কৌশল নির্ধারণে শিক্ষককে মনে রাখতে হবে কৌশলগুলো যেন গঠনবাদী এপ্রোচের হয়।

চতুর্থ ধাপ : শিখন উপকরণ নির্ধারণ

এই ধাপে শিখন- শেখানো কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার জন্য প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণ সুনির্দিষ্ট করতে হবে। রসায়ন পাঠ্যপুস্তক থেকে অনেকখানি বোঝা যাবে পাঠ পরিচালনায় কী কী উপকরণ দরকার হবে। এর সাথে শিখন-শেখানো কৌশল বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় শিখন উপকরণ ও তাদের সংখ্যা নির্ধারণ করা দরকার।

পঞ্চম ধাপ : মূল্যায়ন কৌশল

এই ধাপে মূলত কী ধরনের মূল্যায়ন কৌশলের মাধ্যমে নির্ধারিত শিখনফল অর্জিত হবে তা সুনির্দিষ্ট করতে হবে।

ষষ্ঠ ধাপ : বিশেষ নির্দেশনা

এই ধাপে প্রয়োজনীয় মন্তব্য লিখে রাখতে হবে। যেমন, উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বা প্রস্তুতি; মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য পূর্ব প্রস্তুতি কিংবা কোন ধরনের শিখন-শেখানো কৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো নির্দেশনা থাকবে।

একক পরিকল্পনার নমুনা

বিষয়	:	রসায়ন	শ্রেণি	:	নবম
একক	:	০২	এককের নাম	:	পদার্থের গঠন
পাঠসংখ্যা	:	০৭ টি	প্রতি পাঠের সময়	:	৫০ মিনিট
সময়কাল	:	ফেব্রুয়ারি-মার্চ....			

তারিখ	শিখনফল	বিষয়বস্তু	শিখন-শেখানো কৌশল/ পদ্ধতি	শিখন-শেখানো উপকরণ	মূল্যায়ন	পিরিয়ড সংখ্যা
১১/২ ও ১৩/২	১। কণার গতিতত্ত্বের স্বীকার্যের সাহায্যে পদার্থের ভৌত অবস্থা ব্যাখ্যা করতে পারবে	পদার্থের ভৌত অবস্থা, কণার গতিতত্ত্ব	শিক্ষার্থীর একক কাজ, দলগত আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পিওই	পেন্সিল, পাথরের টুকরা, পানি, পানির গ্লাস, বেলুন, সিরিঞ্জ	সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	২টি
১৫/২	২। গতিতত্ত্বের সাহায্যে ব্যাপন ও নিঃসরণের ব্যাখ্যা করতে পারবে। ৩। তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে ব্যাপন হার বৃদ্ধি পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারবে।	কণার গতিতত্ত্ব, ব্যাপন	পিওই/পরীক্ষণ, আলোচনা	তরল নীল, ড্রপার, কাচের গ্লাস, পাণ্ডা পানি, গরম পানি, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট স্ফটিক	পর্যবেক্ষণ	১টি
১৮/২		কণার গতিতত্ত্ব, নিঃসরণ	পিওই, আলোচনা	হিলিয়াম গ্যাসপূর্ণ বেলুন, মাল্টিমিডিয়া, কম্পিউটার	পর্যবেক্ষণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	১টি
২০/২ ও ২২/২	৪। কঠিন পদার্থের গলন ও তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া বর্ণনা করতে পারবে। ৫। কঠিন পদার্থের গলন ও তরল পদার্থের স্ফুটন প্রক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারবে। ৬। ভৌত অবস্থা ও তাপের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবে।	মোমের জ্বলন ও পদার্থের তিন অবস্থা, পদার্থের গলন ও স্ফুটন	পরীক্ষণ, আলোচনা	মোমবাতি, কাচনল, গলন টিউব, থার্মোমিটার, বিকার, পানি, স্পিরিট ল্যাম্প	পর্যবেক্ষণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	২ টি
২৫/২	৭। কঠিন পদার্থের ঊর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে দেখাতে পারবে।	ঊর্ধ্বপাতন	পিওই, আলোচনা	ন্যাপথালিন, বিকার, ল্যাম্প	পর্যবেক্ষণ, সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন	১

সামাজিক গঠনবাদ অনুসারে তত্ত্বীয় পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন

একটি পাঠকে ফলপ্রসূ করতে হলে শিক্ষককে প্রথমেই একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখা বা পরিকল্পনা করে নিতে হয় ঐ পাঠটিকে নিয়ে। আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি একটি অধ্যায় বা পাঠ একককে কয়েকটি পাঠে বিভাজন করে শিক্ষককে একক পরিকল্পনা করতে হয়। একক পরিকল্পনার প্রতিটি পাঠকে ধরে এক একটি পাঠ পরিকল্পনা করবেন শিক্ষক। একটি পাঠের এই পরিকল্পনায় থাকে, শিক্ষার্থীরা ঐ পাঠের মধ্য দিয়ে কোনো শিখনফল অর্জন করবে, শিখনফল অর্জনের জন্য কতটুকু বিষয়বস্তু উপস্থাপিত হবে, শিক্ষার্থীরা কীভাবে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করবে, শিক্ষকের ভূমিকা কী থাকবে, কত সময় ধরে শ্রেণি কার্যক্রম চলবে, কী উপকরণ ব্যবহৃত হবে কীভাবে শিক্ষার্থীদের অর্জিত শিখন মূল্যায়ন করা হবে ইত্যাদি। অর্থাৎ একটি পাঠ পরিকল্পনা হলো নির্দিষ্ট শ্রেণিতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট শিখনফল অর্জনের জন্য পাঠ পরিচালনা করার বিস্তারিত একটি লিখিত রূপরেখা।

পাঠ পরিকল্পনার উপাদান

আমরা পাঠ পরিকল্পনার ফরম্যাট বা ছকটিতে দেখতে পাচ্ছি এটিকে বেশ কয়েকটি উপাদান বা অংশে ভাগ করা যায়। নিচে পাঠ পরিকল্পনার উপাদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো–

পাঠ পরিচিতিমূলক তথ্য : পাঠ পরিকল্পনার প্রথমে থাকবে পরিচিতিমূলক তথ্যসমূহ। এতে প্রতিষ্ঠানের নাম, শিক্ষকের নাম, বিষয়, শ্রেণি, শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা, সময় ও তারিখ উল্লেখ করতে হয়।

প্রেষণাসঞ্চার/শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকরণ/ওরিয়েন্টেশন : পরিচিতিমূলক তথ্যের পরেই যেটি দরকার তা হলো একজন শিক্ষক কীভাবে শিক্ষার্থীদের শ্রেণি পাঠের জন্য প্রস্তুত করবেন। অর্থাৎ শিক্ষক এ অংশে উল্লেখ করবেন তিনি কীভাবে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ পাঠের দিকে নিয়ে আসবেন। শিক্ষার্থীদের পাঠে প্রস্তুত করার জন্য পাঠসংশ্লিষ্ট কোনো ঘটনা, বস্তু, মডেল ইত্যাদি উপস্থাপন করতে পারেন।

শিখনফল : পাঠ পরিকল্পনার এ অংশে আচরণিক উদ্দেশ্য অথবা শিখনফল উল্লেখ করতে হবে। আমাদের শিক্ষাক্রম এবং পাঠ্যপুস্তকে বর্তমানে শিখনফল নির্ধারণ করা আছে। প্রয়োজনে একটি নির্ধারিত শিখনফলকে বিভাজন করে একাধিক শিখনফল লিখতে হয়। শিখনফল সুনির্দিষ্ট হতে হয় এবং শ্রেণিকক্ষে সরাসরি পরিমাপযোগ্য ও পর্যবেক্ষণযোগ্য হতে হয়। বিভাজিত শিখনফল লেখার সময় কর্মসম্পাদনমূলক ক্রিয়াপদ (Action Verb) ব্যবহার করতে হবে। যেমন– ব্যাখ্যা করতে পারবে, বিশ্লেষণ করবে, প্রয়োগ করবে, বর্ণনা করবে, উল্লেখ করবে, সনাক্ত করবে, নিরূপণ করবে, তুলনা করবে ইত্যাদি।

বিষয়বস্তু বা ধারণা : এ অংশে পাঠের শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তু সংক্ষেপে উপস্থাপন করতে হয়। কখনও কখনও একটি শিখনফল অর্জনের জন্য একটি ধারণা বা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে, আবার কখনও একাধিক ধারণাও অন্তর্ভুক্ত করতে হতে পারে।

শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং উপকরণ : শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী, মনোযোগী এবং সক্রিয় করে তোলার জন্য উপযোগী শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল উল্লেখ করতে হয় এ অংশে। এখানে মনে রাখতে হবে এই পদ্ধতি ও কৌশলগুলো হতে হবে গঠনবাদভিত্তিক পদ্ধতি ও কৌশল। এ পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচনে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে এর দ্বারা শিক্ষার্থী নির্ধারিত শিখনফল অর্জন করবে কি না। নির্বাচিত পদ্ধতি ও কৌশল অনুসরণ করে পাঠের বিষয়বস্তু সহজ ও বোধগম্যভাবে করে উপস্থাপনের লক্ষ্যে যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হবে তার একটি তালিকাও এখানে থাকবে। যেমন– কর্মপত্র, চার্ট, মডেল, রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ : যে কোনো পাঠ পরিকল্পনায় শিখন-শেখানো কার্যাবলি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে তার সংক্ষিপ্ত একটি বিবরণ থাকে। আমরা রসায়নের পাঠ পরিকল্পনায় এটিকে দুইটি ভাগে ভাগ করেছি। প্রথমটি হলো শিক্ষার্থীর কাজ। গঠনবাদী শিখনতত্ত্বে শিক্ষার্থীর শিখনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নিজেরই। তাই রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষার্থীকেই বেশি ভূমিকা রাখতে হবে; অর্থাৎ শিখন-শেখানো হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। শিক্ষার্থী যদি শিখন প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা নেয় তাহলেই তার শিখন ফলপ্রসূ হবে। পাঠ পরিকল্পনার অংশে থাকবে শিক্ষার্থী কী কাজে অংশ নেবে তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (শিক্ষার্থী জোড়ায় বা দলে আলোচনা করতে পারে, নিজে নিজে চিন্তা করে কোনো কাজ করতে পারে, শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক কাজে অংশ নিতে দেওয়া যেতে পারে যেখানে শিক্ষার্থী নিজে শুধু হাতে কলমে কাজই করবে না, বরং কাজ থেকে বিজ্ঞানের ধারণা গঠনেও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবে।

শিক্ষকের কাজ : পাঠ পরিকল্পনার এ অংশে থাকে **শিখন-শেখানো কার্যাবলি বাস্তবায়নে** শিক্ষকের কী ভূমিকা থাকবে। আমাদের অবশ্যই এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে, গঠনবাদী শিখন-শেখানো এপ্রোচে শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর (Facilitator), কোনোভাবেই জ্ঞানের সঞ্চালনকারীর (Tranmitter) নয়। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সকল ধারণা নিজে থেকে ব্যাখ্যা করে শিখিয়ে দেবেন না, তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের গাইড বা নির্দেশনা দেবেন বিজ্ঞানের সঠিক ধারণা গঠনের জন্য। শিক্ষার্থীরা যে যে কাজে অংশ নেবে শিক্ষক সেগুলোর নির্দেশনা দেবেন এবং কাজের মাধ্যমে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা, দক্ষতা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন।

মূল্যায়ন ও সার-সংক্ষেপ : পাঠ চলাচালীন ও বিশেষ করে পাঠের শেষাংশে পাঠ থেকে শিক্ষার্থীরা কতটুকু জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে পেরেছে তা যাচাই করা হয়। এজন্য পাঠের শিখনফলের সাথে মিল রেখে প্রশ্ন বা অভীক্ষা ব্যবহার করার মাধ্যমে যাচাই করতে হয়। পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষককে উল্লেখ করতে হয় তিনি কোনো কৌশল অবলম্বন করে শিক্ষার্থীর শিখন যাচাই করবেন ও ফিডব্যাক দেবেন এবং এর জন্য কোন ধরনের প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীদের সহায়তায় শিক্ষক পাঠের আলোচিত বিষয়সমূহের সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করবেন।

বাড়ির কাজ : পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষক উল্লেখ করবেন পাঠ শেষে তিনি বিষয়বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানের বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য কী ধরনের চিন্তামূলক কাজ বাড়িতে সম্পন্ন করার জন্য বলবেন।

পাঠ পরিকল্পনা তৈরির (তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক) কাঠামো ছক পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো।

রসায়নের পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়

রসায়নের একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশকিছু বিষয় বিবেচনায় রেখে অগ্রসর হতে হয়। নিচে এ বিবেচ্যগুলো সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

ক. **বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশীজ ও আবেগিক শিখনের সমন্বয় :** আমরা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকে দেখেছি একটি অধ্যায়ে বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশীজ ও আবেগিক এ তিন ধরনের শিখনের জন্যই শিখনফল রয়েছে। পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় বুদ্ধিবৃত্তীয় শিখনফলের সাথে সংশ্লিষ্ট ও সম্পর্কিত মনোপেশীজ ও আবেগীয় ক্ষেত্রের শিখনফলকে সমন্বিত করে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। অর্থাৎ শিক্ষক এমনভাবে বিষয়বস্তু ও শিখন-শেখানো কার্যাবলি নির্বাচন করবেন যাতে একইসাথে ও সমন্বিতভাবে শিক্ষার্থী তিন ধরনের শিখন অর্জন করতে পারে।

খ. **হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা :** শিক্ষার্থী বিজ্ঞানের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ সবচেয়ে ভালোভাবে শেখে অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে। রসায়ন পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষার্থীদের জন্য অনেক হাতে কলমে কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ, প্রজেক্ট ইত্যাদি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পাঠ পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীদের কর্তৃক হাতে কলমে কাজ সম্পাদনের সুযোগ রাখতে হবে।

গ. **দৈনন্দিন জীবনের সাথে বিজ্ঞানের যোগসূত্র/সম্পর্ক স্থাপন :** বিজ্ঞান প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাবলি সম্পর্কিত জ্ঞান। আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞানের সাহায্যে প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটতে থাকা ঘটনাকে যেমন বুঝতে পারি তেমনি বিজ্ঞানের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের জীবনকে সহজ ও উন্নতমানের করতে পারি। শিক্ষার্থীদের পাঠের বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য পাঠের শুরুতেই পাঠের বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের পরিচিত কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কোনো ব্যবহার উপস্থাপন করার মাধ্যমে পাঠের সূচনা করা ভালো। একইভাবে, শিক্ষার্থীরা নতুন কোনো জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে এর সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচিত কোনো ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বা শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের কোনো ব্যবহারকে যুক্ত করা দরকার। এতে শিক্ষার্থীরা তাদের নবগঠিত ধারণাকে পাকাপোক্ত করার সুযোগ পাবে।

ঘ. **সামাজিক গঠনবাদ ভিত্তিক পাঠ পরিচালনা :** আপনারা জেনেছেন যে, সামাজিক গঠনবাদ অনুসরণ করে বর্তমানে রসায়ন তথা বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনা করার কথা বলা হয়। সামাজিক গঠনবাদে শিক্ষার্থীর শিখনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীর নিজেরই। তাই রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষার্থীকেই বেশি ভূমিকা দিতে হবে; অর্থাৎ শিখন-শেখানো হবে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক। এ এপ্রোচে শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহায়তাকারীর (Facilitator), কোনোভাবেই জ্ঞানের সঞ্চালনকারীর (Tranmitter) নয়। অর্থাৎ শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সকল ধারণা নিজে থেকে ব্যাখ্যা করে শিখিয়ে দেবেন না, তিনি শুধু শিক্ষার্থীদের গাইড বা নির্দেশনা দেবেন বিজ্ঞানের সঠিক ধারণা গঠনের জন্য। শিক্ষার্থীরা যে যে কাজে অংশ নেবে শিক্ষক সেগুলোর নির্দেশনা দেবেন এবং কাজের মাধ্যমে নির্ধারিত শিখনফল অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ধারণা, দক্ষতা কিংবা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। একক, জোড়ায় এবং দলগত কাজের মাধ্যমে পাঠের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বিদ্যমান বা পূর্ব-ধারণা ও অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তাদের ধারণা পুনর্গঠনের সুযোগ দিতে হবে।

নমুনা : পাঠ পরিকল্পনার কাঠামো (তত্ত্বীয়)

বিদ্যালয়ের নাম : শ্রেণি : মোট শিক্ষার্থী : শিক্ষকের নাম :	বিষয় : রসায়ন অধ্যায়ের নাম : পাঠ শিরোনাম : সময় ও তারিখ :

প্রেষণাসঞ্চার/শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতকরণ/ওরিয়েন্টেশন :

শিখনফল	বিষয়বস্তু/ধারণা	সময়	শিখন-শেখানো কৌশল ও উপকরণ	শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষকের সহায়ক ভূমিকা
১।					
২।					

মূল্যায়ন ও পুনরালোচনা (মূল্যায়ন কৌশল ও নমুনা প্রশ্ন) :

বাড়ির কাজ :

নমুনা পাঠ পরিকল্পনা

নিচে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষক শিক্ষাক্রম সহায়িকা থেকে একটি নমুনা পাঠ পরিকল্পনা দেওয়া হলো। এই নমুনা অনুসরণ করেও পাঠ পরিকল্পনা করা যেতে পারে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: পদার্থের গঠন **পাঠ-৪: পরমাণু ও অণু** **সময় : ৫০ মিনিট**

শিখনফল	শিখন-শেখানো কার্যক্রম	শিখন যাচাই	শিক্ষা উপকরণ
অণু ও পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে। পাঠ্যপুস্তকে পাঠ ৪ ও ৫: পরমাণু ও অণু- একটি শিরোনামে দু'টি পাঠ অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনার শুরুতে পাঠগুলো বিভাজন করা হয়েছে। বিভাজিত পাঠ-৪: পরমাণু ও অণুর ধারণা, পাঠ-৫: পরমাণু ও অণুর মডেল তৈরি।	**পাঠ প্রস্তুতি** **সময়: ০৫ মিনিট** ● মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে কী বলে? ● যৌগিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণাকে কী বলে? ● পদার্থের অণু কোন ক্ষুদ্রতম কণা দ্বারা গঠিত? **পাঠ উপস্থাপন** **সময়: ১৫ মিনিট** ● মাটির তৈরি বল বা গোল আলুকে রং করে ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর মডেল তৈরি করে একই মৌলের পরমাণুর আকার একই রকম ও ভিন্ন ভিন্ন মৌলের পরমাণুর আকার ভিন্ন ভিন্ন সেই সম্পর্কে ধারণা প্রদান। ● পরমাণু মডেলকে কাঠি দিয়ে যুক্ত করে অণুর মডেল তৈরি ও উপস্থাপন। **একক কাজ** **সময়: ২০ মিনিট** ● প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাইড্রোজেন, অক্সিজেন ও পানির অণুর মডেল তৈরি করে উপস্থাপন করবে। ● উপস্থাপিত মডেলগুলো পর্যবেক্ষণ এবং ফিডব্যাকের মাধ্যমে ধারণা সুদৃঢ় করা হবে।	**প্রশ্ন:** **সময়: ০৫ মিনিট** ● যৌগের অণু কীভাবে তৈরি হয়? ● মৌলিক পদার্থের অণুকে ভাঙলে কী সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্য থাকে? ● যৌগিক পদার্থের অণুকে ভাঙলে কি সেই পদার্থের বৈশিষ্ট্য থাকে? ● যৌগের অণু কীভাবে সৃষ্টি হয়? **চিন্তনমূলক প্রশ্ন: সময়: ০৫ মিনিট** বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের পরমাণুর আকার সমান হবে কি? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।	● পরমাণু ও অণুর মডেল ● ভিন্ন ভিন্ন রং করা গোল আলু বা মাটি দিয়ে তৈরি ছোট ছোট বল, কাঠি
অন্যান্য বিবেচ্য বিষয়:	**শিক্ষকের আত্ম-প্রতিফলন:**		

ঙ. **কার্যকর গাঠনিক মূল্যায়ন :** শিখনফলের চাহিদা অনুসারে সমগ্র পাঠ জুড়ে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রের সবগুলো উপক্ষেত্র অর্থাৎ জ্ঞান থেকে উচ্চতর দক্ষতা পর্যন্ত সব ধরনের প্রশ্ন ব্যবহার করা আবশ্যক। শিক্ষার্থীর কাজ মূল্যায়ন করতে হবে এবং কাজের উপর নিয়মিত ফিডব্যাক ও শিখন সহায়তা দিতে হবে। পাঠের শেষে শিক্ষক সমাপ্তি বক্তব্য দেবেন যাতে থাকতে পারে পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এ থেকে কী শেখা হলো, এটি কীভাবে পরবর্তী পাঠে সাহায্য করবে কিংবা কোনো বিশেষ কাজের নির্দেশনা ইত্যাদি। সমগ্র পাঠ পরিকল্পনা তথা কার্যক্রমের মধ্যে ধারাবাহিকতা ও সঙ্গতি বজায় রাখতে হবে।

চ. **শিখনে সাম্য :** একটি শ্রেণিতে বিভিন্ন শিখন চাহিদা ও শিখন সামর্থ্যের (different abilities) শিক্ষার্থী থাকে। তাই শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর শেখার সাম্যের প্রতি লক্ষ রেখে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে।

৪.২ রসায়নে অনুসন্ধানমূলক কাজের পাঠ পরিকল্পনা ও পেশাগত শিখন : লেসন স্টাডি ও প্রতিফলনমূলক অনুশীলন

রসায়নের তত্ত্বীয় অংশের মতো ব্যবহারিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা করা প্রয়োজন। নিচে এরকম একটি পরিকল্পনার ফরম্যাট দেওয়া হলো :

অনুসন্ধানমূলক কাজের পাঠ পরিকল্পনা কাঠামো

শ্রেণী :	বিষয় :	অধ্যায় :	সময় :
শিখনফল :			
অনুসন্ধানমূলক সমস্যা/প্রশ্ন :			

শিখন শেখানো কার্যক্রম

১. পূর্বজ্ঞান যাচাই/প্রস্তুতকরণ :
২. পরিকল্পনা প্রণয়ন :
   - পরিকল্পনা :
   - প্রয়োজনীয় উপকরণ :
   - সতর্কতা :
৩. পরিকল্পনা বাস্তবায়ন/তথ্যসংগ্রহ :
   (পরিকল্পনা অনুযায়ী)
৪. তথ্য বিশ্লেষণ কৌশল :
৫. সিদ্ধান্ত :
৬. মূল্যায়ন : পরিকল্পনা প্রণয়নের দক্ষতা ও বিভিন্ন মানদণ্ড

PCK (Pedagogical Content Knowledge)-এর ধারণা

একজন শিক্ষককে পাঠের বিষয়বস্তু সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান (Content Knowledge) রাখতে হয়। একই সাথে পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপনের কলা-কৌশল সম্পর্কিত জ্ঞান ও দক্ষতা (Pedagogy) আয়ত্ত করার প্রয়োজন। আমরা পাঠ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি যে একটি পাঠকে ফলপ্রসূ করার জন্য শিক্ষককে ঐ পাঠের বিষয়বস্তু এবং উপস্থাপন কলাকৌশল-এ দুইটির মধ্যে নিবিড় সমন্বয় করতে হয়। আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় মূলত এই সমন্বয়কে নিয়ে।

Pedagogical Content Knowledge (PCK) বর্তমানে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ধারণা। যে কোনো বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট বোধগম্য করে তুলতে শিক্ষক বিভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন। সর্বপ্রথম Lee S Shulman 1986 সালে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে সুনির্দিষ্ট pedagogy ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিকট উপস্থাপনের পেছনে শিক্ষকের যে চিন্তা বা যুক্তিগুলো কাজ করে সেগুলোকে তুলে ধরতে pedagogical content knowledge ধারণাটির অবতারণা করেন।

আপনারা প্রত্যেকে রসায়ন বিষয়ে সম্যক জ্ঞান অর্জন করেছেন যেটিকে আমরা Content Knowledge বলে থাকি। আবার আপনারা বি এড কার্যক্রমে শিখন-শেখানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ও এদের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেক কিছু জেনেছেন এবং আরো জানবেন। সাধারণভাবে আমরা এ ধরনের জ্ঞানকে বলি pedagogical knowledge। আপনি যখন প্রাকটিস টিচিং এবং পরবর্তীতে বিদ্যালয়ে শিখন-শেখানো পরিচালনা করবেন তখন আপনি রসায়নের একটি ধারণা (ধরুন, পরমাণুর গঠন) শেখানোর জন্য নির্দিষ্ট একটি শিক্ষণপদ্ধতি ব্যবহার করবেন। ঐ শিক্ষণপদ্ধতিটি খুব ফলপ্রসূ মনে না হলে পরবর্তী ক্লাসে আপনি অন্য একটি পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। এভাবে এক সময় আপনি বুঝে যাবেন পরমাণুর গঠন পড়ানোর জন্য কোনো শিখন-শেখানো পদ্ধতিটি সবচেয়ে কার্যকর ও কেন এটি কার্যকর। এভাবে নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের নিকট সবচেয়ে বেশি বোধগম্য করে তুলতে কোনো শিখন-শেখানো পদ্ধতিটি সবচেয়ে বেশি কার্যকর, সময়ের সাথে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে একজন শিক্ষক সে বিষয়টি ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারেন। একজন শিক্ষক তার অভিজ্ঞতার আলোকে রসায়নের বিভিন্ন বিষয় পড়ানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। উদাহরণস্বরূপ, "পরিবেশ দূষণের কারণ"– এ বিষয়টিকে শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে ভালোভাবে বোঝাতে একজন শিক্ষক অনুসন্ধানমূলক কাজ ব্যবহার করেন কিন্তু 'পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের করণীয়' এ বিষয়টি শিখন-শেখানোর জন্য অনুসন্ধানের পরিবর্তে মাইন্ড ম্যাপিং ব্যবহার করলেন।

কোনো শিক্ষকের কাছে যদি জানতে চাওয়া হয় 'কেন' তিনি একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর (content) জন্য নির্দিষ্ট পদ্ধতি (pedagogy) প্রয়োগ করলেন কিংবা দু'টি বিষয়বস্তুর জন্য কোনো দু'টি ভিন্ন শিক্ষণ পদ্ধতি বাছাই করলেন, এর উত্তরে শিক্ষকের যে চিন্তা বা যুক্তির প্রকাশ ঘটবে তার উৎসই হচ্ছে শিক্ষকের PCK। সহজভাবে বলা যায় যে, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু বা ধারণা পড়ানোর জন্য কোনো নির্দিষ্ট শিখন-শেখানো পদ্ধতিটি বেশি কার্যকর সে সম্পর্কিত জ্ঞান হচ্ছে PCK। একটি বিষয় মনে রাখতে হবে একটি নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু (ধরুন, পরমাণুর গঠন) ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপনের জন্য একেকজন শিক্ষক একেক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ প্রত্যেক শিক্ষকের PCK আলাদা এবং unique কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে প্রত্যেক শিক্ষকের পেশাগত জ্ঞান বা দক্ষতার পরিচায়ক।

চিত্র ৪.১ : PCK উপাদান

বিজ্ঞান শিক্ষকদের PCK-এর উপাদান (PCK Components)

শিক্ষকদের PCK কীভাবে বিকশিত হয়, কোনো কোনো উপাদান একে প্রভাবিত করে, কীভাবে এর উন্নয়ন সাধন

করা যায়, এসব বিষয়ের স্পষ্ট ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রচুর গবেষণা হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা থেকে বিজ্ঞান শিক্ষকের PCK-এর গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি উপাদান পাওয়া যায়। এগুলো হলো :

- শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান (Knowldege of Science Content)
- বিজ্ঞান শিখন-শেখানো সম্পর্কিত জ্ঞান (Knowldege of Science Pedagogy)
- শিখন পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Learning Environment)
- শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে জ্ঞান এবং তারা কীভাবে শেখে সে সম্পর্কে জ্ঞান (Knowldege of Students and How they Learn)
- বিজ্ঞান শিক্ষণের সাথে পরিচিতি (Orientation Towards Teaching Science)

একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের নিজের PCK গঠিত হয় উপরোক্ত পাঁচ ধরনের জ্ঞানের সমন্বয়ে। একজন শিক্ষকের PCK কতটা সমৃদ্ধ এটি নির্ভর করে উপরোক্ত পাঁচ ধরনের জ্ঞান এবং এ জ্ঞানের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শিক্ষণ পরিচালনার ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতার উপর।

রসায়ন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়ন

শিখন শেখানো কার্যাবলির মানোন্নয়নের জন্য শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতার উন্নয়ন অপরিহার্য। পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে সাধারণভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে/চাকরিকালে (Inservice) পেশাজীবীগণ যে প্রশিক্ষণ পেয়ে থাকেন তাকে বোঝানো হয়। অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চাকরিতে প্রবেশের পূর্বেই একজন ব্যক্তিকে শিক্ষা বিষয়ক ডিগ্রি/ ডিপ্লোমা/ সার্টিফিকেট অর্জন করতে হয়।

চাকরিকালীন পেশাগত উন্নয়ন কার্যক্রমগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বনে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা থেকে দেখা যায়, এই কৌশলগুলো মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হলো Top-Down approach এবং অন্যটি হলো Bottom-Up approach. Top-Down approach হলো বহুল প্রচলিত পেশাগত উন্নয়ন (Professional Development) প্রোগ্রামসমূহ যেগুলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত হয়ে থাকে । এসব কার্যক্রমে অল্প সময়ে অনেক বেশি তথ্য প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে নতুন প্রবর্তিত বিষয় বা পরিবর্তন সম্পর্কে ধারণা প্রদান (যেমন– সৃজনশীল প্রশ্ন, নতুন পাঠ্যবই) বা শিক্ষকদের নির্দিষ্ট দক্ষতার উন্নয়ন (কম্পিউটার দক্ষতা, নতুন কোনো শিখন-শেখানো কৌশল) ইত্যাদি এ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত।

অন্যদিকে Bottom-Up approachটি বর্তমানে পেশাগত শিখন বা Professional Learning নামে পরিচিত। এটি এক ধরনের Reflective practice বা প্রতিফলন অনুশীলন। নিজ কাজের প্রতিফলন চর্চা বা অনুশীলন এমন একটি কৌশল, যা শিক্ষককে তার পেশাগত মান সম্পর্কে ফলাবর্তন পেতে এবং এ ফলাবর্তন অনুসারে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ পেয়ে থাকে। পেশাগত শিখনে শিক্ষক স্বতন্ত্রভাবে শিখনের পাশাপাশি সহকর্মীদের সাথে সহযোগিতামূলক পরিবেশে পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকরা মূলত পেশাগত শিখন দল (Professional Learning Community) গঠন করে থাকেন। পেশাগত শিখন দলে শিক্ষকেরা বিষয়বস্তু সংক্রান্ত সমস্যা, নতুন কোনো শিখন শেখানো কৌশল প্রয়োগজনিত সমস্যাসহ শিখন শেখানো কার্যক্রমের দৈনন্দিন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সচেষ্ট থাকেন।

প্রতিফলনমূলক বা অনুধ্যানমূলক অনুশীলন (Reflective Practice) : স্ব-উদ্যোগে শিক্ষকতা পেশার মান উন্নয়নে শিক্ষকরা সবসময়েই কিছু না কিছু করে থাকেন। যেমন, শিক্ষকরা একটি ক্লাস পরিচালনা করার সময় এবং ক্লাস সম্পন্ন করার পর ঐ ক্লাসের উপর প্রতিফলন বা আত্ম-মূল্যায়ন করে থাকেন। এই আত্ম-মূল্যায়ন- এর উদ্দেশ্য ক্লাসের ভুলত্রুটি বের করে পরবর্তীতে আরও ভালোভাবে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনা করা। শিক্ষকদের এ আত্ম-মূল্যায়নে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে পেশাগত উন্নয়ন মানসম্মত হয়। নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে আত্ম-মূল্যায়নকে প্রতিফলনমূলক অনুশীলন বা চর্চা বলে।

নিজ কাজের প্রতিফলন চর্চা বা অনুশীলন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একজন শিক্ষক তার শিখন শেখানো দক্ষতার প্রয়োগের অভিজ্ঞতাগুলোকে আলোচনা, সমালোচনা ও মূল্যায়ন করে শিখন-শেখানো কার্যক্রমের উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন। শিক্ষকের প্রতিফলনমূলক অনুশীলনকে দুই ভাগে ভাগ করা যেতে পারে - কর্মের ওপর প্রতিফলন (Reflection on action) এবং কর্মকালীন/ক্রিয়াকালীন প্রতিফলন (Reflection in action)। কর্মের ওপর প্রতিফলন এর ক্ষেত্রে শিক্ষকের শ্রেণি কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর তার ওপর প্রতিফলন অনুশীলন করা হয় এবং ফলাবর্তনের ভিত্তিতে শিক্ষক তার চর্চায় পরিবর্তন ঘটাতে পারেন। ক্রিয়াকালীন প্রতিফলন হচ্ছে শ্রেণি কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতিফলনের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান। কর্মের ওপর প্রতিফলন সাধারণত চারটি উপায়ে করা যেতে পারে।

- কর্মসহায়ক/ কার্যোপযোগী গবেষণা (Action research)
- কেস স্টাডি (Case Study)
- পাঠ সমীক্ষা (Lesson study)
- মেন্টরিং (Mentoring)

কর্মের ওপর প্রতিফলনের একটি বিশেষ কৌশল হিসেবে পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study) কার্যক্রমটির বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

পাঠ সমীক্ষা (Lesson Study)

পাঠ সমীক্ষা হলো শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের একটি ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া যেখানে শিখন- শেখানো কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষকগণ তাঁদের সহকর্মীদের নিয়ে একসাথে কাজ করেন। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষকেরা সম্মিলিতভাবে পরিকল্পনা, অনুশীলন ও প্রতিফলনের (Collaborative reflection) মাধ্যমে তাদের প্রত্যেকের শিখন শেখানো কাজ এর মান উন্নয়ন করতে পারেন। অর্থাৎ পাঠ সমীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিখন পদ্ধতি ও তার বাস্তবায়ন এর পথ খুঁজে বের করতে পারেন। পাঠ সমীক্ষা কার্যক্রমের সাধারণ মডেল হচ্ছে পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও প্রতিফলন চক্র (Plan- Do- See cycle) । এ মডেলের একেকটি চক্রকে মানসম্মত শিক্ষণ চক্র বলা হয়।

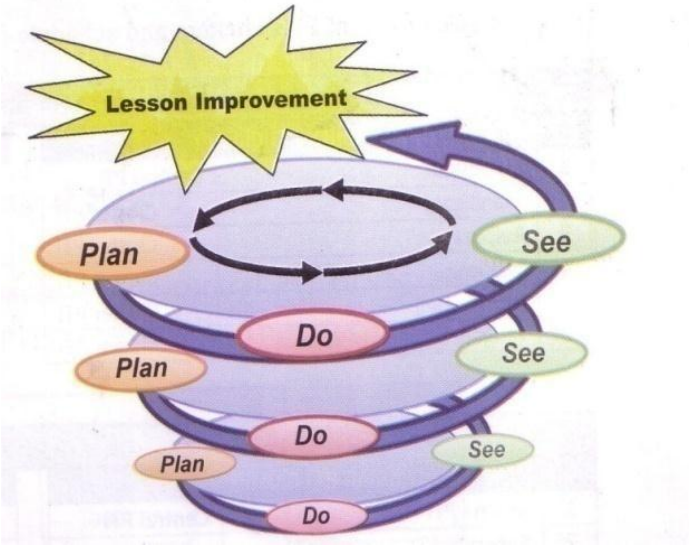

চিত্র ৪.২: Lesson study model

পাঠ সমীক্ষা প্রক্রিয়া

শিক্ষকের ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় পাঠসমীক্ষা কার্যক্রম একটি কার্যকরি কৌশল। এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সাধারণত তিন থেকে ছয়জন সদস্যের (শিক্ষক, প্রধান শিক্ষক, বহিরাগত বিশেষজ্ঞ) সমন্বয়ে একটি দলগঠন করা হয়ে থাকে। পাঠ সমীক্ষা মূলত তিনটি পর্যায়ে হয়ে থাকে; পর্যায় তিনটি হলো - পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন এবং প্রতিফলন (Plan-Do-See)। প্রতিটি পর্যায়ে যে কাজগুলো করতে হয়, তা নিচে বর্ণনা করা হলো।

পর্যায়-১ : কর্মপরিকল্পনা : দলের সদস্যরা প্রথমেই পাঠ সমীক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন। তারপর বার্ষিক পাঠ পরিকল্পনা ও ক্লাস রুটিনের সাথে সমন্বয় করে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করবেন। কর্ম পরিকল্পনায় পাঠ বাস্তবায়নের তারিখ, শ্রেণি, বিষয় ও আলোচনা সভাসমূহের সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হবে। পাঠটি সপ্তাহের শেষ কর্মদিবসের শেষ পিরিয়ডে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন : পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পূর্বে দলের সদস্যরা একটি আলোচনা সভার আয়োজন করবে। এ সভায় ঠিক করতে হবে শিক্ষকের কোনো শিক্ষণ-দক্ষতার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। এছাড়াও পাঠের শিখনফল, বিষয়বস্তু এবং পাঠ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণ করা হবে। পাঠে শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশীজ, আবেগিক সকল ধরনের শিখন অর্জন নিশ্চিত করার দিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। দলের সকলে বিষয়বস্তুর ধারণা ও বিস্তৃতি, শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্তকরণের কৌশল ও এর প্রেক্ষিতে তাদের আচরণ, শিক্ষার্থীদের চিন্তার বিকাশ, শিখনের ধরন প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবে। এ আলোচনার ভিত্তিতে পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ তৈরি করবেন। এ সভাটি পাঠ পরিচালনার দুই সপ্তাহ আগে করা যেতে পারে।

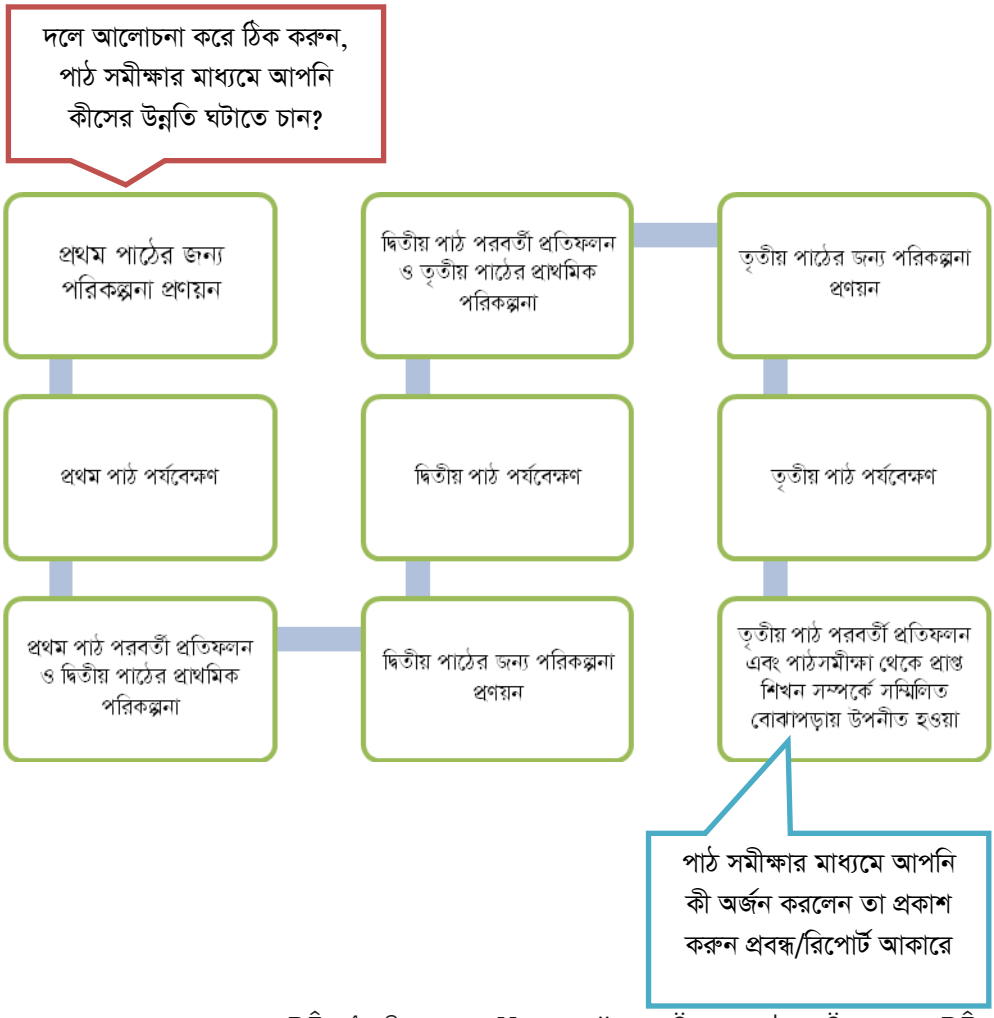

wPÎ 4.3 : cvV mgxÿv cÖwµqvi cÖevn wPÎ

পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের পর আরেকটি সভায় দলের সদস্যদের সাথে প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনে পাঠ সিমুলেশন করা যেতে পারে। এ সভায় দলের সদস্যরা পাঠ পরিকল্পনার যেসব ক্ষেত্র পর্যবেক্ষণ করবেন সেগুলো হলো :

- পরিষ্কার, সুনির্দিষ্ট ও অর্জনযোগ্য শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে কি না।
- শিক্ষক শিখনফল অর্জনের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট শিখন শেখানো পদ্ধতি নির্ধারণ করেছে কি না
- শিক্ষক পাঠের সাথে সংশ্লিষ্ট সর্বোৎকৃষ্ট শিক্ষা উপকরণ নির্বাচন করেছে কি না।
- শিখন শেখানো কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে কি না।
- কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের জন্য যথাযথ পাঠ পরিকল্পনা করা হয়েছে কি না।

অতঃপর দলের সদস্যদের সুপারিশ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পাঠ পরিকল্পনা পরিমার্জন করবেন। এ পর্যায়ের কাজ পাঠ বাস্তবায়নের এক সপ্তাহ আগে করা যেতে পারে।

পর্যায়-২ : পাঠ বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ

পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষক এ পর্যায়ে শ্রেণিতে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। দলের সকল সদস্য এ সময় পাঠ পর্যবেক্ষণ (পর্যবেক্ষণ ছক অনুযায়ী) করবেন। দলের বাইরে অন্য সহকর্মীরাও চাইলে/প্রয়োজনে পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে পারেন। প্রধান শিক্ষক পাঠ পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকদের রুটিনের নির্ধারিত ক্লাসের পাঠ ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন। উক্ত পাঠটি যে পর্যবেক্ষণ করা হবে, এ তথ্যটি আগের দিন শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখলে ভালো হয়। ক্লাসের শুরুতে পর্যবেক্ষকদের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে পাঠ শুরু করা যেতে পারে।

শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালিত হবে পাঠ বাস্তবায়নকারী শিক্ষকের পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী। পাঠ পর্যবেক্ষণের সময় প্রত্যেক পর্যবেক্ষণকারী শিক্ষকের নিকট উক্ত পাঠ পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ ছক থাকা বাঞ্ছনীয়। পাঠ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক কী কী করছেন তা নয়, বরং শিক্ষকের কার্যক্রম কীভাবে শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করছে এবং তাদের শিখনে সহায়তা করছে সেটিই মুখ্য বিষয়। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও প্রতিক্রিয়া থেকে তাদের শিখন কতটুকু অর্জিত হলো তা নির্ণয়ের মাধ্যমে পাঠ পর্যবেক্ষণকালে ঐ শিক্ষকের শিখন শেখানো কাজের উপর প্রতিফলন করা হয়ে থাকে।

পর্যায় ৩ : প্রতিফলন

পাঠ পরিচালনা শেষে, অল্পসময়ের ব্যবধানে পাঠ পরিচালনাকারী শিক্ষক ও পর্যবেক্ষকগণের সমন্বয়ে একটি de-briefing সভার আয়োজন করা হয় যেখানে উক্ত পাঠ নিয়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করা হয়। এ আলোচনা বাস্তবায়নকৃত শ্রেণিকক্ষে হওয়া বাঞ্ছনীয় কারণ এতে বোর্ডের ব্যবহারসহ পুরো শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক আলোচনা সহজতর ও কার্যকর হতে পারে। পাঠ বাস্তবায়নোত্তর এ আলোচনার মূল উদ্দেশ্য হবে পাঠটিকে ভবিষ্যতে আরো ফলপ্রসূভাবে উপস্থাপন করা, বাস্তবায়নকারী শিক্ষকের সমালোচনা নয়। পাঠ পরিচালনাকারী শিক্ষকের দুর্বলতাগুলোকে সবল করার উপায় বের করা এ আলোচনার ফোকাস হবে। প্রকৃতপক্ষে এ আলোচনা অংশগ্রহণকারী সকল শিক্ষকের পেশাগত শিখনের মাধ্যম। অর্থাৎ এ আলোচনাটিকে সকল সদস্যের সম্মিলিত শিখনের সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে যার মাধ্যমে প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে শিখন শেখানো কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সম্মিলিত সাধারণ বোঝাপড়া বা common understanding তৈরি হবে।

প্রতিফলনমূলক এ আলোচনায় সকল অংশগ্রহণকারী শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শিখন, চিন্তন ও পাঠে সম্পৃক্ততা/অংশগ্রহণের আলোকে পাঠ সম্পর্কে তাদের পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও মন্তব্য ব্যক্ত করেন। পাঠ বিষয়ক আলোচনা মূলত তিনটি প্রশ্নকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে :

- শিক্ষার্থীরা কীভাবে পাঠের উদ্দেশ্য অর্জন করেছে?
- পাঠটি কীভাবে আরো সমৃদ্ধ করা যায়?
- এ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কী শিখলাম?

পাঠের বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন হতে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ সংশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠটিকে আরো ফলপ্রসূ করে তোলার উপায় বের করা হয় এবং পাঠটি পরিমার্জন করা হয়। মানসম্মত ফল পেতে পাঠ সমীক্ষার তিনটি শিক্ষণচক্র সম্পন্ন করা হয়। প্রয়োজনে সমীক্ষাদল পাঠ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রসমূহ পরিবর্তন করে থাকেন। সবশেষে, উক্ত পাঠটি বিদ্যালয়ের বাইরে অন্য শিক্ষকদের ব্যবহার, পেশাগত সম্মেলনে উপস্থাপনা বা পেশাগত জার্নালে প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা যেতে পারে।

৪.৩ তত্ত্বীয় রসায়ন শিখন মূল্যায়নে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

রসায়ন শাস্ত্র একটি মৌলিক বিজ্ঞান হওয়ায় মাধ্যমিক পর্যায়ে রসায়ন শিখনে তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক দুটি অংশ রয়েছে। ফলে রসায়ন শিখন মূল্যায়নেও তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক রসায়ন শিখন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে তত্ত্বীয় রসায়ন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। এই লিখিত পরীক্ষায় দুইটি পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়, যথা : (ক) বহুনির্বাচনি ও (খ) সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার মধ্যে একটি বহুল ব্যবহৃত ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে বহুনির্বাচনি প্রশ্ন। বহুনির্বাচনি প্রশ্নপদ্ধতিতে একটি প্রশ্ন দেওয়া থাকে এবং এর নিচে চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে যাদের মধ্যে শুধু একটি সঠিক থাকে। শিক্ষার্থীকে এই বিকল্পগুলোর মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি চিহ্নিত করতে হয়।
যেমন : কোনটি এসিড ধর্মী অক্সাইড?

(ক) CO_2

(খ) Na_2O

(গ) CaO

(ঘ) Al_2O_3

এখানে সঠিক উত্তর (ক) ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের নীতিমালা : মানসম্পন্ন বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতকগুলো নিয়ম মেনে প্রশ্ন করতে হবে, যথা :

(ক) প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ বাক্য হিসেবে উপস্থাপন না করে সরাসরি প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করতে হবে। যেমন–

১) সালফিউরিক এসিডের রাসায়নিক সংকেত হচ্ছে

(ক) H_2CO_3

(খ) H_2SO_4

(গ) H_2SO_3

(ঘ) HCl

এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন, সঠিক প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ :-

১) সালফিউরিক এসিডের রাসায়নিক সংকেত কোনটি ?

(খ) প্রশ্নে ব্যাকরণগত ভুল বা অর্থ প্রকাশে যেন কোনো বিভ্রান্তি না থাকে, যেমন–

১) নিচের কোনটি ব্যতিক্রম ?

(ক) CO_3^{2-}

(খ) SO_4^{2-}

(গ) Na_2O

(ঘ) NH_4^+

এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ এখানে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যতিক্রম চিহ্নিত করার সুযোগ রয়েছে। এখানে (ক), (খ) ও (গ) তে অক্সিজেন আছে কিন্তু (ঘ) তে নেই, ফলে (ঘ)-কে ব্যতিক্রম হিসেবে ধরা যায়। আবার (ক), (খ) ও (ঘ) তে উল্লিখিত যৌগগুলোর তিনটিই হচ্ছে যৌগমূলক কিন্তু (গ)- একটি সাধারণ যৌগ, ফলে (গ) কেও ব্যতিক্রম বিবেচনা করা যায়। সঠিক প্রশ্নটি হবে নিম্নরূপ :-

১) নিচের সংকেতগুলোর কোনটি যৌগমূলকের রাসায়নিক সংকেত নয় ?

(গ) বিকল্প উত্তরগুলো সঠিক উত্তরের কাছাকাছি হবে। যেমন :-

১) নিচের কোনটি পানির সংকেত ?

(ক) H_2O

(খ) $AlCl_3$

(গ) Na_2O

(ঘ) H_2SO_4

এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ পানির সঠিক সংকেত থেকে (খ), (গ) ও (ঘ)-এ উল্লেখিত সংকেত অনেক বেশি ভিন্ন হওয়ায় সঠিক উত্তর অনুমানের উপরই বাছাই করা সম্ভব। এখানে (খ) ও (গ) তে হাইড্রোজেন নেই কাজেই এ দুটি পানির সংকেত হবে না। আবার (ঘ)-তে সালফার থাকায় সহজেই অনুমান করা যায় এটি সঠিক নয়। ফলে অনুমানের উপর সঠিক উত্তর বাছাই করা সম্ভব। প্রশ্ন উন্নতমানের হতে হলে উত্তরের বিকল্পগুলো হতে পারে নিম্নরূপ-

(ক) H_2O (গ) HO_2

(খ) H_2O_2 (ঘ) HO

এ ধরনের বিকল্প থাকলে কারো পক্ষে উত্তরটি না জেনে কেবল অনুমানের ওপর ভিত্তি করে উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

(ঘ) প্রশ্নে যেন একাধিক সঠিক উত্তর না থাকে। যেমন-

১) নিচের কোনটি পানির সাথে বিক্রিয়ায় এসিড তৈরি করে ?

(ক) CO_2

(খ) Al_2O_3

(গ) Na_2O

(ঘ) NO_2

এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন, কারণ এখানে দুটি সঠিক উত্তর রয়েছে যথা : (ক) ও (ঘ)। সঠিক প্রশ্নের জন্য (ক) বা (ঘ) যে কোনো একটি বাদ দিতে হবে।

(ঙ) বিকল্প উত্তরগুলো দৈর্ঘ্য যেন কাছাকাছি হয় ? যেমন–

১) নিচের কোনটি NH_3 যৌগের বৈশিষ্ট্য নয় ?

(ক) ঝাঁঝালো গন্ধ

(খ) পানিতে দ্রবণীয়

(গ) ক্ষার ধর্মী

(ঘ) বাতাসের আক্সিজেনের সাথে তীব্র বিক্রিয়া করে তাপ ও আলো উৎপন্ন করে

এটি ত্রুটিপূর্ণ প্রশ্ন , কারণ (ঘ) এর দৈর্ঘ্য অন্য বিকল্পগুলো থেকে অনেক বেশি । প্রশ্নটি সঠিক হতে হলে (ঘ) হবে নিম্নরূপ :

(ঘ) দাহ্য

(চ) সবগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর একই স্থানে না যেন (ক), (খ), (গ), ও (ঘ) তে সমান হারে বিন্যস্ত হয়।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নের শ্রেণিবিভাগ : বহুনির্বাচনি প্রশ্ন সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে, যথা : ১) সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ২) বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এবং ৩) অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১) সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : এখানে একটি প্রশ্ন থাকে এবং এর চারটি বিকল্প উত্তর দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে হয়। যেমন-

১) গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটল এর মতে সকল পদার্থ কোন কোন উপাদান দিয়ে তৈরি?

ক) মাটি, পানি, আগুন ও বাতাস
খ) অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, পানি ও মাটি
গ) মাটি, পানি, তাপ ও বরফ
ঘ) লোহা, তামা, সিসা ও সোনা

২) **বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন :** এরূপ বহুনির্বাচনি প্রশ্নে তিনটি বিকল্প বক্তব্যসহ একটি প্রশ্ন অথবা বাক্য দেওয়া থাকে যাদের মধ্যে দু'টি বক্তব্য সঠিক থাকে। অতপর উত্তরের জন্য চারটি বিকল্প দেওয়া হয় যেখান থেকে সঠিক উত্তরটি বাছাই করতে হয়। যেমন–

১) কাঠ পোড়ালে তাপ, আলো এবং ধোঁয়া উৎপন্ন হয়। এটি একটি–

i) স্থায়ী পরিবর্তন
ii) ভৌত পরিবর্তন
iii) রাসায়নিক পরিবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii
(খ) i, iii
(গ) ii, iii
(গ) i, ii ও iii

৩) অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন : অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নে প্রথমে একটি তথ্য দেওয়া থাকে যাকে উদ্দীপক বলা হয় এবং পরে দুই বা তিনটি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন দেওয়া হয়। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রদত্ত তথ্য থেকে দিতে হয়। উদ্দীপক হিসেবে কোনো বর্ণনা, চিত্র বা লেখচিত্র দেওয়া যেতে পারে। যেমন–

নিচের উদ্দীপকে দেওয়া তথ্য থেকে ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

একদল শিক্ষার্থী লোহায় মরিচা ধরার কারণ নিয়ে অনুসন্ধানমূলক কাজ করছিল। তারা চারটি টেস্টটিউবে চার রকম ব্যবস্থা নিল :

১ম টেস্টটিউব খোলা টেস্টটিউবে ভেজা লোহার তারকাটা রেখে দিল

২য় টেস্টটিউব শুষ্ক লোহার তারকাটা বায়ুশূন্য টেস্টটিউবে রেখে দিল

৩য় টেস্টটিউব ভেজা লোহার তারকাটা বায়ুশূন্য টেস্টটিউবে রেখে দিল

৪র্থ টেস্টটিউব ফুটানো পানিতে সম্পূর্ণভাবে ডুবানো লোহার তারকাটা খোলা টেস্টটিউবে রেখে দিল

১) কোন টেস্টটিউবে রাখা লোহার তারকাটায় আগে মরিচা ধরবে ?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়

(গ) তৃতীয় (গ) চতুর্থ

২) কোন টেস্টটিউবে রাখা লোহার তারকাটায় মরিচা ধরবে না ?

(ক) প্রথম (খ) দ্বিতীয়

(গ) তৃতীয় (গ) চতুর্থ

৪.৪ : তত্ত্বীয় রসায়ন শিখন মূল্যায়নে রচনামূলক প্রশ্ন

রচনামূলক প্রশ্ন : আমাদের দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে তত্ত্বীয় রসায়ন লিখিত পরীক্ষায় বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সাথে রচনামূলক প্রশ্নও ব্যবহৃত হয়। জ্ঞানমূলক ক্ষেত্রের শিখন উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্য রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তাছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে আবেগিক ক্ষেত্রের শিখন উদ্দেশ্য মূল্যায়নের জন্যও রচনামূলক প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রচনামূলক প্রশ্ন দুই রকম হয়ে থাকে - সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন ও বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন। রচনামূলক প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিত গুণাবলি মূল্যায়ন করা যায়, যথা :

(ক) দুটি বিষয়ের বা ধারণার বা তথ্যের বা তত্ত্বের মধ্যে তুলনা করার দক্ষতা
(খ) কোনো কিছুর বর্ণনায় নৈপূণ্য ও লিখে প্রকাশ করার দক্ষতা
(গ) কোনো কিছু ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করার দক্ষতা
(ঘ) কারণ ও ফলাফলের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের দক্ষতা
(ঙ) নিজের মতামত প্রকাশ ও যুক্তি উপস্থাপনের দক্ষতা
(চ) কোনো বিষয়বস্তুর শ্রেণিকরণ ইত্যাদি।

সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন : এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরের বিস্তৃতি কম হয়ে থাকে। রসায়নে সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্নের মধ্যে কোনো ধারণার ব্যাখ্যা, বিক্রিয়ার সমতাকরণ, কোনো রাসায়নিক পদার্থের ধর্ম বা কোনো কিছুর চিত্র অঙ্কন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। নিচে কতকগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হলো :

১. চিত্রের সাহায্যে অক্সিজেন পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস দেখাও।
২. এসিডের একটি সাধারণ ধর্ম উল্লেখ কর।
৩. প্রভাবক কী?
৪. অ্যামোনিয়া গ্যাস পানি অপসারণ পদ্ধতিতে সংগ্রহ করা যায় না কেন?

রচনামূলক প্রশ্নের বড় দুর্বলতা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতা, যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার অভাব। এই দুর্বলতা দূরীকরণের জন্য সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। এই সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্নের উত্তরের সীমা নির্দিষ্ট থাকে বলে নৈর্ব্যক্তিকতা বৃদ্ধি পায়। আবার এরূপ প্রশ্ন বেশি সংখ্যক করা যায়। ফলে পাঠ্যসূচির সকল অংশ থেকে প্রশ্ন করার মাধ্যমে যথার্থতা বৃদ্ধি করা যায়। সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন করার সময় যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- পাঠ্যসূচির সকল অংশ থেকে প্রশ্ন করা
- শিখনফল অনুসারে প্রশ্ন করা
- প্রশ্ন যেন সুস্পষ্ট হয় অর্থাৎ একাধিক অর্থ যেন প্রকাশ না করে
- প্রশ্নের উত্তরের সীমা কতটুকু তা যেন স্পষ্ট হয়

একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। ধরি একটি প্রশ্ন "পরমাণুর গঠন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।" এই প্রশ্নের পরমাণুর গঠন সর্ম্পকে কী কী বিষয় জানতে চাওয়া হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। প্রশ্নটি নিম্নলিখিতভাবে করলে যথাযথ হবে "পরমাণু কী কী মৌলিক কণিকা দিয়ে গঠিত? পরমাণুতে এদের অবস্থান কোথায় এবং এদের ভর ও আধান কিরূপ?" এখানে প্রশ্নে কী জানতে চাওয়া হয়েছে তা সুস্পষ্ট এবং এদের উত্তরের সীমাও সুনির্দিষ্ট হয়েছে।

বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্ন : এ সকল প্রশ্নের উত্তরের বিস্তৃতি বেশি। অর্থাৎ এ সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বিষযবস্তুর বর্ণনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে উত্তর দিতে একটু বিস্তারিত লেখার প্রয়োজন হয় । নিচে কতকগুলো বিস্তৃত উত্তরমূলক প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হলো।

(১) চিত্রসহ অক্সিজেন প্রস্তুত প্রণালি বর্ণনা কর।
(২) হেবার প্রণালীতে অ্যামোনিয়া প্রস্তুতি বর্ণনা কর।
(৩) উদাহরণসহ বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বন্ধনের বর্ণনা দাও।
(৪) বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক বিক্রিয়ার বর্ণনা দাও।

রচনামূলক অভীক্ষার কিছু দুর্বলতা রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা হচ্ছে নৈর্ব্যক্তিকতার অভাব। অর্থাৎ একই উত্তরপত্র মূল্যায়নে ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষক ভিন্ন ভিন্ন নম্বর প্রদান করেন। এই দুর্বলতা কাঠামোবদ্ধ রচনামূলক প্রশ্ন করে দূর করা যায়।

সৃজনশীল প্রশ্ন : সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক ও বিস্তৃত রচনামূলক প্রশ্নের সমন্বয়ে তৈরি করা হয় কাঠামোদ্ধ প্রশ্ন। বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক পর্যায়ে কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নপদ্ধতিকে সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি নামে প্রচলন করা হয়েছে । সৃজনশীল প্রশ্নে দুটি অংশ থাকে– প্রথম অংশ একটি উদ্দীপক এবং দ্বিতীয় অংশ চারটি প্রশ্ন।

(ক) প্রথম অংশ : এই অংশকে উদ্দীপক বলে, যাতে একটি পরিস্থিতির বর্ণনা থাকে যা শিক্ষার্থীর শিখন অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত এবং এই উদ্দীপক অনুসারে তাকে ৩য় ও ৪র্থ প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে হয়।

(খ) দ্বিতীয় অংশ : এই চারটি প্রশ্ন থাকে।

- ১ম প্রশ্নটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন যার উত্তর স্মৃতি থেকে উদ্দীপকের সাহায্য ছাড়াই দেওয়া যায় এবং এর জন্য নম্বর ১
- ২য় প্রশ্নটি অনুধাবনমূলক; যার উত্তরও স্মৃতি থেকে দেওয়া যায় এবং এর জন্য নম্বর ২
- ৩য় প্রশ্নটি প্রয়োগমূলক। এর উত্তর উদ্দীপকের সাহায্যে দিতে হবে এবং এর জন্য নম্বর ৩
- ৪র্থ প্রশ্নটি উচ্চতর চিন্তন দক্ষতার সাথে সম্পর্কযুক্ত যার উত্তর দিতে উদ্দীপকের সাহায্য লাগে এবং এর জন্য নম্বর ৪।

নিম্নে রসায়ন বিষয়ের জন্য একটি সৃজনশীল প্রশ্নের উদাহরণ দেওয়া হলো–

উদ্দীপক : দুটি ৫০০ mL পাত্রের একটিতে ৩৬.৫ গ্রাম HCl এসিড এবং অন্যটিতে ৫৩ গ্রাম NaOH-এর দ্রবণ আছে। দ্রবণ দুটিকে অন্য একটি বড় পাত্রে ভালোভাবে মিশানো হলো।

১. মোল বলতে কী বোঝায়? ১
২. এক মোল $NaNO_3$-এর ভর কত গ্রাম? ২
৩. উদ্দীপকের দ্রবণদ্বয়কে মেশানোর ফলে কী উৎপন্ন হবে? প্রয়োজনীয় সমীকরণসহ বর্ণনা দাও। ৩
৪. উক্ত মিশ্রণটি কিরূপ হবে- অম্লীয় না ক্ষারীয়? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

রচনামূলক প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ রাখতে হবে, প্রশ্ন যেন শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন অনুসারে হয়। শিখন উদ্দেশ্যের ডোমেইন অনুসারে জ্ঞান, অনুধাবন, প্রয়োগ ও উচ্চতর চিন্তন দক্ষতা এই চার ধরনের প্রশ্ন যেন করা হয়।

৪.৫ : ব্যবহারিক রসায়নের শিখন মূল্যায়ন

মাধ্যমিক স্তরে তত্ত্বীয় রসায়ন মূল্যায়নের সাথে সাথে ব্যবহারিক রসায়ন শিখন মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক রসায়ন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে কোনো পরীক্ষণ কাজ করতে দেওয়া হয়। ব্যবহারিক রসায়ন মূল্যায়ন মনোপেশীজ ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এখানে চিন্তন ও পেশী সঞ্চালন উভয় প্রকার যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়ে থাকে। কারণ ব্যবহারিক রসায়নের পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করতে হলে শুধু তত্ত্বীয় জ্ঞান থাকলেই চলবে না। বরং তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে সাথে পরীক্ষাগারে পরীক্ষণ কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাও থাকতে হবে। ব্যবহারিক রসায়ন শিখন মূল্যায়ন দুটি অংশে বিভক্ত যথা : (ক) শিক্ষার্থীর ব্যবহারিক নোটবুক বা খাতা এবং (খ) পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক পরীক্ষা।

(ক) শিক্ষার্থী যে সকল ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করে তা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারিক খাতা প্রস্তুত করা হয়। শিক্ষার্থীর বিশেষ কতগুলো বৈশিষ্ট্য মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারিক খাতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী নিয়মিত ব্যবহরিক কাজে অংশগ্রহণ করবে এবং পরীক্ষা পদ্ধতি ও ফলাফল ব্যবহারিক খাতায় লিপিবদ্ধ করে রাখবে। ব্যবহারিক খাতা থেকে যে সকল বিষয়গুলো পরিমাপ করা যাবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

(১) শিক্ষার্থীর নিয়মানুবর্তিতা

(২) শিক্ষাবর্ষে পরীক্ষণ কাজের পরিমাণ

(৩) পরীক্ষণ কাজের বিবরণ লিপিবদ্ধ করার দক্ষতা

(৪) পরীক্ষণ কাজের উপাত্ত সংগ্রহ করার ক্ষমতা

(৫) পরীক্ষণ কাজের ফলাফল প্রকাশের ক্ষমতা

(৬) চিত্র, গ্রাফ ও তালিকা প্রস্তুতির দক্ষতা ।

(খ) শিক্ষার্থী পুরো শিক্ষাবর্ষে ব্যবহারিক ক্লাসে বিভিন্ন পরীক্ষণ কাজে অংশগ্রহণ করে যে যোগ্যতা অর্জন করেছে তা মূল্যায়নের জন্য ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। পরীক্ষাগারে ব্যবহারিক পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিমাপ করা হয় :

(১) পরীক্ষণ কাজের মূলনীতির বর্ণনা

(২) পরীক্ষণ কাজের জন্য প্রয়োজনীয় রাসানিক পদার্থ চিনতে পারা

(৩) পরীক্ষণ কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি চিনতে পারা

(৪) পরীক্ষণ কাজে যন্ত্রপাতি ব্যবহারের দক্ষতা

(৫) ধারাবাহিকভাবে পরীক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা

(৬) পরীক্ষণ কাজ থেকে উপাত্ত যথাযথভাবে সংগ্রহ করা

(৭) সংগৃহীত উপাত্ত ব্যবহার করে পরীক্ষালব্ধ ফল হিসাব করা

ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন সহজ ও সঠিকভাবে করার জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে নির্দেশনা দেওয়া থাকে। যেমন ২০১৫ সালে প্রণীত নির্দেশনা অনুযায়ী এসএসসি পরীক্ষায় রসায়ন ব্যবহারিক পরীক্ষার জন্য নিম্নোক্তভাবে নম্বর বণ্টিত হবে। এ নির্দেশনা অনুসরণ করে রসায়ন ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

- **ব্যবহারিক অংশ (একটি পরীক্ষা):**
  - ✓ **পরীক্ষণ :**যন্ত্র/উপকরণ সংযোজন ও ব্যবহার/সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ/উপাত্ত সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ/পর্যবেক্ষণ/ অঙ্কন/শনাক্তকরণ/অনুশীলন: ১৫ নম্বর
  - ✓ ব্যাখ্যাসহ ফলাফল উপস্থাপন: ৫ নম্বর
  - ✓ মৌখিক অভীক্ষা : ৫ নম্বর

আবেগিক ক্ষেত্রের মূল্যায়ন

শিখন উদ্দেশ্যের তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে আবেগিক ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও মাধ্যমিক পর্যায়ে এর মূল্যায়ন করা হয় না বললেই চলে। তাছাড়া এই ক্ষেত্রের শিখন উদ্দেশ্য মূল্যায়ন করাও কঠিন। মাধ্যমিক পর্যায়ে রসায়ন বিষয়ে যে সকল শিখন ফল নির্ধারণ করা হয়েছে তার সবগুলোই আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত। আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি তিনভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে যথাঃ (ক) পর্যবেক্ষণ (খ) সাক্ষাৎকার এবং (গ) প্রশ্নত্তোরিকা।

(ক) পর্যবেক্ষণ : শিক্ষার্থীকে পর্যবেক্ষণ করে তার গুণাবলি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যায়। সাধারণত শ্রেণি কার্যক্রম, পরীক্ষাগারে, বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান ক্লাব, প্রজেক্ট কার্যক্রম ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও দৃষ্টিভঙ্গি মূল্যায়ন করা যায়। পর্যবেক্ষণ থেকে বিভিন্ন তথ্য পেতে হলে নিম্নলিখিত রেটিং স্কেল ব্যবহার করা যেতে পারে :

সারণি ৪.১: ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়ন রেটিং স্কেল

ক্রমিক নম্বর	শিক্ষার্থীর আচরণ	খুব ভালো	ভালো	সাধারণ	উন্নয়ন প্রয়াজন	মন্তব্য
১	শিক্ষার্থীরা পরীক্ষাগারে বিজ্ঞান মেলা, বিজ্ঞান ক্লাবে কাজের অংশগ্রহণ					
২	শিক্ষার্থী সহপাঠীদের সাথে আলোচনা, বিতর্ক প্রতিযোগিতায়, প্যানেল আলোচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রসায়ন বিষয় নিয়ে মতামত					
৩	বিজ্ঞান মেলায়, বিজ্ঞান ক্লাবে সৃজনশীলতা প্রদর্শন বা দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের প্রয়োগ					
৪	প্রাকৃতিক বা দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ঘটনা রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা					

(খ) সাক্ষাৎকার : সাক্ষাৎকারের সাহায্যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনোভাব ও আগ্রহ মূল্যায়ন করতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজ সম্পর্ক থাকতে হবে, কারণ আমাদের দেশে সাধারণত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সাথে খোলামেলা আলোচনা করে অভ্যস্ত নয়। এ পদ্ধতিতে রসায়নের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো বিষয় নির্বচন করতে হবে যা নিয়ে আলোচনা করলে রসায়নের প্রতি আগ্রহ ও মনোভাব প্রকাশ পায়। যেমন আলোচনার জন্য একটি বিষয় হতে পারে- 'শিল্পে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার পরিবেশের ওপর শুধুই বিরূপ প্রভাব পড়ে'।

(গ) প্রশ্নত্তোরিকা: শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মনোভাব মূল্যায়নের জন্য প্রশ্নত্তোরিকা ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশ্নত্তোরিকায় কতকগুলো প্রশ্ন থাকবে এবং এগুলোর উত্তর "একমত", "একমত নই" অথবা "নিশ্চিত নই" এই তিনটির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো পড়ে নিজের পছন্দের উত্তর চিহ্নিত করবে। নিচে একটি উদাহরণ দেওয়া হলো :

সারণি ৪.২: ব্যবহারিক কাজ মূল্যায়ন রেটিং স্কেল

ক্রমিক নম্বর	প্রশ্ন	একমত	নিশ্চিত নই	একমত নই
১	প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক ভাবে তৈরি ভিটামিন অভিন্ন			
২	দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রসায়ন শিল্পের বিকাশ জরুরি			
৩	পরিবেশ রক্ষায় রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন			
৪	কৃষি উন্নয়নে রাসায়নিক সার ব্যবহার অপরিহার্য নয়			
৫	আমাদের জীবনে রসায়নের অবদান অপরিহার্য			
৭	পরিষ্কারক সামগ্রী উৎপাদনে রাসায়নের বিকল্প নেই			
৮	স্বাস্থ্য রক্ষায় রসায়নিক ঔষধ ব্যবহার না করাই ভালো			
৯	খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণে রসায়নের জ্ঞান প্রয়োজন			
১০	উন্নত জীবন ধারণের জন্য রসায়নের অবদান নেই			

উপরের প্রশ্নোত্তোরিকার ন্যায় কোনো প্রশ্নোত্তরিকা ব্যবহার করে রসায়নের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব নির্ণয় করা যেতে পারে। রসায়নের প্রতি শিক্ষার্থীর মনোভাব নির্ণয়ের জন্য প্রথমে প্রশ্নোত্তরিকার উত্তরগুলো বিশ্লেষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মনোভাব সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিবেন। যদি শিক্ষার্থীর মনোভাবের মধ্যে কোনো উন্নয়নের প্রয়োজন হয় তবে সে অনুসারে শিক্ষক ব্যবস্থা নিবেন।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। একক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

২। একক পরিকল্পনায় কী থাকে?

৩। পাঠ পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

৪। PCK কী ব্যাখ্যা করুন।

৫। প্রতিফলনমূলক/অনুধ্যানমূলক অনুশীলন বলতে কী বোঝায়?

৬। রসায়ন শিখন-শেখানোর কোন কোন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে শিক্ষার্থীদের আবেগিক শিখন মূল্যায়ন করা যায়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। একক পরিকল্পনা প্রণয়ণের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।

২। পাঠ পরিকল্পনার উপাদান বা অংশসমূহের বিস্তারিত ব্যাখ্যা করুন।

৩। গঠনবাদের ভিত্তিতে পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নে বিবেচ্যসমূহ আলোচনা করুন।

৪। ১ ঘণ্টা শ্রেণিতে অর্জন উপযোগী রসায়নের একটি/দু'টি শিখনফল নির্বাচন করে একটি পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করুন।

৫। বিজ্ঞান শিক্ষকের PCK কী? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। একজন বিজ্ঞান শিক্ষকের PCK কী উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত।

৬। লেসন স্টাডি বা পাঠ সমীক্ষা বাস্তবায়নের ধাপসমূহ বর্ণনা করুন।

৭। এসিড -ক্ষার প্রশমনের ওপর একটি উদ্দীপকসহ সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করুন।

৮। রসায়নিক বন্ধনের ওপর একটি উদ্দীপকসহ সৃজনশীল প্রশ্ন তৈরি করুন।

৯। পদার্থের গঠনের ওপর অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্ন প্রণয়ন করুন।

১০। রসায়ন শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও আবেগিক শিখন মূল্যায়ন কৌশল সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

ইউনিট ৫ : পরমাণুর গঠন, পর্যায় সারণি ও রাসায়নিক বন্ধন

মৌলিক পদার্থের গঠন একক পরমাণু যেখানে ঐ মৌলের স্বাতন্ত্র্য বিদ্যমান থাকে। মৌলিক পদার্থসমূহ প্রত্যেকে স্বাতন্ত্র্য; অর্থাৎ প্রতিটি মৌলের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। তবে মৌলসমূহের মধ্যে আবার মিলও রয়েছে। পর্যায় সারণি মৌলসমূহকে বিন্যস্ত করার একটি উপায়। এক বা একাধিক মৌলের পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হয়ে মৌলের ও যৌগের অণু গঠন করে। অণুসমূহ মিলেই পদার্থ গঠিত। আমাদের এ ইউনিটের আলোচ্য পরমাণুর গঠন, মৌলসমূহের বিন্যাস তথা পর্যায় সারণি এবং পরমাণুসমূহ কীভাবে অণু গঠন করে। ইউনিটের আলোচ্য বিষয়কে নিম্নোক্তভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

৫.১ পরমাণুর ধারণার বিকাশ
৫.২ রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেল
৫.৩ পরমাণুর বিভিন্ন শক্তিস্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস
৫.৪ পর্যায় সারণি- আধুনিক পর্যায় সারণির ভিত্তি, আধুনিক পর্যায় সারণির ভিত্তি, ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়।
৫.৫ মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম, পর্যায় সারণির গুরুত্ব
৫.৬ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও এদের স্থিতিশীলতা
৫.৭ রাসায়নিক বন্ধন
৫.৮ সমযোজী বন্ধন ও ধাতব বন্ধন

৫.১ : পরমাণুর ধারণার বিকাশ

খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীক দার্শনিক লুসিপাস (Leucippus) তাঁর ছাত্র ডেমোক্রিটাস ধারণা প্রকাশ করেন যে, প্রত্যেক বস্তু অতি ক্ষুদ্র , অবিভাজ্য সূক্ষ্ম কণিকার সমন্বয়ে গঠিত। ডেমোক্রিটাস এই সূক্ষ্ম কণাকে এটম (Atom) নামকরণ করেন। Atom শব্দটি দুটি গ্রীক শব্দ a (not) এবং temnein (to cut) হতে এসেছে। সুতরাং এটম (Atom) শব্দটির অর্থ হচ্ছে যা আর ভাগ করা যায় না। একই সমসময়িক সময়ে ভারতীয় প্রাচীন দার্শনিক আচার্য কণাদ (Acharja Kanad) বস্তু সম্পর্কে একই ধারণা উপস্থাপন করেন। দার্শনিক কণাদ এর নাম দেন পরমাণু। প্রায় একশত বছর পর বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক এ্যারিস্টটল (Aristotle) প্রস্তাব করেন পরমাণু অবিভাজ্য কণার সমষ্টি নয়। তাঁর এই প্রস্তাব পরবর্তী দুইশত (২০০) বছরব্যাপী প্রচলিত ছিল। ব্রিটিশ স্কুল শিক্ষক ও বিজ্ঞানী জন ডাল্টন (John Dalton) ১৮০৩ সালে ডেমোক্রিটাস ও কণাদের মতবাদকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ডাল্টনের মতবাদ অনুসারে পরমাণু অবিভাজ্য একে সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। পরবর্তীতে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড (Rutherford) ১৯১১ সালে তাঁর বিখ্যাত আলফা কণা বিচ্ছুরণ পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত রূপে প্রমাণ করেন যে, পরমাণু অবিভাজ্য নয়, পরমাণু বিভাজ্য। পরমাণুকে ভাঙলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, মেসন, ডিউটেরন ইত্যাদি কণিকা পাওয়া যায়।

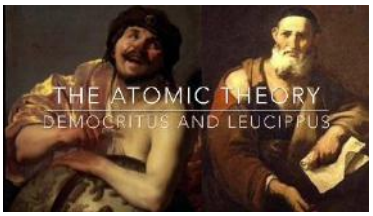

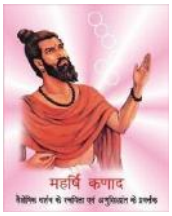

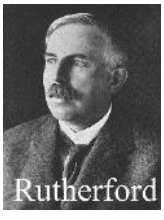

মৌলিক ও স্থায়ী কণিকা :

মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম কণা যার স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, কিন্তু ক্ষুদ্রতম একক হিসেবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তাকে পরমাণু বলা হয়। পরমাণুকে ঐ মৌলিক পদার্থের প্রতীক দ্বারা প্রকাশ করা যায়। যেমন O দ্বারা অক্সিজেনের পরমাণুকে বুঝায়। একইভাবে H দ্বারা হাইড্রোজেনের এবং C1 দ্বারা ক্লোরিনের পরমাণুকে বুঝায়। পরমাণু এত ক্ষুদ্র যে একে অধিক শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রোস্ক্রোপের সাহায্যেও দেখা যায় না। তবে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের লেন্সের ক্ষমতা স্বাভাবিক

মানের চেয়ে প্রায় বিশ লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দিলে পরমাণুকে দেখা সম্ভব। একটি হাইড্রোজেনের পরমাণুর ব্যাস মাত্র 0.1 nm (1 nm = 10^{-9} m)। হাইড্রোজেনের ১০০০ কোটি পরমাণুকে পাশাপাশি রাখলে দূরত্ব হয় মাত্র ১ মিটার। এই পরমাণু যে সব অতি সূক্ষ্ম কণিকা দ্বারা গঠিত তাদের সামগ্রিকভাবে মূল কণিকা (Fundamental Particles) বলা হয়। এই মূল কণিকা অবিভাজ্য, মূল কণিকাগুলোর মধ্যে কতগুলো স্থায়ী, (Stable) কতকগুলো অস্থায়ী (Unstable)।

স্থায়ী মূল কণিকা (Stable fundamantal Particles) : স্থায়ী কণিকা পরমাণুর গঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকা তিনটি :

- ইলেকট্রন (Electron)
- প্রোটন (Proton)
- নিউট্রন। (Neutron)

অস্থায়ী মূল কণিকা (Unstable fundamental particles) : পরমাণুর অস্থায়ী মূল কণিকা প্রধানত পাঁচটি; যথা :

- পজিট্রন (Positron)
- নিউট্রিনো (Neutrino)
- অ্যান্টি নিউট্রিনো (Anti-neutrino)
- মেসন (Meson)
- গ্রাভিটন (Graviton)

স্থায়ী মূল কণিকা (Stable Fundamental Particles)

মৌলের পরমাণুতে স্থায়ী মূল কণিকা মুখ্য ভূমিকা পালন করে। স্থায়ী মূল কণিকাগুলোর ভর, চার্জ ও আবিষ্কার সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

ইলেকট্রন (Electron)

১৮৯৭ সালে স্যার জে জে থমসন (Sir J.J Thomson) ক্যাথোড রশ্মির ওপর বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে ইলেকট্রনের অস্তিত্ব আবিষ্কার করেন। ১৮৯১ সালে বিজ্ঞানী স্টোনি এ কণিকার নামকরণ করেন ইলেকট্রন। তেজষ্ক্রিয় মৌল থেকে নিঃসৃত β রশ্মি দ্রুতগামী ইলেকট্রন কণিকার প্রবাহ। পরমাণুর স্থায়ী মূল কণিকাসমূহের মধ্যে ইলেকট্রন সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম। ইলেকট্রন একক ঋনাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা যার ভর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের ১/১৮৩৭ ভাগ মাত্র। একটি ইলেকট্রনের ভর প্রায় ৯.১০৮৫×১০$^{-২৮}$ গ্রাম যা অতি নগণ্য বলে সচরাচর অগ্রাহ্য করা হয়। ঋণাত্মক বিদ্যুতধর্মী কণা ইলেকট্রনের চার্জ -1.6 × 10^{-19} Coulomb। পরমাণুর নিউক্লিয়াসের চারিদিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ইলেকট্রনগুলো অবিরত আবর্তনরত। মৌলসমূহের এবং তার যৌগগুলোর ধর্মাবলি প্রধানত কক্ষপথে ইলেকট্রনের বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে। ইলেকট্রন সব পদার্থের পরমাণুর একটি সাধারণ উপাদান।

প্রোটন (Proton)

১৮৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ইউজিন গোল্ডস্টাইন (Eugen Goldstein) ক্যাথোড রশ্মি নলে ঋণাত্মক আয়ন আবিষ্কার করেন। ধনাত্মক আয়নের প্রবাহকে ক্যানাল রশ্মি (Canal Ray) বা ধনাত্মক রশ্মি বলা হয়। ১৯০৭ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী জে জে থমসন এর নাম দেন পজেটিভ রশ্মি। ১৯১৯ খ্রী : বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড (Rutherford) প্রোটনকে পরমাণুর স্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা হালকা ধণাত্মক চার্জযুক্ত কণিকা বলে প্রমাণ করেন। একটি প্রোটনের চার্জের পরিমাণ +1.6 × 10^{-19} Coulomb এবং ভর প্রায় হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের সমান। অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণু হতে ইলেকট্রনটি সরিয়ে নিলে প্রোটনের ভর পাওয়া যাবে। প্রোটনের প্রকৃত ভর 0.1672 × 10^{-23} গ্রাম। প্রোটন পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থান করে। একে সাধারণত p দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

নিউট্রন (Neutron)

১৯২০ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড (Rutherford) প্রোটনের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় নিউট্রন সম্পর্কে ভবিষদ্বাণী করার পর ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী চ্যাডউইক (Chaduick) নিউট্রন আবিষ্কার করেন। তিনি পরমাণুর নিউক্লিয়াসে চার্জহীন কণিকারূপে নিউট্রনকে আবিষ্কার করেন এবং সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে সাধারণ হাইড্রোজেন ব্যতীত যে কোনো পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন বিদ্যমান রয়েছে। নিউট্রনের ভর প্রায় ১.০০৮৭ অর্থাৎ একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের প্রায় সমান এবং প্রোটনের ভর অপেক্ষা সামান্য বেশি। নিউট্রনের সাধারণ প্রতীক হলো n।

এক মোল নিউট্রনের ভর = 6.023×10^{23} টি নিউট্রনের ভর
$= 6.023 \times 10^{-23} \times 1.675 \times 10^{-24}$ g
$= 1.008$ g

পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic Number)
কোনো মৌলের একটি পরমাণুতে যতটি প্রোটন থাকে, তাকে ঐ মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা বা পরমাণু ক্রমাঙ্ক বলে। ১৯১৩ খ্রিষ্টাব্দে বিজ্ঞানী মোসলে সর্বপ্রথম পারমাণবিক সংখ্যা নির্ণয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। প্রোটন সংখ্যাকে সাধারণত Z দ্বারা প্রকাশ করা হয়। যেমন সোডিয়াম (Na) পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা ১১। অর্থ্যাৎ সোডিয়াম পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ১১টি প্রোটন রয়েছে।

ভর সংখ্যা (mass Number)
পরমাণুর নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যাকে ভর সংখ্যা বা নিউক্লিয়ন সংখ্যা বলা হয়। ভর সংখ্যাকে সাধারণভাবে পারমাণবিক ভর বলা হয়। নিউক্লিয়ন সংখ্যাকে A দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সুতরাং $A = n + Z$ এখানে n নিউট্রন সংখ্যা।

পারমাণবিক ভর (Atomic Mass)
কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর বলতে ঐ মৌলের পরমাণুর সাথে হাইড্রোজেন পরমাণুর ভরের অনুপাতকে বুঝায়। হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর অতি সামান্য বলে এর ভরকে একক হিসেবে গণ্য করা হয়। যেহেতু দুটো মৌলের তুলনামূলক ভর থেকে পারমাণবিক ভর হিসাব করা হয় সেহেতু একে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর বলা হয়।

$$\text{আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{মৌলটির একটি পরমাণুর ভর}}{\text{হাইড্রোজেনের একটি পরমাণুর ভর}}$$

পারমাণবিক ভরের আধুনিক ধারণা (কার্বন স্কেলে) :

১৯৬১ সালে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে কার্বনের প্রধান আইসোটোপ কার্বন ১২ এর পরমাণুকে ভিত্তি করে এর ১/১২ অংশকে একক ধরে অন্যান্য মৌলের পারমাণবিক ভর সংশোধন করা হয়। পারমাণবিক ভরের একক হিসেবে কার্বন ১২ এর ১/১২ অংশকে অ্যাটমিক ইউনিট (atomic mass unit) বা সংক্ষেপে a.m.u বলে।

এভাবে এক a.m.u = ১.৬৬০৫ $\times$ ১০$^{-২৪}$ g

$$\text{এই হিসাবে আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{মৌলটির একটি পরমাণুর ভর}}{{}^{১২}\text{C এর একটি পরমাণুর ভর} \times \frac{১}{১২}}$$
$$= \frac{\text{মৌলটির একটি পরমাণুর ভর} \times ১২}{{}^{১২}\text{C-এর একটি পরমাণুর ভর}}$$

সুতরাং কোনো মৌলের পারমাণবিক ভর বলতে ১টি কার্বন পরমাণুর ভরের ১/১২ অংশের তুলনায় কতগুণ ভারি তা বুঝায়। যেমন–অক্সিজেনের পারমাণবিক ভর ১৫.৯৯৯৪ এর অর্থ হলো, অক্সিজেনের একটি পরমাণুর ভর = কার্বনের একটি পরমাণুর ১/১২ অংশের চেয়ে ১৫.৯৯৯৪ গুণ ভারি।

আইসোটোপ (Isotope)

যে সব পরমাণুর প্রোটন সংখ্যা সমান কিন্তু ভর সংখ্যা ভিন্ন সেসব পরমাণুকে পরস্পরের আইসোটোপ বলা হয়। সুতরাং আইসোটোপ হচ্ছে একই মৌলের ভিন্ন ভিন্ন ভরের পরমাণু। গ্রীক Iso অর্থ অভিন্ন এবং tope অর্থ স্থান। পর্যায় তালিকায় একই স্থানে-আইপোটোপ পরমাণুসমূহকে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে এদের ঐরূপ নামকরণ করা হয়েছে। এদের রাসায়নিক ধর্ম অভিন্ন কিন্তু ভরভিত্তিক ভৌতধর্ম ভিন্ন হয়। যেমন–অক্সিজেনের তিনটি আইসোটোপ ${}^{16}_{8}\text{O}$, ${}^{17}_{8}\text{O}$, ${}^{18}_{8}\text{O}$।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার (Uses of Radioactive Isotope)

বর্তমানে তেজস্ক্রিস্ক্রয় আইসোটোপের ব্যবহার বিজ্ঞানের সকল শাখাতে হচ্ছে। নিচে সংক্ষেপে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার বর্ণনা করা হলো–

চিকিৎসা ক্ষেত্রে : চিকিৎসা ক্ষেত্রে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের দুই ভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন–

(i) কোনো রোগ বা রোগাক্রান্ত স্থান নির্ণয় : তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (^{32}P) ফসফেট হিসেবে শ্বেত কণিকাধিক ঘটিত রক্তাল্পতা (Blood Leukemia) এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অস্থি ভগ্ন (Bone fracture) চিকিৎসায় ও এর ব্যবহার যথেষ্ট সুফলদায়ক। তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম (^{24}Na) সাধারণ লবণ হিসেবে আহত রোগীর চিকিৎসায় রক্তে প্রয়োগ করে- আহত স্থানে রক্ত পৌঁছায় কিনা দেখা হয়।

(ii) রোগ নিরাময় : কোবাল্ট (Co-60) আইসোটোপ হতে নির্গত তীব্র গামা রশ্মি নিক্ষেপ করে ক্যান্সার টিউমার ধ্বংস করা হয়। থাইরয়েড গ্রন্থির রোগে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন (^{131}I) ব্যবহৃত হয়। এটি থাইরয়েড গ্রন্থির অবাঞ্ছিত কণার বৃদ্ধি প্রতিহত করে।

খাদ্য সংরক্ষণে : আলু, পিঁয়াজ এবং বিভিন্ন ফল সংরক্ষণের জন্য তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ হতে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

কৃষি ক্ষেত্রে : ফসফেট সারে তেজস্ক্রিয় ফসফরাস (^{32}P) প্রয়োগ করে এটি মাটি বা যুক্ত সার হতে কী পরিমাণ ফসফেট গ্রহণ করে তা নির্ণয় করা যায়। এ ছাড়া এ থেকে একটি গাছের আয়ুষ্কাল, গাছে কি পরিমাণ পুষ্টি সরবরাহ করা প্রয়োজন তা বুঝা যায়। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে উন্নতমানের নতুন বীজ উদ্ভাবন করা হচ্ছে।

সালোক সংশ্লেষণের ক্রিয়াকৌশল নির্ধারণে : তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে সালোকসংশ্লেষণের জটিল ক্রিয়াকৌশল জানা যায়।

কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে : কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়।

বয়স নির্ধারণে : বিভিন্ন বস্তু যেমন- মমী, উল্কাপিণ্ড, পৃথিবীর বয়স, গাছের বয়স ইত্যাদি নির্ধারণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ($^{14}C_6$) ব্যবহৃত হচ্ছে।

শিল্প ক্ষেত্রে : তেল বা পানিবাহী পাইপের ছিদ্র অনুসরণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহৃত হয়। শিল্পভিত্তিক গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক বিক্রিয়া যেমন পলিমারকরণ, প্রভাবকীয় ভাঙন ও প্রভাবকীয় সংশ্লেষণ ইত্যাদির কলাকৌশল (Mechanism) অধ্যয়নে তেজস্ক্রিয় কার্বন (C-14) ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন পিচ্ছিল কারক পদার্থের (Lubricant) কার্যকারিতা নিরীক্ষণেও তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের ব্যবহার রয়েছে।

৫.২ : রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল ও বোরের পরমাণু মডেল

বিজ্ঞানী জে. জে. থমসনের (J. J. Thomson) পরমাণু মডেল থেকে জানা যায়, পরমাণু ইলেকট্রন ও প্রোটনের সমন্বয়ে গঠিত। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড ১৯১১ খ্রিঃ আলফা কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষা দ্বারা থমসনের পরমাণু মডেলের প্রমাণ করেন। বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড তাঁর আলফা-কণা বিক্ষেপণ পরীক্ষালব্ধ তথ্যকে একটি ক্ষুদ্র সৌরজগতের সাথে তুলনা করে পরমাণুর অভ্যন্তরীণ গঠনকে বর্ণনা করেন যা রাদারফোর্ডের পরমাণুবাদ নামে পরিচিত। একে Solar System Atom Model ও বলা হয়। এ মতবাদ অনুসারে প্রত্যেক পরমাণুর দু'টি অংশ আছে যেমন-

ক) নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র এবং
খ) নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চল।

ক) নিউক্লিয়াস :

- পরমাণুর কেন্দ্রস্থলে ধনাত্মক আধানযুক্ত নিউক্লিয়াস রয়েছে। নিউক্লিয়াসের ভরই হলো পরমাণুর ভর। নিউক্লিয়াসের আয়তন পরমাণুর মোট আয়তনের তুলনায় নগণ্য। নিউক্লিয়াস পরমাণুর শক্তির আধার। নিউক্লিয়াস গোলাকার ও এর ব্যাসার্ধ 10^{-15} m। আর পরমাণুর ব্যাস প্রায় 10^{-10} m ।

- নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক চার্জ মূলত প্রোটনের জন্য। ১৯১৩ সালে বিজ্ঞানী মোসলে মৌলের রঞ্জন রশ্মির (X-ray) বর্ণালি থেকে ধারণা দেন যে, নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন সংখ্যাই মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা।

খ) **নিউক্লিয়াস বহির্ভূত অঞ্চল**

- পরমাণুতে নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধান প্রোটনের সমসংখ্যক ঋণাত্মক আধানযুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে; যার জন্য পরমাণুসমূহ বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ।
- সৌরজগতের গ্রহসমূহ যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে অবিরাম ঘুরছে তেমনি পরমাণুতে ইলেকট্রনসমূহ ও নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ইলেকট্রনসমূহের কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি (Centripetal Force) ও কেন্দ্রাতিগ শক্তি (Centifugal Force) পরস্পর সমান ও বিপরীতমুখী।

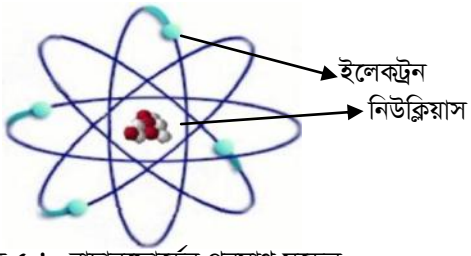

চিত্র ৫.১: রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেল

রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা : রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ :

১। রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের ভিত্তি নিউট্রনের মাধ্যাকর্ষণ ও গতি সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই মহাকর্ষণ ঘূর্ণন গতিতত্ত্ব কেবলমাত্র বিদ্যুৎ নিরপেক্ষ বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু পরমাণু তড়িৎ আধানযুত কারণ ইলেকট্রন ঋণাত্মক (−) ও নিউক্লিয়াস ধণাত্মক (+) আধান ধর্মী। গ্রহসমূহ একে অপরকে আকর্ষণ করে অথচ ইলেকট্রনসমূহ পরস্পরকে বিকর্ষণ করে।

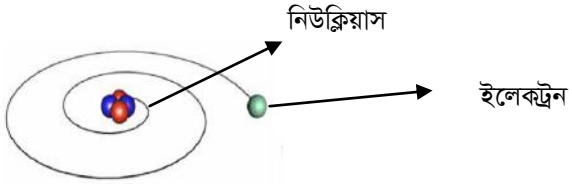

২। সুর্য ও গ্রহসমূহের মধ্যে আকর্ষণী বল মহাকর্ষ বল। কিন্তু নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যকার কেন্দ্রাভিমুখী (centripetal) বল হলো স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণী বল। এই দুই বলের প্রকৃতি ভিন্ন বলে তুলনা চলে না।

৩। ম্যাক্সওয়েলের (Maxwell) তড়িৎ চুম্বকীয় মতানুসারে, আবর্তনশীল তড়িৎ চার্জযুক্ত ইলেকট্রনের পক্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে শক্তি বিকিরণ করাই স্বাভাবিক। কাজেই ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ ক্রমশ সর্পিল আকারে হ্রাস পেতে থাকবে এবং পরিশেষে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের মধ্যে পতিত হবে। ফলে রাদারফোর্ডের পরমাণু মডেলের কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

৪। প্রত্যেক পরমাণুর নিজস্ব বর্ণালি রয়েছে। বর্ণালিতে একাধিক সূক্ষ্ম রেখা থাকে। ইলেকট্রনের শক্তি বিকিরণ অবিচ্ছিন্নভাবে ঘটলে পরমাণুর বর্ণালির রেখাসমূহ অবিচ্ছিন্ন হবে এবং প্রশস্ত ব্যাণ্ডের ন্যায় দেখা যাবে। কিন্তু বাস্তবে এই রেখাগুলোকে বিচ্ছিন্ন ও বেশ উজ্জ্বল দেখায়।

৫। ইলেকট্রনের কক্ষপথের আকার ও আয়তন সম্পর্কে এই মডেলে কিছু বলা হয় নি।

৬। বহু ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুর ইলেকট্রন কীরূপে নিউক্লিয়াসকে প্রদক্ষিণ করবে তা এই মডেলে উল্লেখ নেই।

৭। এ মডেলে কক্ষপথে আর্বতনরত ইলেকট্রনসমূহের গতিবেগ এবং শক্তি সম্পর্কে কোনো ধারণা ব্যাখ্যা করা হয় নি।

৮। এ মডেল থেকে পরমাণুর বিভিন্ন ইলেকট্রনের কক্ষপথের ব্যাসার্ধ সম্পর্কে কোনো ধারণা পাওয়া যায় না।

বোর পরমাণু মডেল (Bohr's Atom Model)

রাদারফোর্ডের পরমাণু ত্রুটিসমূহ সংশোধন করে এবং ম্যাক্সওয়েলের মতবাদ যুক্ত করে ১৯১৩ সালে ডেনমার্কের পদার্থবিজ্ঞানী নীলস বোর পরমাণুর রেখা বর্ণালী ব্যাখ্যা করে একটি পরমাণু মডেল উপস্থাপন করেন। এ বিজ্ঞানীর নামানুসারে এটি বোর মডেল নামে পরিচিত। কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত বোর মডেলের উল্লেখযোগ্য তিনটি প্রস্তাবনা রয়েছে। যথা :

১। শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব।
৩। শক্তির বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব।

১। শক্তি স্তর সম্পর্কিত প্রস্তাব : প্রত্যেক পরমাণু দুটি অংশের সমন্বয়ে গঠিত। একটি নিউক্লিয়াস ও অপরটি ইলেকট্রন। পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরমাণুর সমস্ত ভর ও ধনাত্মক চার্জ কেন্দ্রীভূত থাকে এবং নিউক্লিয়াসের অবস্থান কেন্দ্রে। নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ধনাত্মক চার্জের সমসংখ্যক ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট ইলেকট্রন নির্দিষ্ট শক্তিসম্পন্ন বৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে চলেছে। প্রত্যেক শক্তি স্তর নির্দিষ্ট কোয়ান্টাম (শক্তির ন্যূনতম একক) শক্তি সম্পন্ন।

যে শক্তি স্তর নিউক্লিয়াস থেকে যত বেশি দূরে তার শক্তি তত অধিক ($1 < 2 < 3 \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$। শক্তি স্তর সূচক এ সংখ্যাগুলোকে প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা ($n = 1,2,3,\ldots\ldots$) বলে। নির্দিষ্ট সুস্থিত কক্ষ পথগুলোকে স্থির কক্ষপথ বা শক্তি স্তর বা অরবিট (Orbit) বলে। অরবিটে আবর্তনকালে ইলেকট্রনের শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে না।

২। শক্তির বিকিরণ সম্পর্কিত প্রস্তাব : ইলেকট্রন এক শক্তি স্তর থেকে অন্য শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হলে শক্তির শোষণ বা বিকিরণ ঘটে। ইলেকট্রন উচ্চ শক্তি স্তর থেকে নিম্ন শক্তি স্তরে স্থানান্তরিত হলে শক্তির বিকিরণ হয়, ফলে বিকিরণ বর্ণালি সৃষ্টি হয়। আর নিম্ন শক্তি স্তর থেকে উচ্চ শক্তি স্তরে গমন করলে শক্তির শোষণ ঘটে। ফলে শোষণ বর্ণালির সৃষ্টি হয়। এভাবে যে পরিমাণ শক্তির শোষণ বাা বিকিরণ ঘটে তা উভয় কক্ষপথে ইলেকট্রনের শক্তির পার্থক্যের সমান। শোষিত বা বিকিরিত শক্তিকে নিচের সমীকরণের সাহায্য প্রকাশ করা যায়। $\Delta E = E_2 - E_1 = h\nu$

চিত্র ৫.২ : বোর পরমাণু মডেল

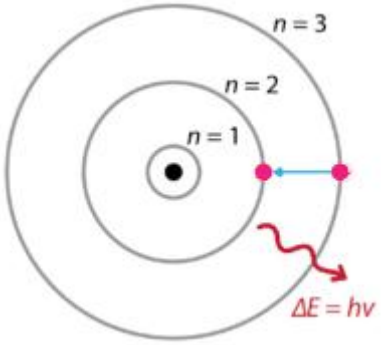

এখানে $h =$ প্লাঙ্কের ধ্রবক 6.624×10^{-34} JS

$\nu =$ বিকিরিত বা শোষিত শক্তির তড়িৎ-চুম্বকীয় কম্পাংক

বোর মডেলের সীমাবদ্ধতা

বোর মডেলের সীমাবদ্ধতাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

১। হাইড্রোজেন পরমাণু ও একক ইলেকট্রনবিশিষ্ট আয়নগুলোর বর্ণালি ব্যাখ্যা করতে পারলেও একাধিক ইলেকট্রনবিশিষ্ট পরমাণুর বর্ণালীর ব্যাখ্যা বোরের মডেলের সাহায্যে দেওয়া যায় না।

২। এক শক্তিস্তর থেকে অন্য শক্তিস্তরে ইলেকট্রন স্থানান্তরিত হলে বোর পরমাণু মডেল অনুসারে একটিমাত্র রেখা বর্ণালী সৃষ্টি হওয়ার কথা। প্রকৃতপক্ষে হাইড্রোজেন বর্ণালী কয়েকটি সূক্ষ্ম রেখা দ্বারা গঠিত। বোর মডেল এরকম সূক্ষ্ম রেখার উৎপত্তি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

৩। সৌর জগতের গ্রহগুলো সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে পরিভ্রমণ করে। ভারী নিউক্লিয়াসের চারদিকে ঘূর্ণায়মান ইলেকট্রনের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বোর মডেলে এই কক্ষপথগুলোকে বৃত্তাকার বলা হয়েছে।

৪। বোর মডেলের সাহায্যে জিম্যান (Zeeman effect) ও স্টার্ক ক্রিয়া (Stark effect) ব্যাখ্যা করা যায় না।

৫। বোরের মডেল অনুসারে ইলেকট্রনের অবস্থান ও বেগ সুনির্দিষ্ট। কিন্তু হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা সূত্রানুসারে তা হতে পারে না।

৬। বোরের মডেল অনুসারে ইলেকট্রনের শুধু কণাধর্ম বিদ্যমান। কিন্তু বিজ্ঞানী ডি-ব্রগলী (De-Boggle) প্রমাণ করেন যে ইলকট্রনের একই সাথে তরঙ্গ প্রকৃতিও রয়েছে।

বোর পরমাণু মডেলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য

১। বোরের পরমাণু মডেলের সাহায্যে পরমাণুর স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করা যায়। ইলেকট্রন নির্দিষ্ট কক্ষপথে আবর্তনরত অবস্থায় শক্তি শোষণ বা বিকিরণ করে না। আবার আবর্তনরত অবস্থায় কেন ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসে পতিত হয় না তার ব্যাখ্যাও এই মডেলে পাওয়া যায়।

২। এই মডেল হাইড্রোজেন বর্ণালীর সৃষ্টি এবং তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, কম্পাঙ্ক সফলভাবে ব্যাখ্যা করেছে।

৩। এই মডেলের সাহায্যে মুখ্য কোয়ান্টাম সংখ্যা (n) সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় যার সাহায্যে পরবর্তিতে অন্যান্য কোয়ান্টাম সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা গেছে।

৫.৩ পরমাণুর বিভিন্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রন বিন্যাস

একটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার সমান সংখ্যক প্রোটন নিউক্লিয়াসে ও সমান সংখ্যক ইলেকট্রন কক্ষপথে অবস্থান করে। পরমাণুর কেন্দ্রের বাইরে ইলেকট্রন অবস্থান করার জন্য নির্দিষ্ট কতকগুলো বৃত্তাকার প্রধান শক্তি স্তর রয়েছে। প্রধান শক্তি স্তর কতকগুলো বৃত্তাকার ও উপবৃত্তাকার উপশক্তি স্তরের সমন্বয়ে গঠিত। এ উপস্তরগুলোর ইলেকট্রন ধারণক্ষমতা বিভিন্ন। প্রধান শক্তি স্তরে ১টি উপস্তর (s) দ্বিতীয় প্রধান শক্তি স্তর দুটি উপস্তর (s. p), তৃতীয় প্রধান শক্তি স্তর ৩ টি উপশক্তিস্তর (s. p. d) এবং চতুর্থ প্রধান শক্তিস্তরে ৪ টি উপস্তর (s. p. d. f) রয়েছে। এ স্তরগুলোর উপর ভিত্তি করে পরমাণুতে ইলেকট্রনগুলো নিয়মমাফিক বিন্যস্ত হয়। উপস্তরগুলো (s উপস্তর বাদে) আবার কতকগুলো ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত হয়। এগুলোর প্রত্যেকটিকে অরবিটাল বলা হয়। উপস্তর s একটি, p তিনটি, d পাঁচটি ও f সাতটি অরবিটালে বিভক্ত। এ অরবিটালগুলোকে উপশক্তিস্তরের নামানুসারে s p d ও f অরবিটাল এবং এগুলোর মধ্যে আবর্তনরত ইলেকট্রনগুলোকে যথাক্রমে s p d ও f ইলেকট্রন বলা হয়। পরমাণুর অভ্যন্তরে নিউক্লিয়াসের চারদিকে যে ত্রিমাত্রিক স্থানে প্রায় সর্বক্ষণ একটি ইলেকট্রনকে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে তাকে অরবিটাল বলে।

বিভিন্ন শক্তিস্তর, উপস্তরে এবং অরবিটালে ইলেকট্রনগুলো নিয়ম মাফিক সজ্জিত থাকে। বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রনের এ সজ্জাকে ইলেকট্রন বিন্যাস বলে। এক একটি শক্তিস্তরে সর্বোচ্চ $2n^2$ সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে। ইলেকট্রন বিন্যাসের সাধারণ নিয়ম হলো–

১। ইলেকট্রনগুলো শক্তির উচ্চক্রম অনুসারে ক্রমশ ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রধান শক্তিস্তরে প্রবেশ করে।

২। আউফবাউ নীতি (Aufbau Principle) : নিম্ন শক্তি স্তরে ইলেকট্রনের স্থিতিশীলতা বেশি। তাই ইলেকট্রনসমূহ প্রথমে নিম্ন শক্তির অরবিটালে ও পরে ক্রমশ উচ্চশক্তির অরবিটালে প্রবেশ করে। এ নীতিকে আউফবাউ নীতি (Aufbau Principle) বলা হয়। Aufbau জার্মান শব্দ। এর অর্থ নিচে থেকে ওপরের দিকে ক্রমশ বা build up। অরবিটালের শক্তির মান নির্ণয়ের জন্য তার প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা n ও সহকারী কোয়ান্টাম সংখ্যা l এর সাহায্যে নেওয়া হয়। যে অরবিটালের (n + l) মান নিম্ন সেই অরবিটালে সর্ব প্রথম ইলেকট্রন প্রবেশ করবে। যেমন 3d ও 4s এর ক্ষেত্রে-

3d এর ক্ষেত্রে n = 3 এবং l = ২
4s এর ক্ষেত্রে n = 4 এবং l = ০

- n + l = 3 + 2 = 5
- n + l = 4 + 0 = 4

সুতরাং ইলেকট্রন 3d অরবিটালে প্রবেশের পূর্বেই 4s অরবিটালে প্রবেশ করবে।

যদি দুটো অরবিটালের (n + l) -এর মান সমান হয় তবে যে অরবিটালের n এর মান নিম্ন সেই অরবিটালে প্রথম ইলেকট্রন প্রবেশ করবে। যেমন- 3p ও 4p এর ক্ষেত্রে (n + l) এর মান যথাক্রমে (3 + 1) = 4 এবং (4 + 1) =5। এ ক্ষেত্রে 3p তে সর্বপ্রথম ইলেকট্রন প্রবেশ করবে।

বিভিন্ন অর্বিটালের শক্তির ক্রম যথাক্রমে 1s < 2s < 2p < 3s < 23p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p । তাই ইলেকট্রনসমূহ শক্তিস্তর পূরণের ক্ষেত্রে এ ক্রমই অনুসরণ করবে। ইলেকট্রন বিন্যাসের এ ধারা নিচের চিত্রের সাহায্যে মনে রাখা যায়–

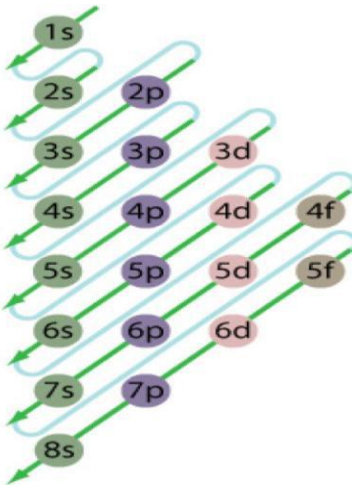

চিত্র ৫.৩ : অরবিটালে শক্তির ক্রম

চিন্তা করুন : ১৯ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলের ১৯ তম ইলেকট্রনটি 3d অর্বিটালে না গিয়ে 4p অরবিটালে যায় কেন ?

৩। **হুন্ডের নীতি (Hund`s Rule)**

কোনো উপস্তরের প্রত্যেকটি অর্বিটালের শক্তি সমান, একই শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন অরবিটালে ইলেকট্রন কিভাবে প্রবেশ করবে তার একটি নিয়ম বিজ্ঞানী হুন্ড দিয়েছেন। বিজ্ঞানীর নাম অনুসারে একে হুন্ডের নীতি (Hund`s Rule) বলা হয়। সমশক্তি সম্পন্ন অরবিটালগুলোতে প্রথমে একটি একটি করে ইলেকট্রন একমুখী স্পিনে প্রবেশ করবে। সব অরবিটাল পূর্ণ হওয়ার পর বিপরীত স্পিনযুক্ত ইলেকট্রন প্রবেশ করে জোড় পূর্ণ করে। যেমন-

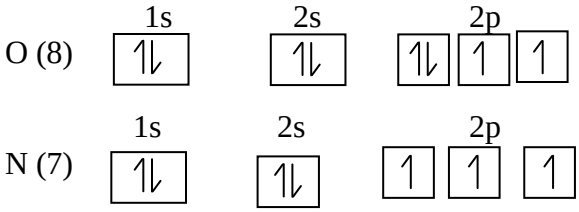

৪। **পাউলির বর্জন নীতি (Pauli`s Exclusion Prinaiple) :** ১৯২৫ সালে বিজ্ঞানী পাউলি ইলেকট্রন বিন্যাস সর্ম্পকে একটি নীতি বর্ণনা করেন যা তাঁর নামানুসারে পাউলির বর্জন নীতি নামে পরিচিত। নীতিটা হলো "একই পরমাণুতে যে কোনো দুটো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান একই হতে পারে না"। অর্থাৎ একই পরমাণুতে দুটো ইলেকট্রনের তিনটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান এক হলেও ৪র্থ কোয়ান্টাম সংখ্যা অবশ্যই ভিন্ন হবে। যেমন হিলিয়ামের দুটো ইলেকট্রনের চারটি কোয়ান্টাম সংখ্যার মান নিম্নরুপ :

১ম ইলেকট্রনের জন্য n = 1, l = 0, m = 0, s = + ½
২য় ইলেকট্রনের জন্য n = l, l=0, m = 0, s = —½

৫। একটি অরবিটালে সর্বোচ্চ দুটো ইলেকট্রন প্রবেশ করতে পারে।

৬। কোনো উপস্তরে অরবিটালগুলোতে ইলেকট্রনের বিতরণ আলাদাভাবে না দেখিয়ে নিম্নোক্তভাবে দেখানো হয়। যেমন- p ও d অরবিটালে ইলেকট্রন বিতরণ :

N (7) = $1s^2$ $2s^2$ $2p^3$
K (19) = $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $4s^1$
Fe (26) = $1s^2$ $2s^2$ $2p^6$ $3s^2$ $3p^6$ $3d^6$ $4s^2$

৭। ইলেকট্রন প্রথমে ঐ উপস্তরে প্রবেশ করে যেখানে উপস্তর ইলেকট্রন প্রবেশের ফলে পূর্ণ বা অর্ধপূর্ণ হয়। শক্তিস্তর চিত্রের সাহায্যে ক্রমান্বয়ে অরবিটাল পূর্ণ হওয়ার ধারা নির্ণয় করা যায়।

Cu (29) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^9\ \ 4s^2$ হবে না। এর পরিবর্তে হবে
Cu (29) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^{10}\ \ 4s^1$
Cr (24) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^4\ \ 4s^2$ হবে না। এর পরিবর্তে হবে
Cr (24) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^5\ \ 4s^1$

পরমাণুতে ইলেকট্রন বিন্যাসের চিত্রে শেষের দিকে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। যেমন- Ba (56)-এর ক্ষেত্রে উপস্তর 4s পূর্ণ হওয়ার পর এর পরবর্তী মৌল La (57) এর বাড়তি ইলেকট্রন উপস্তর 4f এ প্রবেশ না করে 5d তে প্রবেশ করে। অবশ্য Ce (58) থেকে Lu (71) পর্যন্ত [Gd (64) ব্যতীত] মৌল গুলোতে ইলেকট্রন এক এক করে 4f এ প্রবেশ না করে 5d †ত প্রবেশ করে। Gd (64) এর ক্ষেত্রে বাড়তি ইলেকট্রন 4f এ প্রবেশ না করে 5d তে প্রবেশ করে। Lu (71) এ উপস্তর 4f পূর্ণ হওয়ার পর পুনরায় নিয়মমতো 5d উপস্তরে ইলেকট্রন প্রবেশ করে)।

La (57) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^{10}\ \ 4s^2\ \ 4p^6\ \ 4d^{10}\ \ 5s^2\ \ 5p^6\ \ 5d^1\ \ 6s^2$
Ce (58) $\rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^{10}\ \ 4s^2\ \ 4p^6\ \ 4d^{10}\ \ 4f^1\ 5s^2\ \ 5p^6\ \ 5d^1\ \ 6s^2$
Lu (71) $\rightarrow 1s^2\ \ 2p^2\ \ 2p^6\ \ 3s^2\ \ 3p^6\ \ 3d^{10}\ \ 4s^2\ \ 4p^6\ \ 4d^{10}\ \ 4f^{14}\ 5s^2\ \ 5p^6\ 5d^1\ \ 6s^2$

সারণি ৫.১ : কয়েকটি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস

মৌল	পরমাণু ক্রমাংক	1s	2s	2p	3s	3p	3d	4s	4p	4d	4f
Na	11	2	2	6	1						
Mg	12	2	2	6	2						
Al	13	2	2	6	2	1					
Si	14	2	2	6	2	2					
P	15	2	2	6	2	3					
S	16	2	2	6	2	4					
Ci	17	2	2	6	2	5					
Ar	18	2	2	6	2	6					
K	19	2	2	6	2	6		1			
Ca	20	2	2	6	2	6		2			
Sc	21	2	2	6	2	6	1	2			
Ti	22	2	2	6	2	6	2	2			
V	23	2	2	6	2	6	3	2			
Cr	24	2	2	6	2	6	5	1			
Mn	25	2	2	6	2	6	5	2			
Fe	26	2	2	6	2	6	6	2			
Co	27	2	2	6	2	6	7	2			
Ni	28	2	2	6	2	6	8	2			
Cu	29	2	2	6	2	6	10	1			
Zn	30	2	2	6	2	6	10	2			
Ga	31	2	2	6	2	6	10	2	1		
Ge	32	2	2	6	2	6	10	2	2		
As	33	2	2	6	2	6	10	2	3		
Se	34	2	2	6	2	6	10	2	4		
Br	35	2	2	6	2	6	10	2	5		
Kr	36	2	2	6	2	6	10	2	6		

Na ও K এর ১১ ও ১৯ তম ইলেকট্রনের জন্য (পাউলির বর্জন নীতির প্রয়োগ করে) চারটি কোয়াটাম সংখ্যার মান বের করুন।

৫.৪ পর্যায় সারণি (Periodic Table)

আমাদের চারপাশে যা কিছু দেখি এর সকল বস্তুই অসংখ্য অণুর সমন্বয়ে গঠিত। অণুগুলো আবার পরমাণু বা মৌলের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি মৌলের কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ধর্ম রয়েছে। এসব বৈশিষ্টপূর্ণ মৌলকে ধর্মের সাদৃশ্যের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন শ্রেণিতে ভাগ করা গেলে শ্রেণিভিত্তিক ধর্ম, বিক্রিয়ার প্রবণতা ইত্যাদি জানা ও তা মনে রাখা অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। এভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ধর্ম ও বিক্রিয়ার প্রবণতা ও সক্রিয়তাবিশিষ্ট মৌলসমূহকে একই শ্রেণিতে রেখে এদের কোনো একটির রসায়নের জ্ঞান থেকে অন্য মৌলগুলোর রসায়ন বিষয়ের ধারণা করা সহজতর করার ধারাবাহিক প্রচেষ্টা থেকেই আধুনিক "পর্যায় সারণির" উন্মেষ ঘটেছে। একইরূপ ধর্মবিশিষ্ট মৌলসমূহকে তাদের ধর্মের ক্রমানুসারে আলাদা আলাদা শ্রেণিতে রেখে মৌলসমূহের পর্যায় সারণি তৈরি করা হয়েছে। এই ইউনিটে উল্লিখিত বিষয়বস্তুকে দুইটি সাব ইউনিটে বিভক্ত করা হয়েছে।

আধুনিক পর্যায় সারণির ভিত্তি

রাশিয়ার প্রখ্যাত বিজ্ঞানী রসায়নবিদ ডিমিট্রি মেন্ডেলিফ (Dimitri Mendeleeff) ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে এবং জার্মানির রসায়নবিদ লুথার মেয়ার (Luther Mayer) ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সে সময়ে আবিস্কৃত ৬৩টি মৌল নিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করে মৌলগুলোর আধুনিক শ্রেণিবিভাগের মূলনীতি আবিষ্কার করেন। মেন্ডেলিফ এই নীতিকে প্রথম একটি সূত্রের আকারে প্রকাশ করায় তার নামানুসারে এই সূত্রটিকে মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্র (Periodic Law) বলা হয়।

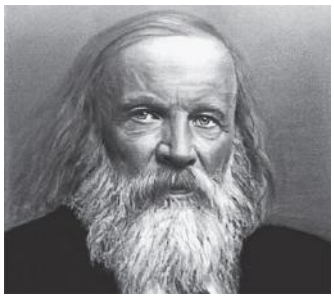

চিত্র ৫.৪ : ডেমিট্রি মেন্ডেলিফ

চিত্র ৫.৫ : লুথার মেয়ার

সূত্রটি হলো মৌলগুলোকে পারমাণবিক ভরের উচ্চক্রম অনুসারে সাজালে এগুলোর ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। একই ধরনের মৌলিক পদার্থকে একটি শ্রেণিতে স্থান দিতে গিয়ে কয়েকটি মৌলকে তাদের পারমাণবিক ভর হিসেবে সাজানো সম্ভব হয়নি। যেমন K এর পারমাণবিক ভর 39.1 কিন্তু Ar এর পারমাণবিক ভর 39.9। সে হিসেবে K এর স্থান হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সাথে 18 গ্রুপে আর Ar এর স্থান হয় ক্ষার ধাতুর সাথে গ্রুপ 1 তে, যা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে সজ্জিত করায় মেন্ডেলিফের প্রচেষ্টার সবচেয়ে বেশি অসুবিধা হলো আইসোটোপ নিয়ে। আইসোটোপ হলো একই মৌলের বিভিন্ন পারমাণবিক ভরবিশিষ্ট পরমাণু। পারমাণবিক ভরের ক্রম অনুসারে সাজাতে হলে একই মৌলের বিভিন্ন আইসোটোপকে পর্যায় সারণিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থান দিতে হয় যা পর্যায় সারণির মূল কাঠামোর পরিপন্থী।

এসব পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে, **"পারমাণবিক ভর"** মৌলের শ্রেণি বিভাগের ভিত্তি হতে পারে না। পরবর্তীকালে 1913 সালে বিজ্ঞানী মোসলে রঞ্জন রশ্মির পরীক্ষায় প্রমাণ করেন যে, রঞ্জন রশ্মির স্পন্দন সংখ্যার সাথে পারমাণবিক ভরের কোনো সম্পর্ক নেই বরং মৌলের পারমাণবিক সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ থেকে প্রতিষ্ঠিত হয় যে, মৌলের ভর সংখ্যার চেয়ে পারমাণবিক সংখ্যাই পর্যায় সারণির শ্রেয়তর ভিত্তি।

পর্যায় সূত্রের সংশোধিত রূপ হলো **"মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অণুযায়ী পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়।"** পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে মৌলসমূহকে পর্যায় সারণিতে সজ্জিত করলে বিজ্ঞানী মেন্ডেলিফ পটাশিয়াম ও আর্গন, টেলুরিয়াম ও আয়োডিন বা কোবাল্ট ও নিকেলের অবস্থানগত যে সমস্যা লক্ষ করেছিলেন তা আর থাকে না। যেমন–আর্গনের পারমাণবিক সংখ্যা (18), পটাশিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা (19) এর চেয়ে কম বলে পর্যায় সারণিতে আর্গন পটাশিয়ামের পূর্বে বিভিন্ন নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সঙ্গে একই শ্রেণিতে (18) এবং পটাশিয়াম অন্যান্য ক্ষার ধাতুর সঙ্গে 1 শ্রেণিতে

স্থাপিত হয়। ফলে পারমাণবিক সংখ্যা যুক্তিসঙ্গতভাবেই গৃহীত হয়। কিন্তু কয়েকটি বিষয় পারমাণবিক সংখ্যাকে মৌলের শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সমস্যার সৃষ্টি করো যেমন–

- পর্যায় সারণিতে কেন এক একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে এক একটি পর্যায়ের বিরতি ঘটে এবং আরেকটি পর্যায় শুরু হয়?
- প্রথম পর্যায়ে 2টি মৌল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায় 8টি করে মৌল, চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায়ে 18টি করে মৌল এবং ষষ্ঠ ও সপ্তম পর্যায়ে 32টি করে মৌল কেন স্থান লাভ করে?
- কিভাবে সমধর্মী মৌলসমূহ একই শ্রেণিতে অবস্থান লাভ করে?
- ল্যানথানাইড ও অ্যাকটিনাইড সারির মৌলসমূহের পর্যায় সারণির নিচে পৃথকভাবে কেন স্থাপন করা হয়?

এসব প্রশ্নের উত্তর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পর্যায় সারণির একটি ভিত্তিস্তর পারমাণবিক সংখ্যা হলেও এর চূড়ান্ত ভিত্তি হলো মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস। ইলেকট্রন বিন্যাসের সাহায্যে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান, শ্রেণিবিন্যাস এবং ধর্মের সঙ্গে অবস্থানের সামঞ্জস্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা করা যায়। যেমন–

আমরা যদি গ্রুপ 1 এর মৌলগুলোর ইলেকট্রন বিন্যাস লক্ষ করি তাহলে দেখা যায় যে, 1 উপশ্রেণির মৌলগুলোর সর্বশেষ বা বহিঃস্তরে একটি মাত্র ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ বহিঃস্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস ns^1।

H (1) — $1s^1$

Li (3) — $1s^2\ 2s^1$

Na (11) — $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$

K (19) - $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1$

Rb (37) — $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 5s^1$

Cs (55) - $1s^2\ 2s^2\ 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^{10} 5s^2 5p^6 6s^1$

Fr (87) — $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 4f^{14}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6\ 7s^1$

এভাবে গ্রুপ 1, 2 এবং 13 গ্রুপ 17 শ্রেণির মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এগুলোর বহিঃস্তরে ইলেকট্রনের বিন্যাস যথাক্রমে ns^1, ns^2, ns^2np^1, ns^2np^2, ns^2np^3, ns^2np^4, ns^2np^5। একইভাবে পর্যায় সারণির মাঝখানে অবস্থিত গ্রুপ 3 হতে গ্রুপ 12 পর্যন্ত মৌলসমূহের পরমাণুর সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস যথাক্রমে-

গ্রুপ-3 – $(n-1)\ d^1\ ns^2$

গ্রুপ-4 – $(n-1)\ d^2\ ns^2$

গ্রুপ- 5 – $(n-1)\ d^3\ ns^2$

গ্রুপ- 6 – $(n-1)\ d^5\ ns^1$

গ্রুপ- 7 – $(n-1)\ d^5\ ns^2$

গ্রুপ- 8 – $(n-1)\ d^6\ ns^2$

গ্রুপ- 9 – $(n-1)\ d^7\ ns^2$

গ্রুপ- 10 – $(n-1)\ d^8\ ns^2$

গ্রুপ- 11 – $(n-1)\ d^{10}\ ns^1$

গ্রুপ- 12 – $(n-1)\ d^{10}\ ns^2$

যে কোনো পর্যায়ে বাম থেকে ডানে গেলে মৌলগুলোর শেষ শক্তিস্তরে ক্রমশ একটি করে ইলেকট্রন বাড়তে থাকে। 18 গ্রুপে গিয়ে বহিঃস্থ কক্ষপথ ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়। আবার দেখা যায়, মৌলের পরমাণুর শক্তিস্তরের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান পর্যায় সারণিতে মৌলটির পর্যায় এবং পরমাণুর শেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা মৌলের শ্রেণিগত অবস্থান নির্দেশ করে। যেমন, ম্যাগনেশিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস Mg (12)—$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$। এখানে ম্যাগনেসিয়ামের শেষ কক্ষপথের প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যার মান 3। সুতরাং এটি তৃতীয় পর্যায়ের মৌল। এর শেষ কক্ষপথে 2টি ইলেকট্রন থাকায় মৌলটির গ্রুপ 2-এর অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভূক্ত।

মৌলের যোজনী এবং জারণ সংখ্যাও ইলেকট্রন বিন্যাসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন– গ্রুপ 1 এর প্রতিটি মৌলের পরমাণুর বহিঃস্তরে 1টি ইলেকট্রন আছে। 1টি ইলেকট্রন ত্যাগ করে এসব পরমাণু সহজেই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের পরমাণুর ন্যায় ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে। এ কারণে এই শ্রেণির সকল মৌলের যোজনী 1 এবং জারণ সংখ্যা +1। অপরদিকে গ্রুপ 17 শ্রেণীর মৌলসমূহের বাইরের কক্ষপথে 7টি ইলেকট্রন থাকায় এসব মৌল অষ্টক পূর্ণতার জন্য 1টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে। অতএব এ শ্রেণির মৌলগুলির যোজনী1 এবং জারণ সংখ্যা−1। এভাবে শ্রেণী 1, 2 এবং 13 থেকে 17 পর্যন্ত মৌলসমূহের জারণ অবস্থা যথাক্রমে +1, +2, +3, +4, −3, −2, −1 হয়।

আবার ল্যানথানাইড সিরিজের প্রতিটি মৌলের গঠন $5s^2\ 5p^6\ 5d^1\ 6s^1$ এবং অ্যাকটিনাইড সিরিজের প্রতিটি মৌলের গঠন $6s^2\ 6p^6\ 6d^1\ 7s^2$। এ দুটো সারির 15টি করে মৌলের বহিঃস্থ সবগুলো স্তরের ইলেকট্রনীয় গঠন একই। প্রতিটি সিরিজের মৌলগুলোর ধর্মের সাদৃশ্য থাকায় এগুলোকে পর্যায় সারণির একটি মাত্র স্থানে স্থাপন করতে হয়। কিন্তু এটি সম্ভব নয় বলে পর্যায় সারণির নিচে আলাদাভাবে স্থান দেওয়া হচ্ছে। এটি সম্ভব হয়েছে মৌলসমূহকে ইলেকট্রন বিন্যাসের ভিত্তিতে সজ্জিত করায়। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট যে, পর্যায় সারণির মূলভিত্তি পারমাণবিক সংখ্যা নয় বরং মৌলসমূহের ইলেকট্রন বিন্যাস।

মৌলসমূহের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম মৌলসমূহের শেষ কক্ষপথে ইলেকট্রন বিন্যাসের ওপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু পর্যায় সারণির মূল উদ্দেশ্য অনুরূপ ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মের ভিত্তিতে মৌলসমূহের শ্রেণিবিন্যাস করা, সুতরাং পারমাণবিক সংখ্যার ক্রম অনুসারে ইলেকট্রন বিন্যাসই পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি।

ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয়

আধুনিক পর্যায় সারণির মূলভিত্তি হলো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস। তাই পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থান এর ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে বুঝা যায়। প্রথমে মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে উক্ত মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। কোনো মৌলের যতটি শক্তি স্তরে ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে শক্তি স্তরের সে সংখ্যাই হলো ঐ মৌলের পর্যায় সংখ্যা। যেমন- হাইড্রোজেন (H) ও হিলিয়ামের (He) এর ক্ষেত্রে দেখা যায়, একটি মাত্র শক্তি স্তরের ইলেকট্রন বিন্যস্ত থাকে এবং পর্যায় সারণিতে এদের অবস্থান পর্যায়- 1-এ। অনুরূপভাবে সোডিয়াম থেকে আর্গন পর্যন্ত মৌলসমূহের ইলেকট্রন তিনটি শক্তি স্তরে বিন্যস্ত। এতে বুঝা যায়, এদের পর্যায় সংখ্যা হলো 3। সাধারণভাবে সর্ববহিঃস্থ শক্তি স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যাই কোনো নির্দিষ্ট পর্যায়ে উক্ত মৌলের গ্রুপ সংখ্যা নির্দেশ করে।

পর্যায় ও গ্রুপ নির্ধারণ : কোনো মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে **সর্বোচ্চ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা মৌলটির পর্যায় নির্ধারণ করে**। যেমন P এর ইলেকট্রন বিন্যাস $(1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3)$ থেকে দেখা যায়, এর সর্বোচ্চ প্রধান কোয়ান্টাম সংখ্যা 3। কাজেই P এর অবস্থান পর্যায় সারণির 3 নং পর্যায়ে ।

পরমাণুর সর্বশেষ কোয়ান্টাম সংখ্যার অর্বিটালে/অর্বিটালসমূহে বিদ্যমান মোট ইলেকট্রন সংখ্যা ঐ মৌলের গ্রুপ নির্দেশ করে। উদাহরণ স্বরুপ ফসফরাসের সর্বশেষ শক্তি স্তরে 2 + 3 = 5 টি ইলেকট্রন থাকায় এর গ্রুপ হবে 15 । কারণ 10 টি গ্রুপ হলো d-ব্লক মৌল যাদের অবস্থান পর্যায় সারণির মাঝখানে বলে p-ব্লক মৌলের অবস্থান নির্ণয়ে 10 যোগ করতে হয় । নিচে কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হলো :

ক) s এবং p উভয় উপস্তর মিলে মোট 7 টি ইলেকট্রন (s^1 হতে s^2p^5) থাকলে মৌলটি ক্রমান্বয়ে গ্রুপ 1, 2 এবং 13 থেকে গ্রুপ 17 এর অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন– সোডিয়াম (11) পরমাণুর বহিঃস্তরে একটি ইলেকট্রন থাকে বলে এটি গ্রুপ 1 এ অবস্থিত।

আবার ক্লোরিন পরমাণুর বহিঃস্তরে 7টি ইলেকট্রন থাকে। তাই এটি গ্রুপ 17-এর অন্তর্ভুক্ত হয়। ক্লোরিন একটি p-ব্লক মৌল বলে এক্ষেত্রেও 7 এর সাথে 10 যোগ হলো।

$_{11}Na = 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\underline{3s^1}$ গ্রুপ 1 এবং পর্যায় 3

$_{17}Cl = 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\underline{3s^2\ 3p^5}$ গ্রুপ 17 এবং পর্যায় 3

খ) বহিঃস্থ s এবং p উপস্তরে মোট ৮টি ইলেকট্রন ($s^2\ p^6$) থাকলে মৌলটির অবস্থান 18 গ্রুপে অর্থাৎ মৌলটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস।
যেমন $_{10}Ne$ - $1s^2\underline{2s^2\ 2p^6}$ ঃ গ্রুপ 18; পর্যায় 2

গ) মৌলটি d-ব্লকভুক্ত হলে বহিঃস্থ d ও s উপস্তরে মোট যতটি ইলেকট্রন থাকে মৌলটিও তত নম্বর গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত হয়। যেমন স্ক্যান্ডিয়াম (21) এ সর্বশেষ শক্তিস্তরে $3d^1\ 4s^2$ বিন্যাস থাকে বলে এর গ্রুপ 3 এবং পর্যায় 4 হয়।

$_{21}Sc$ - $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\underline{3d^1\ 4s^2}$; গ্রুপ 3 ও পর্যায় 4

Cu এর বহিঃস্তরে 3d এ 10টি ইলেকট্রন আছে। সুতরং 4s এর 1 টি ইলেকট্রনের জন্য এর গ্রুপ 10 + 1 = 11 হয়।

$_{29}Cu – 1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\underline{3d^{10}\ 4s^1}$ গ্রুপ 11 এবং পর্যায় 4

৫.৫ মৌলের পর্যায়বৃত্ত ধর্ম (Periodic Properties of Elements)

পর্যায় সারণির মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে নির্দিষ্ট ব্যবধান অন্তর ধর্মের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা যায়। ধর্মের এ জাতীয় পুনরাবৃত্তিকে মৌলের পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম বা পর্যায়বৃত্ততা বলে। মৌলের সবকটি ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মই পর্যায়বৃত্তিক। কারণ পারমাণবিক সংখ্যার নির্দিষ্ট ব্যবধানের পর মৌলের বহিঃস্তরের ইলেকট্রনীয় গঠনে সাদৃশ্য ঘটে। মৌলের ধর্ম বহিঃস্তরের ইলেকট্রনীয় গঠন এবং নিউক্লিয়াস থেকে ইলেকট্রনের দুরত্ব তথা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ এই দুটি বিষয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবস্থানসূচক গ্রুপ সংখ্যা থেকে বহি :স্তরে ইলেকট্রন সংখ্যা অনুসারে ধর্ম সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গলনাংক, স্ফুটনাংক, পরমাণুর আকার আয়নিকরণ শক্তি, ইলেকট্রন আসক্তি, তড়িৎ ঋণাত্মকতা, রাসায়নিক সক্রিয়তা, ধাতু ধর্ম ইত্যাদি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম। এবার পর্যায়বৃত্ত ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

গলনাংক ও স্ফুটনাংক : মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংক হলো মৌলের ভৌত ধর্ম। মৌলের ধর্মের পর্যায়বৃত্ততা কেবল রাসায়নিক ধর্মাবলিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। মৌলের গলনাংকে, স্ফুটনাংকে, ঘনত্বে এবং অন্যান্য ধর্মেও তা পরিলক্ষিত হয়। এ সব ভৌত ধর্ম পরমাণুর গঠন, মৌলে পরমাণুর মধ্যকার বন্ধন প্রকৃতি এবং পরমাণুর ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থার সাথে নিবিড়ভাবে সর্ম্পকযুক্ত। এসব বিষয় আবার পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাসের উপর নির্ভরশীল।

ধাতব মৌলের ক্ষেত্রে গলনাংক ও স্ফুটনাংক নির্ভর করে–

- ধাতব খণ্ডে ধাতব আয়নের আধান ও মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা, এবং
- ধাতব আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তির ওপর।

ধাতব আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তি বেশি হলে ধাতব মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশি হয়। অধাতব মৌলের ক্ষেত্রে গলনাংক ও স্ফুটনাংক নির্ভর করে–

- **অধাতব মৌলের অণুসমূহের মধ্যবর্তী ভ্যান ডার ওয়ালস** (van der Waals) **আকর্ষণ শক্তির ওপর :** অধাতব মৌলের অণুসমূহের মধ্যবর্তী ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ শক্তি বেশি হলে অধাতব মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বেশি হয়। পর্যায় সারণির একটি গ্রুপে ধাতব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ধাতব খণ্ডে যুক্ত ইলেকট্রন অভিন্ন হলেও ধাতব আয়নের আকার বৃদ্ধি পায়। আকার বৃদ্ধির সাথে ধাতব আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পায়। তাই পর্যায় সারণির কোনো গ্রুপে ধাতব পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংক হ্রাস পায়। গ্রুপ-1 এ অবস্থিত ক্ষারধাতুসমূহের গলনাংক-

ক্ষার ধাতু	Li	Na	K	Rb	Cs	Fr
গলনাংক (°C)	180.5	97.8	63.7	39.0	28.4	27

গ্রুপ-17 তে অবস্থিত হ্যালোজেনসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাদের গলনাংক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়। হ্যালোজেন পরমাণুর আকার বৃদ্ধির সাথে অণুসমূহের মধ্যবর্তী ভ্যান ডার ওয়ালস আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। হ্যালোজেনসমূহের গলনাংক হলো–

হ্যালোজেন	F	Cl	Br	I	At
গলনাংক (°C)	-219	-100	-7.2	113.5	302

পর্যায় সারণির বাম থেকে ডান দিকে ধাতব পরমাণু পর্যন্ত পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে ধাতব খণ্ডে ধাতব আয়নের আধান ও মুক্ত ইলেকট্রন সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাতে ধাতব আয়ন ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তি বেশি হয়। এ আকর্ষণ শক্তিকে **ধাতব বন্ধন** বলে। তাই ধাতব পরমাণু পর্যন্ত কোনো পর্যায়ের বাম থেকে ডান দিকে মৌলের গলনাংক ও স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়।

তৃতীয় পর্যায়ের মৌল Na, Mg ও Al খন্ডে ধাতব আয়ন যথাক্রমে Na^+, Mg^{2+} Al^{3+} হিসেবে থাকে। প্রতিটি পরমাণু হতে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়ে। এজন্য Na হতে Al পর্যন্ত ধাতব বন্ধনের শক্তি দৃঢ়তর হয় । তাই এদের গলনাংক ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পায়।

ফসফরাস (P_4) অণু বিশুদ্ধ সমযোজী প্রকৃতির। ফসফরাস অণুসমূহ ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ বলের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে। তাই ফসফরাসের গলনাংক ও স্ফুটনাংক কম। ক্লোরিন অণু দ্বি-পরমাণুক গ্যাস, তাই এর গলনাংক ও স্ফুটনাংক অত্যন্ত কম। সালফারের অণুসমূহ দুর্বল ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ বলের মাধ্যমে আবদ্ধ থাকে বলে গলনাংক ও স্ফুটনাংক কম।

পারমাণবিক আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (Atomic Size)

পর্যায় সারণিতে কোনো একটি গ্রুপে এবং পর্যায়ে মৌলের পারমাণবিক আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। মৌলের আয়নিক ব্যাসার্ধ বা সমযোজী ব্যাসার্ধ পরিমাপ করে এর পারমাণবিক আকার সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। আয়নিক ও সমযোজী ব্যাসার্ধকে nm (nanometer) এককে পরিমাপ করা হয়। ($1\ nm = 10^{-9}\ m$)

একই মৌলের দুটি পরমাণু একক সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ অবস্থায় পরমাণুদ্বয়ের নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক হলো ঐ মৌলের **সমযোজী ব্যাসার্ধ (Covalent radius)**। Cl অণুতে ক্লোরিন পরমাণুর নিউক্লিয়াসের মধ্যবর্তী দূরত্বের অর্ধেক হলো ক্লোরিনের সমযোজী ব্যাসার্ধ। মৌলদ্বয় দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন গঠন করলে যে সমযোজী ব্যাসার্ধ পাওয়া যায় তা একক সমযোজী বন্ধন অবস্থায় প্রাপ্ত সমযোজী ব্যাসার্ধের তুলনায় কম হয়।

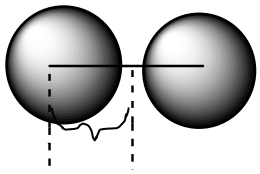

চিত্র ৫.৬ : সমযোজী ব্যাসার্ধ

মৌলের পারমাণবিক আকার বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ নির্ভর করে :

- পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তির উপর।
- পরমাণুর ইলেকট্রনের স্তর সংখ্যার ওপর।
- পরমাণুর ইলেকট্রনের স্তর সংখ্যা বেশি হলে পারমাণবিক আকার বৃদ্ধি পায় এবং নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান বৃদ্ধির সাথে নিউক্লিয়াস ও ইলেকট্রনের মধ্যবর্তী আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। এতে সর্ববহি :স্থ ইলেকট্রন কিছুটা নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী হয় এবং পারমাণবিক আকার হ্রাস পায়।
- **কার্যকর নিউক্লিয়ার আধানের ওপর পরমাণুর আকার নির্ভর করে**। নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান পরমাণুর ইলেকট্রনের অরবিটাল আকৃষ্ট করে নিউক্লিয়াসের দিকে সংকুচিত করে। নিউক্লিয়াসের ধনাত্মক আধান পরমাণুতে বিদ্যমান থেকে ইলেকট্রন সংখ্যার সমান। কিন্তু ইলেকট্রনসমূহ বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত হওয়ায় সর্বশেষ স্তরের ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়। অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন দ্বারা সর্ববহিঃস্থ ইলেকট্রনের প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করায় পরামাণুর আকার যে পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার কথা এর তুলনায় কম হয়।

- **পর্যায় বরাবর পরমাণুর আকারের পরিবর্তন :** প্রতিনিধি মৌলগুলোর ক্ষেত্রে যে কোনো পর্যায়ের বামদিক থেকে ডান দিকে গেলে পরমাণুর আকার তথা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ হ্রাস পায়।
- **ব্যাখ্যা :** একই পর্যায়ভুক্ত মৌলের পরমাণুগুলো ইলেকট্রনীয় শক্তি স্তরগুলো অপরিবর্তত থাকায় পার্থক্যসূচক ইলেকট্রনগুলো একই শক্তি স্তরে স্থান পায়। কিন্তু পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধান বৃদ্ধি পাওয়ায় পরমাণুর বহিস্তরে উপস্থিত ইলেকট্রনগুলোর ওপর নিউক্লিয়াসের আর্কষণ বল তীব্রতর হয়। ফলে যে কোনো পর্যায় বরাবর বামদিক থেকে ডানদিকে পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমশ কমতে থাকে। যে কোনো পর্যায়ে গ্রুপ 1 এর যৌগগুলোর পরমাণুর আকার সবচেয়ে বড় এবং গ্রুপ-17 এর হ্যালোজেন মৌলগুলোর পরমাণুর আকার সবচেয়ে ক্ষুদ্র হয়।

সারণি ৫.২ : তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত মৌলসমূহের পারমাণবিক (সমযোজী) ব্যাসার্ধের পরিবর্তন

গ্রুপ	মৌল	ইলেকট্রন বিন্যাস	পারমাণবিক ব্যাসার্ধ (A^0)
1	Na	2,8,1	1.54
2	Mg	2, 8, 2	1.36
14	S	2,8,4	1.17
15	P	2,8,5	1.10
16	S	2,8,6	1.04

(1 অ্যাংস্ট্রম একক = 10^{-8} cm)

- **শ্রেণি বরাবর পরমাণুর আকারের পরিবর্তন :** পর্যায় সারণির যে কোনো গ্রুপের ওপর থেকে যত নিচের দিকে যাওয়া যায় মৌলগুলোর পরমাণুর আকার তথা পারবমাণবিক ব্যাসার্ধ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

  ব্যাখ্যা : পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে একই গ্রুপভুক্ত মৌলগুলোর নতুন নতুন বহিঃস্থ শক্তিস্তরে ইলেক্ট্রনের প্রবেশ ঘটে। ফলে বহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনগুলো পরমাণুর নিউক্লিয়াস থেকে ক্রমশ দুরবর্তী হয়। এছাড়া পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে ঘিরে যে সমস্ত ইলেকট্রনপূর্ণ শক্তি স্তর আছে, সেগুলো পরমাণু নিউক্লিয়াস ও বহিঃস্থ শক্তিস্তরের ইলেকট্রনের মধ্যে পর্দার মতো কাজ করে।

সারণি ৫.৩ : পর্যায় ও শ্রেণিতে পারমাণবিক ব্যাসার্ধের পরিবর্তন

পর্যায়	গ্রুপ		
	1	14	17
2	$_3$Li (2,1) : 1.23A°	$_6$C (2,4) : 0.77A°	$_9$F (2,7) : 0.72A°
3	$_{11}$Na(2, 8, 1) : 1.64A°	$_{14}$Si (2,8,4) : 1.7A°	$_{17}$Cl (28,7) : 0.99A°
4	$_{19}$K (2,8,8,1) :2.03A°	$_{32}$Ge(2,8,18,4) :1.22A°	$_{35}$Br(2,8,18,7) :1.14A°

আয়নিকরণ শক্তি (Ionization Potential) **:** পর্যায় সারণিতে কোনো একটি গ্রুপে এবং পর্যায়ে মৌলের আয়নিকরণ শক্তি নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় বিচ্ছিন্ন কোনো মৌলের এক মোল পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে মৌলের আয়নিকরণ শক্তি বলে। আয়নিকরণ শক্তিকে কিলোজুল/মোল এককে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু মৌল থেকে ইলেকট্রন অপসারণ করতে শক্তি প্রয়োগ করতে হয় তাই আয়নিকরণ শক্তির মান ধনাত্মক হয়। আয়নিকরণ শক্তিকে I দ্বারা প্রকাশ করা হয়। আয়নিকরণ শক্তি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসভিত্তিক একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক ধর্ম। তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে একক ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে **প্রথম আয়নিকরণ শক্তি** বলে। এভাবে একক ধনাত্মক আয়ন থেকে

এক মোল ইলেকট্রন অপসারণ করে দ্বি-ধনাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাকে **দ্বিতীয় আয়নিকরণ শক্তি** বলে। সাধারণত কোনো মৌলের প্রথম আয়নিকরণ শক্তি থেকে দ্বিতীয় আয়নীকরণ শক্তি বেশি হয়।

$M_{(g)} - e^- \xrightarrow{I_1} M^+_{(g)}$ $\quad I_1$ = প্রথম আয়নিকরণ শক্তি

$M^+_{(g)} - e^- \xrightarrow{I_2} M^{2+}_{(g)}$ $\quad I_2$ = দ্বিতীয় আয়নিকরণ শক্তি

কোনো মৌলের একটি বিচ্ছিন্ন গ্যাসীয় পরমাণু M কে M^+ আয়নে পরিণত করতে যদি ন্যূনতম I_1 শক্তির প্রয়োজন হয় তবে M এর প্রথম আয়নিকরণ বিভব = I_1। একই ভাবে M এর দ্বিতীয় তৃতীয় ইলেকট্রনগুলোকে অপসারিত করে যথাক্রমে M^{2+}, M^{3+} প্রভৃতি আয়নে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শক্তিকে সংশ্লিষ্ট মৌলের যথাক্রমে দ্বিতীয় (I_2) তৃতীয় (I_3) ইত্যাদি আয়নিক বিভব বলা হয়।

কোনো পরমাণু M থেকে ক্যাটায়নে (M^+) ইলেকট্রন সংখ্যার তুলনায় প্রোটন সংখ্যা বেশি হওয়ায় ওই ইলেকট্রনগুলোর প্রতি নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ ক্যাটায়ন (M^+) এর সর্ববহিঃস্ত শক্তিস্তর আরও ১টি ইলেকট্রন অপসারণের জন্য অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। তাই আয়নিকরন বিভবের ক্রম $I_1<I_2<I_3$..... ইত্যাদি। যে কোনো পর্যায়ের বামদিক থেকে ডানদিকে অগ্রসর হলে পরমাণুর নিউক্লিয়াসে ক্রমান্বয়ে একটি করে প্রোটন প্রবেশ করে এবং পার্থক্যসূচক ইলেকট্রগুলো একই শেষ শক্তিস্তরে স্থান পায়। এর ফলে নিউক্লিয় চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং এই বর্ধিত নিউক্লিয় চার্জের প্রভাবে পরমাণুর আকার হ্রাস পায়।

গ্রুপ বরাবর আয়নিকরণ শক্তির পরিবর্তন

পর্যায় সারণির যে কোনো গ্রুপ বা শ্রেণি বরাবর উপর থেকে নিচে নামলে-

ক) নতুন শক্তিস্তর সংযোজন হওয়ায় পরামাণুর আকার বৃদ্ধি পায়
খ) প্রোটন সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় নিউক্লিয় আধানের মান বৃদ্ধি পায় এবং
গ) অভ্যন্তরীণ ইলেকট্রন পূর্ণ শক্তিস্তরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবরণী প্রভাবের (shielding effect) মান বৃদ্ধি পায়।

প্রথম ও তৃতীয় কারণের সম্মিলিত প্রভাবে আয়নিকরণ শক্তি হ্রাসের মান দ্বিতীয় কারণে আয়নিকরণ শক্তি বৃদ্ধির মান অপেক্ষা বেশি হয়। তাই যে কোনো গ্রুপ বা শ্রেণি বরাবর ওপর থেকে নিচে নামলে আয়নিকরণ শক্তির মান হ্রাস পায়।

ইলেকট্রন আসক্তি (Electron Affinity)

পর্যায় সারণিতে কোনো একটি গ্রুপে এবং পর্যায়ে মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। গ্যাসীয় অবস্থায় বিচ্ছিন্ন কোনো মৌলের এক মোল পরমাণু এক মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে ঋণাত্মক আয়নে পরিণত করতে যে পরিমাণ শক্তি নির্গত হয় তাকে মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি বলে। ইলেকট্রন আসক্তিকে কিলোজুল/ মোল এককে প্রকাশ করা হয়। যেহেতু ইলেক্ট্রন যুক্ত হওয়ায় শক্তি নির্গত হয় তাই ইলেকট্রন আসক্তির মান ধনাত্মক হয় পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও বাইরের ইলেকট্রনের মধ্যে বন্ধন শক্তি বেশি হলে নির্গত শক্তি তথা ইলেকট্রন আসক্তি বেশি হয়। যেমন-

তড়িৎ নিরপেক্ষ এক মোল পরমাণুর সাথে এক মোল ইলেক্ট্রন যুক্ত হয়ে এককব ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হওয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তাকে প্রথম ইলেক্ট্রন আসক্তি বলে।

$F_{(g)} + e^- \longrightarrow F^-(g)$ $\quad \Delta H^0 = -333 kJmol^{-1}$

$Cl_{(g)} + e^- \longrightarrow Cl^-(g)$ $\quad \Delta H^0 = -348 kJmol^{-1}$

এক মোল গ্যাসীয় একক ঋণাত্মক পরমাণু এক মোল ইলেকট্রন গ্রহণ করে এক মোল গ্যাসীয় দ্বি- ঋণাত্মক আয়নে পরিণত হতে শক্তির প্রয়োজন হয়। এ প্রয়োজনীয় শক্তি দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তি নামে পরিচিত।

$X^-_{(g)} + e^- \longrightarrow X^{2-}(g)$ $\quad \Delta H^0_2$ = + ২য় ইলেকট্রন আসক্তি।

এখানে X^- আয়ন থেকে X^{2-} আয়নে পরিণত হতে শক্তির প্রয়োজন হয়। এক ঋণাত্মক আয়নে ইলেকট্রন প্রবেশ করতে হলে অধিক শক্তির প্রয়োজন হয়। কারণ ঐ একক ঋণাত্মক আয়নে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বেশি হওয়ায় ইলেকট্রন -ইলেকট্রন বিকর্ষণ হয়। ফলে বেশি শক্তির প্রয়োজন হয়।

উদাহরণ :

$O(g) + e^- \longrightarrow O^-(g)$ প্রথম ইলেকট্রন আসক্তি = $-142\ kJ\ mol^{-1}$

$O^-(g) + e^- \longrightarrow O^{2-}(g)$ ২য় ইলেকট্রন আসক্তি = $+844\ kJ\ mol^{-1}$

অক্সিজেনের দ্বিতীয় ইলেকট্রন আসক্তির মান ধনাত্মক। কারণ এটি শক্তি স্তরে প্রবেশের সময় ইলেকট্রন ইলেকট্রন বিকর্ষণ বাধার সম্মুখীন হয় যা কাটিয়ে উঠতে শক্তির প্রয়োজন হয়। একটি পর্যায়ে যতই বাম থেকে ডান দিকে যাওয়া যায় ততই ইলেকট্রন আসক্তির মান বাড়ে। আবার পর্যায় সারণিতে একই গ্রুপে যতই ওপর থেকে নিচের দিকে যাওয়া যায় মৌলের ইলেকট্রন আসক্তি ততই কমে যায়। ইলেকট্রন আসক্তির মান থেকে কোনো অধাতুর সক্রিয়তা পরিমাপ করা হয়। যে অধাতুর ইলেকট্রন আসক্তির মান যত বেশি সে অধাতু তত সক্রিয়।

তড়িৎ ঋণাত্মকতা (Electronegativity)

পর্যায় সারণিতে কোনো একটি গ্রুপে এবং পর্যায়ে মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা নিয়মিতভাবে পরিবর্তিত হয়। দুইটি অধাতব পরমাণু সমযোজী বন্ধন গঠন করে। সমযোজী বন্ধনে উভয় পরমাণু একটি করে ইলেকট্রন শেয়ার করে। শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে উভয় পরমাণু তার নিউক্লিয়াসের দিকে আকর্ষণ করে। সমযোজী বন্ধনের শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা বিভিন্ন পরমাণুর বিভিন্ন হয়। কোনো পরমাণু কর্তৃক বন্ধনের ইলেকট্রনকে কেন্দ্রের বা নিউক্লিয়াসের দিকে আকর্ষণ করার তুলনামূলক ক্ষমতাকে **তড়িৎ ঋণাত্মকতা** বলে। পরমাণুর আকার যত ছোট হয়, নিউক্লিয়াস দ্বারা ইলেকট্রন তত বেশি জোরালোভাবে আকর্ষিত হয় এবং তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান উচ্চ হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের মৌলের তড়িৎ ঋণাত্মকতা নিচে দেখানো হলো :

সারণি ৫.৪ : তড়িৎ ঋণাত্মকতার পরিবর্তন

দ্বিতীয় পর্যায়ে	Li	Be	B	C	N	0	F
	1. 0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
তৃতীয় পর্যায়ে	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0

পর্যায় সারণিতে ডান দিকে অগ্রসর হলে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বেড়ে যায়। পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরমাণুর কেন্দ্রে ধনাত্মক চার্জ বেড়ে যায়, পারমাণবিক ব্যাসার্ধ কম হয়। নিউক্লিয়াস থেকে সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রনের দূরত্ব হ্রাস পায় এবং ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যায়।

একই শ্রেণিতে ওপর থেকে নিচের দিকে অগ্রসর হলে পরমাণুতে নতুন শক্তি স্তর সংযোজন হতে থাকে। পরমাণুর আকার বড় হয় তড়িৎ ঋনাত্মকতা কমতে থাকে। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের শেষ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকায় তড়িৎ ঋণাত্মকতা শূন্য কিন্তু অষ্টক পূর্ণতার জন্য হ্যালোজেনসমূহের শেষ শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন প্রয়োজন হয় বলে এদের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে বেশি। তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বৃদ্ধি পেলে অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায় এবং হ্রাস পেলে ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়। অধাতব মৌলসমূহের ক্ষেত্রে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বৃদ্ধির সঙ্গে রাসায়নিক সক্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। হ্যালোজেন পরিবারের ফ্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে বেশি বলে এর রাসায়নিক সক্রিয়তাও সর্বাধিক।

যোজ্যতা (Valency) **:** পর্যায় সারণিতে মৌলগুলোর যোজ্যতাও পর্যায়ক্রমে আবর্তিত হয়। একই পর্যায়ের মৌলগুলোর যোজ্যতা অক্সিজেনে সংযুক্তি দ্বারা মাপা হলে দেখা যায়, পর্যায় সারণিতে কোনো মৌল যে গ্রুপে অবস্থান করে সেই গ্রুপ সংখ্যাই এর যোজ্যতা হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস মৌলগুলোর যোজ্যতা ০ (শূন্য) কারণ এরা অন্য মৌলের সাথে মিলিত হওয়ার প্রবণতা দেখায় না বললেই চলে। তাই এদের অবস্থান গ্রুপ ০ (শূণ্য) বা 18 তে। পর্যায় সারণির গ্রুপ-1 এ অবস্থিত মৌলের (ক্ষার

ধাতু) সর্ববহি :স্থ স্তরে একটি ইলেকট্রন থাকে। এটি একটি ইলেকট্রন বর্জন করে যোজ্যতা স্তরে অষ্টক বা দুই এর কাঠামো অর্জন করে। গ্রুপ- 1 এ অবস্থিত মৌলের যোজ্যতা 1। এভাবে গ্রুপ ২ এ অবস্থিত মৌলের (মৃৎক্ষার ধাতু) যোজ্যতা ২ এবং গ্রুপ 13 এ অবস্থিত মৌলের যোজ্যতা 3। গ্রুপ 14 তে অবস্থিত মৌলসমূহ সাধারণত 4টি বিজোড় ইলেকট্রন শেয়ার করে অষ্টক পূর্ণ হয়। তাই এদের যোজ্যতা 4। 15 থেকে গ্রুপ-17 (হ্যালোজেন) এর মৌলসমূহের যোজ্যতা যথাক্রমে 3,2,1। পর্যায় সারণিতে মৌলের যোজ্যতা গ্রুপ পরিবর্তনের সাথে পর্যায়ক্রমে 1,2,3,4, 3,2,1, 0 হয়। অর্থাৎ যোজ্যতা একটি পর্যায়বৃত্ত ধর্ম।

সারণি ৫.৫ : যোজ্যতার পরিবর্তন

দ্বিতীয় পর্যায়ে	Li	Be	B	C	N	0	F	Ne
যোজনী	1	2	3	4	3	2	1	0

ধাতব ও অধাতব ধর্ম (Metallic and Non-metallic properties) : কোনো মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বর্জন করে ক্যাটায়নে পরিণত হবার প্রবণতাকে ঐ মৌলের ধাতব ধর্ম বলে। যে মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন বর্জনের প্রবণতা যত বেশি তার ধাতব ধর্ম তত বেশি হয়। পর্যায় সারণিতে বাম দিকে ধাতুসমূহের অবস্থান কিন্তু ডানদিকে বরাবর ওপরের অংশে অধাতব মৌলের অবস্থান। কোনো মৌলের পরমাণুর ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যানায়নে পরিণত হওয়ার সামর্থ্যক অধাতব ধর্ম বলে। এই দুই অংশের মধ্যবর্তী স্থানে উপধাতুগুলো অবস্থান করে।

কোনো পর্যায়ের বাম দিক থেকে ডান দিকে ধাতব ধর্ম হ্রাস পায় এবং অধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়। উপধাতুগুলো অধাতুর মতো ক্ষুদ্রতর পারমাণবিক আকারবিশিষ্ট এবং এদের যোজ্যতা ইলেকট্রনসমূহ মোটামুটি দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। কিন্তু অধিক তাপে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ ইলেকট্রনগুলো শিথিল হয়ে তড়িৎ পরিবহনে সহায়তা করে। পর্যায় সারণিতে যে কোনো গ্রুপে

ওপর থেকে নিচের দিকে মৌলের ধাতব ধর্ম বৃদ্ধি পায়। যে কোনো গ্রুপের ওপর থেকে নিচের দিকে গেলে পরমাণুর গঠনে উচ্চতর প্রধান শক্তি স্তরের আর্বিভাব হয়। ফলে সর্ববহি :স্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনগুলোর মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা বৃদ্ধি পায়। ফলে অধাতু হতে ধাতুর দিকে পরিবর্তনের প্রবণতা বাড়তে থাকে। যেমন গ্রুপ 14 এর প্রথম মৌল C একটি আদর্শ অধাতু। Si একটি অপধাতু, Ge ধাতব গুণসম্পন্ন, পরিশেষে Sn এবং Pb আদর্শ ধাতু। অবস্থান্তর মৌলসমূহ এবং ল্যান্থানাইড ও অ্যাকটিনাইড সারির সমস্ত মৌলই আদর্শ ধাতু এবং এগুলোর তাপ ও তড়িৎ পরিবাহিতা সর্বাধিক।

পর্যায় সারণির গুরুত্ব (Importance of Periodic Table)

- **মৌলসমূহের সুশৃঙ্খল শ্রেণিবিন্যাস ও রসায়ন পাঠ সহজীকরণ :** পর্যায় সারণিতে সমধর্মী মৌলসমূহকে একই শ্রেণি বা উপশ্রেণিতে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে একই শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী একটি বা দুইটি মৌলের রসায়ন জানলে ঐ শ্রেণির অবশিষ্ট মৌলের রসায়ন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। যেমন- প্রথম শ্রেণির ধাতু Na এর ধর্ম জানা থাকলে ঐ শ্রেণির অপরাপর মৌল যথা : Li, K ইত্যাদির ধর্ম মোটামুটি জানা হয়ে যায়।
- **শিল্প রসায়ন ক্ষেত্রে নতুন ইঙ্গিত :** পর্যায় সারণি থেকে বিভিন্ন মৌলের ধর্মাবলি বিচার করে এদের শিল্প রসায়নে ব্যবহার করা যায়। যেমন- ইলেকট্রিক হিটার, টোস্টার ইত্যাদি তৈরিতে Ni ও Cr এর সংকর ব্যবহার করা হয়। কারণ এই সংকর অত্যন্ত নমনীয় কিন্ত উচ্চ গলনাংকবিশিষ্ট হয়।
- **নতুন মৌল আবিষ্কার সমন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী :** মেন্ডেলিফের সময় মাত্র ৬৩টি মৌল আবিষ্কৃত হয়। তিনি তাঁর সারণিতে কয়েকটি শূণ্য স্থান রেখে যান। কারণ ঐ স্থানগুলো পূরণ করার মতো কোনো মৌল তখন আবিষ্কৃত হয়নি। পরবর্তীকালে ঐ মৌল আবিষ্কৃত হলে মেন্ডেলিফের সময়ের সে শূন্যস্থানগুলো পূর্ণ হয় এবং নতুন মৌল সম্পর্কে তার ভবিষ্যদ্বাণী সত্যে পরিণত হয়। বর্তমানে আধুনিক পর্যায় সারণিতে মোট ১১৮টি মৌল স্থান পেয়েছে।
- **পরমাণুর গঠন রহস্য :** পরমাণুর ইলেকট্রন বিন্যাস ও পারমাণবিক ভর ইত্যাদি অনেক তথ্য পর্যায় তালিকা থেকে জানা যায়।

- **সংশয়যুক্ত পারমাণবিক ভরের ভুল সংশোধন : মৌলের পারমাণবিক ওজন = এর তুল্য ভর × যোজনী**। কোনো কোনো মৌলের তুল্য ভর সঠিকভাবে নির্ণয় করা গেলে এদের যোজনী অনেক ক্ষেত্রে নির্ভুলভাবে নির্ণয় করা যায় না। আমরা জানি, প্রত্যেক শ্রেণির মৌলের একটি নির্দিষ্ট যোজনী আছে। কাজেই কথিত মৌলটি পর্যায় তালিকায় ফেলে এর যোজনী জানা যায়। অতঃপর এই যোজনীকে তুল্য ভরের সঙ্গে গুণ করলে ঐ মৌলের সঠিক পারমাণবিক ভর জানা যায়। এভাবে মেন্ডেলিফ কতিপয় সন্দেহজনক পারমাণবিক ভর সংশোধন করেন।
- **নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কার :** সে সময়ে অনাবৃষ্কৃত থাকায় মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণিতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের জন্য কোনো স্থানের বরাদ্দ ছিল না। পরবর্তিতে 1894 এবং 1895 সালে যথাক্রমে আর্গন এবং হিলিয়াম আবিষ্কারের পর পর্যায় সারণিতে নতুনভাবে সৃষ্ট শূন্য গ্রুপে এদের স্থান দেওয়া হয়। এ গ্রুপে বেশ কয়েকটি ফাঁকা স্থান পূরণের জন্য আরও নিষ্ক্রিয় গ্যাসের উপস্থিতির প্রয়োজন হয়। পরবর্তিতে ক্রমান্বয়ে এসব গ্যাস আবিষ্কৃত হয় এবং শূণ্য গ্রুপের ফাঁকা স্থানসমূহও যথাযথভাবে পূরণ করা হয়।

৫.৬ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ও এদের স্থিতিশীলতা

পর্যায় সারণির শূন্য গ্রুপে অবস্থিত ছয়টি মৌল হিলিয়াম (He), নিয়ন (Ne), আরগন (Ar), ক্রিপটন (Kr), জেনন (Xe) ও রেডন (Rn) নিষ্ক্রিয় গ্যাস নামে পরিচিত। কক্ষ উষ্ণতায় এসব মৌল গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। সাধারণ অবস্থায় পরিবেশের কোনো উপাদান বা কোনো মৌলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে না বলে এদেরকে "নিষ্ক্রিয় গ্যাস" বলা হয়। এদের যোজনী শূন্য। অন্যান্য মৌলের তুলনায় এদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যর কারণে এদেরকে অভিজাত গ্যাস (Noble Gas) বলা হয়। নিষ্ক্রিয়গ্যাসসমূহের ইলেকট্রন ক বিন্যাস নিম্নরূপ–

সারণি ৫.৬ : নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস

নিষ্ক্রিয় মৌল	পারমাণবিক সংখ্যা	ইলেকট্রন বিন্যাস	যোজ্যতা ইলেকট্রন
হিলিয়াম	২	$1s^2$	$1s^2$
নিয়ন	১০	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6$	$2s^2\ 2p^6$
আরগন	১৮	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$	$3s^2\ 3p^6$
ক্রিপটন	৩৬	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6$	$4s^2\ 4p^6$
জেনন	৫৪	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6$	$5s^2\ 5p^6$
রেডন	৮৬	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^{10}\ 4s^2\ 4p^6\ 4d^{10}\ 5s^2\ 5p^6\ 5d^{10}\ 6s^2\ 6p^6$	$6s^2\ 6p^6$

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাসের প্রতি লক্ষ করলে দেখা যায় যে, নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের সর্ববহিঃস্থ শক্তিস্তর অনুমোদিত সংখ্যক ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ এবং ইলেকট্রনগুলো বিপরীতমুখী স্পিনসহ জোড়ায় জোড়ায় সজ্জিত। হিলিয়াম ব্যতীত সব নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন বিন্যাস $ns^2\ np^6$ অর্থাৎ আটটি ইলেকট্রন দ্বারা বহিঃস্থ স্তর পূর্ণ বা অষ্টক পূর্ণ বলে পরিচিত। কাজেই এরা রাসায়নিক ভাবে নিষ্ক্রিয়। এ পূর্ণ ইলেকট্রনীয় কাঠামো ভেঙে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অণুকে আয়নে পরিণত করতে উচ্চ আয়নীকরণ শক্তি প্রয়োজন। এত উচ্চ আয়নীকরণ শক্তি অর্জন করা কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সাধারণভাবে সম্ভব নয়।

বহিঃস্থ স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকার কারণে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহ অত্যন্ত স্থিতিশীল, অন্য কোনো মৌলের সাথে সাধারণত ইলেকট্রন আদান-প্রদান করে না অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয় না। এরা এতটাই নিষ্ক্রিয় যে, এ মৌলগুলোর দুটো পরমাণু নিজেদের মধ্যেও যুক্ত হয় না। যার কারণে নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের অণু এক পরমাণুক।

নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ব্যবহার : নিষ্ক্রিয় গ্যাসসমূহের বহুল ব্যবহার রয়েছে যেমন–

১. **হিলিয়াম :** হিলিয়াম খুব হাল্কা ও অদাহ্য হওয়ায় আকাশযান ও বেলুনে ব্যবহার করা হয়। বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার ও টিউব লাইটে ও রেডিও টিউবে এর ব্যবহার আছে। মাটির নিচে পেট্রোলিয়াম স্থানান্তর নির্দেশনায় ট্রেসার (Traser) গ্যাস হিসেবে হিলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

২. **নিয়ন :** রং-বেরং এর আলোকসজ্জা ও বাণিজ্যিক নিয়ন বাতিতে নিয়ন ব্যবহৃত হয়। নিয়ন আলো কুয়াশার মধ্যে দেখা যায় তাই বৈজ্ঞানিকগণ আলোক সংকেতরূপে এই আলো ব্যবহার করে থাকেন। বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্র যেমন ভোল্টমিটার রেকটিফায়ার প্রভৃতিতে রক্ষাকবচ হিসেবে নিয়ন হিলিয়াম মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়।

৩. **আর্গন :** বৈদ্যুতিক বাল্বে আর্গন গ্যাস ব্যবহার করে বাল্বের পরমায়ু অনেকাংশে বর্ধিত করা হয়। ঝালাই-এর কাজে নিষ্ক্রিয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে, গাইগার মুলার কাউন্টারে (তেজষ্ক্রিয়তা মাপার যন্ত্র) এবং গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফিতে আর্গনের ব্যবহার আছে।

৪. **ক্রিপটন :** বৈদ্যুতিক গ্যাস বাল্ব কসমিক রশ্মি পরিমাপে, আয়নীকরণ প্রকোষ্ট (Iodination chamber) প্রভৃতিতে ক্রিপটন ব্যবহৃত হয়। পারমাণবিক দীপ (Atomic lamps) প্রস্তুত করতে ক্রিপটন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া খনি শ্রমিকদের ক্যাপ-ল্যাম্পে ক্রিপটন ব্যবহৃত হয়।

৫. **জেনন :** দ্রুত গতি সম্পন্ন ফ্ল্যাশ লাইটে এর ব্যবহার আছে।

৬. **রেডন :** ক্যান্সার কোষ ধ্বংস করার কাজে এবং রেডিও থেরাপি চিকিৎসায় রেডন ব্যবহৃত হয়।

যোজ্যতা ইলেকট্রন ও যোজনীর ধারণা

পরমাণুর নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ইলেকট্রনসমূহ নির্দিষ্ট কক্ষপথে সর্বদা আবর্তনরত। কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিস্তরে মোট ইলেকট্রন সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজন ইলেকট্রন বা যোজ্যতা ইলেকট্রন বলে। ধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রন সংখ্যা এবং অধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের বিজোড় ইলেকট্রন সংখ্যা মৌলের যোজ্যতা নির্দেশ করে।

কোনো মৌলের অণু মৌলের অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সামর্থ্য বা ক্ষমতাকে যোজ্যতা বলা হয়।

যৌগ গঠনের সময় কোনো মৌলের পরমাণু অপর কোনো মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সময় উভয় পরমাণু শেষের স্তরে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস দ্বিত্ব (ns^2) বা অষ্টকত্ব (sp^6) লাভ করে। অষ্টকত্ব কাঠামো লাভ করার জন্য কোনো মৌলের পরমাণু শেষের স্তরে যতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে বা বহিঃস্তরে থেকে যতটি ইলেকট্রন বর্জন করে অথবা অপর পরমাণু থেকে যতটি অযুগল ইলেকট্রন শেয়ারে অংশগ্রহণ করে সেই সংখ্যাকে ঐ মৌলের যোজনী বলে।

আদর্শ মৌলগুলোর ক্ষেত্রে (representative elements or s and p block elements) যোজ্যতা যোজক ইলেকট্রন সংখ্যার সমান হয় অথবা আট থেকে যোজ্যতা ইলেকট্রনের সংখ্যা বিয়োগ করলে যে মান হয় তার সমান হয়। অবস্থানান্তর মৌলের ক্ষেত্রে একাধিক যোজ্যতা দেখায়। যেমন, পর্যায় সারণির 1 (1A) গ্রুপের মৌলসমূহ বহিঃস্তরের একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে অষ্টকত্ব (sp^6) লাভ করে, তাই এ গ্রুপের মৌলসমূহের যোজনী এক অপরদিকে 15 (VA) গ্রুপের মৌলসমূহের পরমাণুর শেষ স্তরের ইলেকট্রনীয় বিন্যাস স্থিতিশীল কাঠামো (n^2p^6) অর্জনের জন্য তিনটি ইলেকট্রন প্রয়োজন। তাই 15 (VA) গ্রুপের পর মৌলসমূহের যোজনী তিন। নিষ্ক্রিয় গ্যাসের যোজনী শূন্য (০)। অক্সিজেনের সাথে সংযোগের ভিত্তিতে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডানে মৌলের যোজনী ১ থেকে ৭ এ বৃদ্ধি পেতে দেখা যায়। সুতরাং যোজনী একটি পর্যায়বৃত্তিক ধর্ম।

অষ্টক ও দুই এর নিয়ম

যৌগ গঠনের সময় পরমাণুর সর্ব্বহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন অংশগ্রহণ করে। যৌগ গঠনের সময় পরমাণুসমূহ নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদান এবং শেয়ারের মাধ্যমে পরমাণুসমূহের শেষ শক্তিস্তরে স্থিতিশীল ইলেকট্রন বিন্যাস দ্বিত্ব (ns^2) বা অষ্টকত্ব (sp^6) লাভ করে। পরমাণুর সর্ববহিঃস্তরে দুইটি ও আটটি ইলেকট্রন লাভ করাকে অষ্টক ও দুই এর নিয়ম বলা হয়। যেমন- হাইড্রোজেনের যোজ্যতা স্তরে একটিমাত্র ইলেকট্রন রয়েছে। হাইড্রোজেন পরমাণু যৌগের অণু গঠনের সময় এটি এর নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইবে, যার জন্য যৌগ গঠনের সময় হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ার করে। আবার সোডিয়ামের সর্ববহিঃস্তরে ৭ টি ইলেকট্রন রয়েছে। কাজেই যৌগ গঠনের সময় সোডিয়াম একটি (১) ইলেকট্রন গ্রহণ বা শেয়ার করে অষ্টক পূর্ণ করতে চাইবে।

$Na\ (11)_{11} \rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ \mathbf{3s^1}$

$Cl\ (17) \rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ \mathbf{3s^2}\ \ \mathbf{3p^5}$

৫.৭ রাসায়নিক বন্ধন (Chemical bond)

পৃথিবীর সমস্ত পদার্থের অণু গঠিত হয় বন্ধন গঠনের মাধ্যমে। পারমাণবিক অবস্থায় সকল মৌলই অস্থিতিশীল অবস্থায় থাকে। কিন্তু বন্ধন গঠনের মাধ্যমে অণু গঠিত হলে স্থিতিশীল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অণুসমূহের মধ্যে পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণ বল দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে দুটি পরমাণুর বহিঃস্তরের এক বা একাধিক ইলেকট্রন আদান প্রদান বা শেয়ারকরণ করে উভয় পরমাণুই নিকটবর্তী নিষ্ক্রিয় গ্যাসের দ্বিত্ব বা অষ্টক কাঠামো অর্জন করলে পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে সৃষ্ট যে শক্তি তাদের যুক্ত করে অণু গঠন করে তাকে রাসায়নিক বন্ধন বলা যায়। ইলেকট্রনের প্রকৃতি অনুসারে রাসায়নিক বন্ধন প্রধানত তিন প্রকার। যথা :

১। আয়নিক বা তড়িৎযোজী বন্ধন (Ionic Bond)

২। সমযোজী বা সহযোজী বন্ধন (Covalent Bond)

৩। সন্নিবেশ বা সন্নিবেশ সমযোজী বন্ধন (Co–ordination Covalent Bond)

এছাড়া আরও কয়েক প্রকার বন্ধন রয়েছে, যথা :

১। ধাতব বন্ধন (Metalic Bond)

২। হাইড্রোজেন বন্ধন (Hydrogen Bond)

এছাড়া অণুসমূহের মধ্যে এক প্রকার দুর্বল আকর্ষণ বল রয়েছে যা ভ্যানডার ওয়ালস বল (Vander Waals force) নামে পরিচিত।

আয়নিক বন্ধন গঠন প্রক্রিয়া : ১৯১৬ সালে বিজ্ঞানী কোজেল (W. Kossel) ধাতু ও অধাতুর মধ্যে গঠিত আয়নিক বন্ধন সম্পর্কে ধারণা দেন। দুটি পরমাণু বা মূলকের রাসায়নিক সংযোগের সময় একটি পরমাণু বা মূলকে হতে এক বা একাধিক ইলেকট্রন অপর পরমাণুতে বা মূলকে স্থানান্তরিত হয়ে যথাক্রমে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে উভয়ের মধ্যে যে রাসায়নিক বন্ধন উৎপন্ন হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে । আয়নিক বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত যৌগকে আয়নিক যৌগ বলা হয়। যেমন- সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) একটি আয়নিক যৌগ। পরমাণুদ্বয়ের ইলেকট্রন বিন্যাস নিম্নরূপ-

$Na\ (11) \rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ \mathbf{3s^1}$
$Cl\ (17) \rightarrow 1s^2\ \ 2s^2\ \ 2p^6\ \ \mathbf{3s^2}\ \ \mathbf{3p^5}$

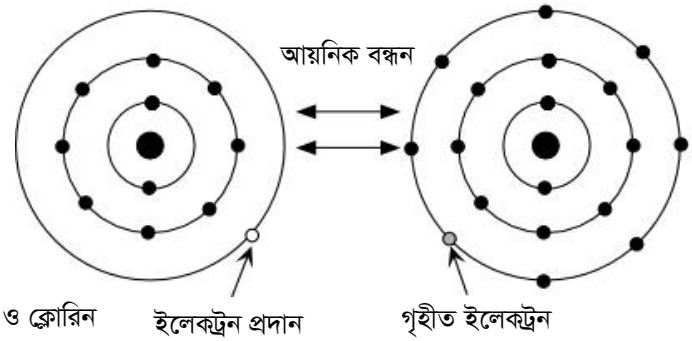

ইলেকট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায় যে, সোডিয়াম (Na) ও ক্লোরিন (Cl) এর বাইরের শেলে যথাক্রমে একটি ($\mathbf{3s^1}$) ও সাতটি ($\mathbf{3s^2 3p^5}$) ইলেকট্রন রয়েছে। সুতরাং সোডিয়াম (Na) তার সর্ববহিঃস্থ স্তরের ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়ন Na^+ ও ক্লোরিন (Cl) ত্যাগকৃত ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্লোরাইড Cl^- আয়নে পরিণত হয়। উভয় পরমাণুতাদের নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস যথাক্রমে নিয়ন (Ne- 2,8) ও আর্গনের (Ar- 2,8,8) ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে স্থিতিশীল হয়। দুই বিপরীত চার্জযুক্ত সোডিয়াম আয়ন (Na^+) ও ক্লোরিন (Cl^-)-এর মধ্যে স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণের ফলে আয়নিক বন্ধন গঠিত হয় এবং সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl যৌগ উৎপন্ন করে।

আয়নিক বন্ধনের শর্ত

১। আয়নিক যৌগ গঠনে অংশগ্রহণকারী পরমাণুদ্বয়ের সাধারণভাবে একটি তড়িৎ ধনাত্মক ধাতব পরমাণু ও অন্যটি তড়িৎ ঋণাত্মক। অধাতব পরমাণু হওয়া প্রয়োজন।

২। বন্ধন গঠনে সক্ষম পরমাণুসমূহের একটির আয়নীকরণ শক্তি কম হওয়া প্রয়োজন। যাতে সামান্য শক্তি প্রয়োগেই এর যোজ্যতা স্তর থেকে ইলেকট্রন বের হয়ে আসতে পারে।

৩। বন্ধন গঠনে সক্ষম অপর পরমাণুর ইলেকট্রন আসক্তি অধিক হওয়া প্রয়োজন যাতে সেটি অতি সহজে ইলেকট্রন গ্রহণ করে নিতে পারে।

৪। ল্যাটিস শক্তির মান যত বেশি হয় আয়নিক যৌগের স্থিতিশীলতা তত বাড়ে । স্থির বিদ্যুৎ আকর্ষণ বলের প্রভাবে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নগুলো ১ মোল কেলাসের জালি ল্যাটিস গঠন করতে যে পরিমাণ শক্তি বের হয় তাকে সংশ্লিষ্ট কেলাসের ল্যাটিস শক্তি বলা হয়। উল্লেখ্য যে, বিপরীত আয়নসমূহের মধ্যে আকর্ষণ বল বেশি হওয়ায় সৃষ্ট আয়নিক যৌগ কঠিন অবস্থায় থাকে।

আয়নিক বন্ধনের সীমাবদ্ধতা :

১। আয়নিক বন্ধন শুধুমাত্র একটি ধাতু এবং একটি অধাতুর মধ্যে সম্ভব। কিন্তু সব ধাতুর সাথে সব অধাতুর আয়নিক বন্ধন সৃষ্টি হয় না। সাধারণত প্রতিনিধিত্বমূলক ধাতব 1 এবং 2 শ্রেণির মৌলসমূহ এবং 11 এবং 12 শ্রেণির ভারী মৌলসমূহ আয়নিক যৌগ সৃষ্টি করে। অধাতব মৌলসমূহের মধ্যে 17 শ্রেণির মৌলসমূহ, অক্সিজেন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সালফারও আয়নিক যৌগ গঠন করে।

২। কোনো বন্ধনই ১০০% আয়নিক হয় না। প্রায়ক্ষেত্রে আংশিক আয়নিক আংশিক সমযোজী হয়। যেমন- $AlCl_3$-কে সাধারণভাবে আয়নিক যৌগ হিসেবে চিহ্নিত করা হলেও এতে খুবই কম পরিমাণ আয়নিক ধর্ম রয়েছে। এর স্ফুটনাংক মাত্র ১৭৮° সে ।

৩। অণুর ধনাত্মক আয়নের আয়নীকরন শক্তি E-এর পার্থক্য খুবই কম হলে বন্ধন আয়নিক হবে। পার্থক্য বেশি হলে সমযোজী বন্ধন হবে।

আয়নিক যৌগের ধর্ম যা আয়নিক বন্ধনের ধারণা সমর্থন করে

১। **পোলারিটি (Polarity) :** আয়নিক যৌগসমূহ পোলার বা মেরুক প্রকৃতির। অর্থাৎ এদের অণুতে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক দুটো পোল বা মেরু রয়েছে। যেমন- $Na^+ Cl^-$।

২। **তড়িৎ পরিবাহিতা (Electrical Conductivity) :** কঠিন অবস্থায় আয়নিক যৌগে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে বলে এরা কঠিন অবস্থায় বিদ্যুৎ অপরিবাহী। কিন্তু গলিত অবস্থায় এবং দ্রবণে আয়নসমূহ ইতঃস্তত পরিভ্রমণ করে বলে তখন এরা বিদ্যুত পরিবহন করে।

৩। **দ্রাব্যতা (Solubility) :** আয়নিক যৌগ সাধারণত পোলার দ্রাবকে দ্রবণীয় এবং অপোলার দ্রাবকে প্রায় অদ্রবণীয়। পোলার দ্রাবকে দ্রবীভূত হওয়ার সময় পোলার দ্রাবকের ঋণাত্মক মেরু ধনাত্মক আয়নের দিকে এবং ধনাত্মক মেরু ঋণাত্মক আয়নের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে আয়নসমূহ দ্রাবক অণু দ্বারা আকর্ষিত হয় এবং স্ফটিক থেকে দ্রবণে চলে আসে। সুতরাং আয়নিক যৌগে আয়নসমূহ পুরোপুরি যুক্ত থাকে না, দ্রাবক অণুর সাথে সংযুক্ত থাকে। আয়নের সাথে পোলার দ্রাবকের অণুসমূহের যুক্ত হওয়াকে সলভেশন (Solvation) বলে। আর আয়নগুলোকে সলভেটেড (Solvated) বলা হয়।

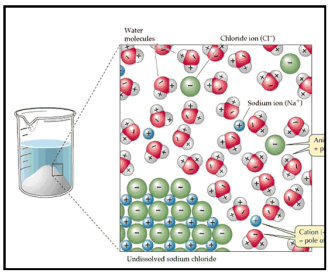

আয়নিক যৌগের দ্রাব্যতা

৪। **কেলাস গঠন বা স্ফটিক (Crystal Structure) :** সকল আয়নিক যৌগ কঠিন অবস্থায় স্ফটিককারে অবস্থান করে। যেমন, NaCl স্ফটিকে বিপরীত আধানযুক্ত (Na^+) ও (Cl^-) আয়ন সুষমভাবে ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে ত্রিমাত্রিক আকার প্রাপ্ত হয়। এই আকারকে স্ফটিক ল্যাটিস (Crystal Latice) বলে। NaCl-এর স্ফটিকে প্রতিটি Na^+ আয়ন অষ্টতলকীয়ভাবে ছয়টি সমদূরত্বে অবস্থানকারী Cl^- আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। অণুরূপে প্রতিটি Cl^- আয়ন অষ্টতলকীয়ভাবে ছয়টি সম-দূরত্বে অবস্থানকারী Na^+ আয়ন দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে। অন্যান্য আয়নিক যৌগের গঠন NaCl-এর মতো না হলেও এদের গঠন বিশেষ জ্যামিতিক আকৃতির হয়। রাসায়নিক সংকেতে ক্যাটায়ন ও আনায়নের সংখ্যার অনুপাত এবং তাদের আয়ন ব্যাসার্ধের অনুপাতের উপরেই আকৃতি নির্ভর করে।

৫। **সমরূপতা (Isomorphism) :** একইরূপ ইলেকট্রনিক গঠন বিশিষ্ট আয়নিক যৌগের স্ফটিকের গঠন ও একইরূপ হয়। একে সমরূপতা ((Isomorphism) বলে। যেমন– NaF ও MgO পরস্পর সমরূপী। এদের ইলেকট্রনিক গঠনে সাদৃশ্য দেখা যায়–

NaF Na^+ $1s^2 2s^2 2p^6$ F^- $1s^2 2s^2 2p^6$

MgO Mg^{+2} $1s^2 2s^2 2p^6$ O^{-2} $1s^2 2s^2 2p^6$

৬। **সক্রিয়তা (Activity) :** আয়নিক যৌগের আয়নগুলো জলীয় দ্রবণে বিক্ষিপ্ত হয়ে সমস্ত দ্রবণে ছড়িয়ে থাকে। ফলে জলীয় দ্রাবকে দু'টি আয়নিক যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়া এত দ্রুত সম্পন্ন হয় যে, তার গতি নির্ণয় করা বেশ কঠিন । যেমন, অম্লীয় $CuSO_4$ দ্রবণে H_2S গ্যাস চালনা করলে সঙ্গে সঙ্গে কালো বর্ণের CuS অধঃক্ষিপ্ত হয় ।

$$CuSO_4 + H_2S = CuS + H_2SO_4$$

৭। **ভঙ্গুরতা (Brittleness) :** আয়নিক স্ফটিকগুলো ভঙ্গুর অর্থাৎ এদের বিকৃত করতে গেলে এরা ভেঙে যায়। যেমন NaCl-এর স্ফটিককে বল প্রয়োগে বিকৃত করার চেষ্টা করা হলে এক সময় আয়নসমূহের একটি স্তর অন্য একটি স্তরের তুলনায় এক একক দূরত্ব অতিক্রম করবে। এ অবস্থায় সমধর্মী আয়নসমূহ পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ফলে এদের মধ্যে বিকর্ষণের সৃষ্টি হয় এবং স্তর দুটি পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে যায়। এ কারণেই আয়নিক যৌগের স্ফটিকসমূহ ভঙ্গুর হয়।

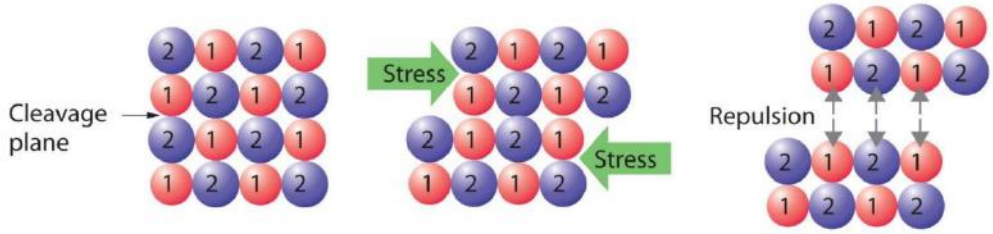

চিত্র ৫.৭ : আয়নিক যৌগের ভঙ্গুরতা

৮। **গলনাঙ্ক, স্ফুটনাংক ও উদ্বায়িতা (Melting point, Boiling Point & Volatility)**
আয়নিক যৌগের ল্যাটিসে বিপরীত আধানযুক্ত আয়নসমূহ পরস্পরের প্রতি দৃঢ় ইলেকট্রোস্ট্যাটিক আকর্ষণবল দ্বারা আকৃষ্ট থাকায় এদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে অনেক বেশি তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। তাই এদের গলনাঙ্কক ও স্ফুটনাংক উচ্চতর হয়। যেমন– এর গলনাংক ও স্ফুটনাংক যথাক্রমে ৮০১° সে ও ১০০৩° সে। আয়নিক যৌগের স্ফুটনাংক উচ্চ হওয়ার অর্থ এসব যৌগ অনুদ্বায়ী। যেমন– NaCl ও MgO প্রভৃতি আয়নিক যৌগকে বহুদিন একস্থানে রেখে দিলেও বাষ্পীভূত হয় না।

৫.৮ সমযোজী বন্ধন ও ধাতব বন্ধন

সমযোজী বন্ধন সম্পর্কে বিজ্ঞানী জি এন লুই (G. N. Lewis) ১৯১৬ সালে সর্বপ্রথম অভিমত ব্যক্ত করেন । রাসায়নিক সংযোগের সময় যদি দুটি একই বা ভিন্ন মৌলের পরমাণু এক বা একাধিক ইলেকট্রন সরবরাহ করে এক বা একাধিক ইলেকট্রন জোড় সৃষ্টি করে এবং এই ইলেকট্রন জোড় উভয় পরমাণু সমানভাবে শেয়ার করে এবং উভয় পরমাণুই নিষ্ক্রিয় গ্যাসের ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে রাসায়নিক বন্ধন গঠন করে তবে তাকে সমযোজী বন্ধন (Covalent Bond) বলা হয়। সমযোজী বন্ধন ইলেকট্রন জোড় দ্বারা গঠিত হয় বলে একে ইলেকট্রন জোড় বন্ধন ও বলা হয়। ইলেকট্রন শেয়ারের সংখ্যার ওপর ভিত্তি করে সমযোজী বন্ধন তিন প্রকার :

১। একক বন্ধন
২। দ্বি বন্ধন
৩। ত্রি বন্ধন

১। একক বন্ধন : অণু গঠনের সময় দুটি পরমাণুর প্রত্যেকে একটি করে ইলেকট্রন সরবরাহ করে যদি একজোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করে তবে যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় তাকে একক বন্ধন বলে। যেমন–

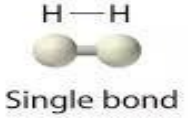

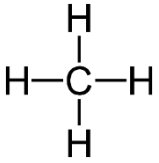

২। দ্বি-বন্ধন : অণু গঠনের সময় দুটি পরমাণু বহিঃস্তর এ অষ্টক পূর্ণতার জন্য যদি প্রত্যেকে দুটি করে ইলেকট্রন সরবরাহ করে দুইজোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করে তবে যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় তাকে দ্বি-বন্ধন বলে। যেমন - অক্সিজেন অণু।

৩। ত্রি-বন্ধন : অণু গঠনের সময় দুটি পরমাণু বহিঃস্তর এ অস্টক পূর্ণতার জন্য যদি প্রত্যেকে তিনটি করে ইলেকট্রন সরবরাহ করে তিন জোড়া ইলেকট্রন শেয়ার করে তবে যে সমযোজী বন্ধন গঠিত হয় তাকে ত্রি-বন্ধন বলে। যেমন– নাইট্রোজেন অণু

অণুতে সমযোজী বন্ধন গঠন দুটি তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়।

১। যোজ্যতা বন্ধন তত্ত্ব (Valence bond theory) ও

২। আণবিক অর্বিটাল তত্ত্ব (Molecular orbital theory)

তত্ত্ব দুটির মূল উদ্দেশ্য হলো ইলেকট্রন তরঙ্গ প্রকৃতি বিবেচনা করে বন্ধন গঠনের ব্যাখ্যা করা। উদ্দেশ্য একই হলেও এদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে।

সিগমা বন্ধন (Sigma Bond) : সমযোজী বন্ধন সৃষ্টির সময় যখন দুটি পরমাণু দুটি অরবিটাল পরস্পরের সাথে সামনাসামনি অধিক্রমণ করে তখন তাকে সিগমা বন্ধন বলা হয়। দুটি s-অরবিটাল, একটি s ও একটি p অরবিটাল এবং দুটো p-অরবিটাল এর মধ্যে এ বন্ধন সৃষ্টি হতে পারে ।

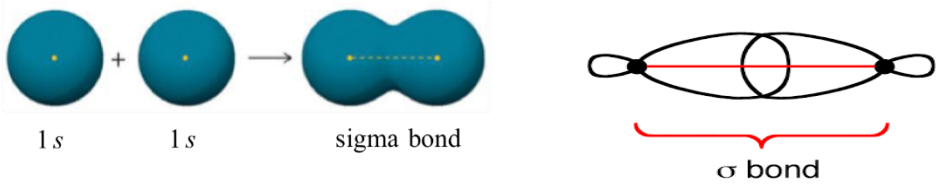

চিত্র ৫.৮ : সিগমা বন্ধন

সিগমা বন্ধনের বৈশিষ্ট্য

- অধিক্রমণের বিস্তার অপেক্ষাকৃতভাবে বেশি বলে সিগমা বন্ধন দৃঢ় হয়।
- সিগমা বন্ধনে অংশগ্রহণকারী সিগমা ইলেকট্রনগুলো কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট অঞ্চলে নির্দিষ্ট থাকে।
- কোনো অণুর জ্যামিতিক গঠন অণুর মধ্যে উপস্থিত সিগমা বন্ধনের সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত হয়।

পাই বন্ধন (Pie Bond) : সমযোজী বন্ধন সৃষ্টির সময় দুটি পরমাণুর দুটি অরবিটালের পার্শ্ব অধিক্রমণের ফলে সৃষ্ট বন্ধনকে পাই (π) বন্ধন বলা হয়।

পাই বন্ধনের বৈশিষ্ট্য

- দুইটি p অরবিটালের পাশাপাশি অধিক্রমণের ফলে π-বন্ধনের সৃষ্টি হয় ।
- পাশাপাশি অধিক্রমণের বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম বলে π বন্ধন দুর্বল হয় ।
- π বন্ধনের অংশগ্রহণকারী π ইলেকট্রনগুলো সবসময় গতিশীল হয় ।
- অণুর জ্যামিতিক গঠন নির্মাণে π বন্ধনের তেমন কোনো ভূমিকা থাকে না ।
- পাই (π) বন্ধনের একক কোনো অস্তিত্ব নেই, পাই বন্ধন সিগমা বন্ধনের সাথে সংযুক্ত থাকে।

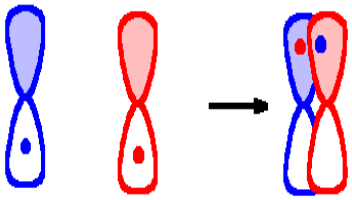

চিত্র ৫.৯ : পাই বন্ধন

সমযোজী যৌগসমূহের সাধারণ ধর্মাবলি : সমযোজী যৌগসমূহের ধর্মাবলি সাধারণত এদের আণবিক ভর, গঠন প্রভৃতির উপর নির্ভর করে সমযোজী যৌগসমূহের সাধারণত নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় :

১। **গলনাংক, স্ফুটনাংক ও উদ্বায়িতা :** সমযোজী যৌগসমূহের অণুগুলো অমেরুক হওয়ায় এদের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ বল খুব কম থাকে। ফলে এদের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক বেশ কম। যেমন, হাইড্রোজেনের গলনাঙ্ক ১২৯° সে. ও স্ফুটনাঙ্ক ২৫৩° সে.। যেহেতু সমযোজী যৌগের গলনাঙ্ক খুব কম তাই এরা উদ্বায়ী (volatile)।

২। **পোলারিটি ও মেরুত্ব :** ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে সমযোজী বন্ধন তৈরি হয় বলে বন্ধন গঠনের পরও যৌগগুলো তড়িৎ নিরপেক্ষ থাকে। ফলে সমযোজী যৌগ সাধারণত নন-পোলার বা অমেরুক প্রকৃতির হয়।

৩। **তড়িৎ পরিবাহিতা :** সমযোজী যৌগসমূহ দ্রবণে বা গলিত অবস্থায় আয়নিত হয় না বলে এরা বিদ্যুত পরিবহন করে না। এরা ইলেকট্রন শেয়ার করে যৌগ গঠন করে বলে আয়নিত হয় না।

৪। **দ্রাব্যতা :** সমযোজী যৌগসমূহ অমেরুক বলে এরা সাধারণত অমেরুক জৈব দ্রাবক, যেমন– বেনজিন, ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদিতে দ্রবণীয়। এসব যৌগ পানিতে খুব অল্প মাত্রায় দ্রবণীয়। তবে কতকগুলো যৌগ পানির সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া করার জন্য পানিতে দ্রবীভূত হয়। যেমন–

$$NH_3 + H_2O \longrightarrow NH_4^+ + OH^-$$

ধাতব বন্ধন (Metallic Bond) : ধাতুর কঠিন কেলাস গঠনের সময় পরমাণুসমূহ পরস্পরের সাথে যে আকর্ষণ বল দ্বারা বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন বলা হয়। ধাতব বন্ধনের কয়েকটি মতবাদ প্রচলিত আছে। এর মধ্যে ইলেকট্রন সমুদ্র মতবাদ সর্বাধিক প্রচলিত। ধাতব পরমাণুতে এগুলোর যোজ্যতা ইলেকট্রন দুর্বলভাবে নিউক্লিয়াসের সাথে আবদ্ধ থাকায় এরা ধাতব কেলাসের সকল পরমাণুতেই বিচরণক্ষম। ফলে প্রত্যেক ধাতব পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হয় যা পারমাণবিক কোর নামে পরিচিত।

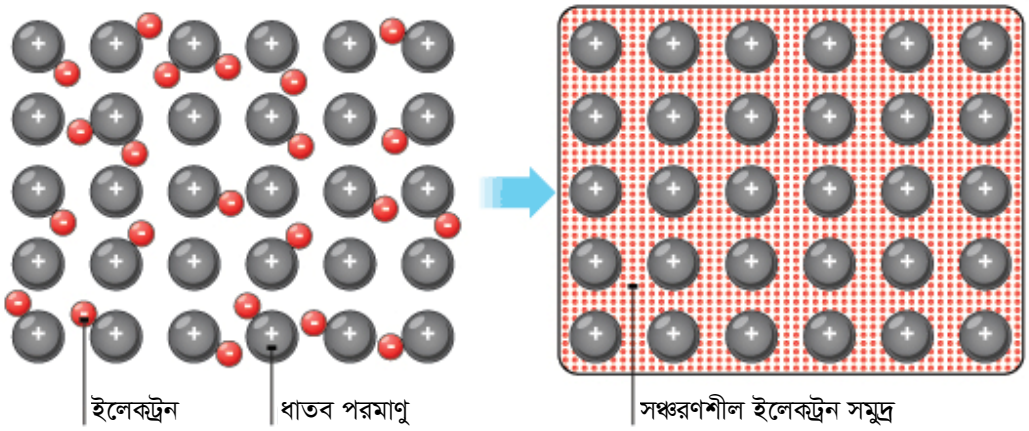

চিত্র ৫.১০ : ধাতব বন্ধন

সুতরাং একটি ধাতু যেন অসংখ্য ধনাত্মক পারমাণবিক কোর এর সমষ্টি এবং যেন সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন সমুদ্রে নিমজ্জিত। ইলেকট্রনগুলো এভাবে বহুসংখ্যক পরমাণুকে অনুরণনের মাধ্যমে বেষ্টন করে থাকে। সঞ্চরণশীল ইলেকট্রনের জন্য ধাতব পদার্থসমূহ বিশেষ ধাতব ধর্মাবলি প্রদর্শন করে।

ধাতুর বিশেষ ধর্মাবলি (Characteristic Properties of Metals)

- **ধাতব ঔজ্জ্বল্য :** পরিচ্ছন্ন ও বিশুদ্ধ ধাতুর পৃষ্ঠে পতিত দৃশ্যমান আলোকরশ্মি সম্পূর্ণ প্রতিফলিত হওয়ার কারণে ধাতুর ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়। একমাত্র তামা ও সোনা ধাতু দুটি দৃশ্যমান আলোর কিছু অংশ শোষণ করে বলে এরা তামাটে ও সোনালী বর্ণের হয়।

- **উচ্চ তড়িৎ ও তাপীয় পরিবাহিতা :** অতি নগণ্য ভর বিশিষ্ট ইলেকট্রনের দ্রুতগতির ফলে ধাতুর মধ্য দিয়ে তড়িৎ আধান দ্রুত স্থানান্তরিত হতে পারে। ফলে ধাতুর তড়িৎ পরিবাহিতা খুব উচ্চ হয়। ইলেকট্রনের স্থানান্তরিত গতি ও ধনাত্মক ধাতব আয়নের কম্পন গতির দ্বারা ধাতব ল্যাটিসের মধ্যে দিয়ে তাপ শক্তি দ্রুত চলাচল করতে পারে, ফলে ধাতুর তাপ পরিবাহিতাও উচ্চ হয়।
- **নমনীয়তা বা ঘাত সহনশীলতা :** ধাতব বন্ধনে গতিশীল ইলেকট্রন থাকার জন্য ধাতুসমূহকে পিটিয়ে পাত করা যায়। ধাতুর এ ধর্মকে নমনীয়তা বা ঘাত সহনশীলতা বলা হয়। নমনীয়তার জন্য ধাতু সোনা দিয়ে বিভিন্ন সূক্ষ্ম গহনা তৈরি করা হয়।
- **সহজে ইলেকট্রন বর্জন ক্ষমতা :** বিভিন্ন ধাতুকে উত্তপ্ত করলে তা থেকে অতি সহজেই ইলেকট্রন বের হয়ে আসে। একে তাপায়নিক নিঃসরণ (Thermonic emmission of Electron) বলা হয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. মেন্ডেলিফের পর্যায় সূত্রটি কী?
২. আধুনিক পর্যায় সারণির মূলভিত্তি কী?
৩. মৌলের পর্যায়বৃত্ততা বলতে কী বোঝায়?
৪. পর্যায় সারণিতে নিষ্ক্রিয় গ্যাসের অবস্থান কোথায়?
৫. আধুনিক পর্যায় সারণিতে মোট কতটি শ্রেণি এবং পর্যায় রয়েছে?
৬. ২ d অরবিটাল সম্ভব নয় কেন?
৭. পটাসিয়ামের ১৯ তম ইলেকট্রনটি ৩ F উপস্তরে না গিয়ে 4f উপস্তরে যায় কেন?
৮. 3f উপস্তরের জন্য হুন্ডের নিয়ম প্রযোজ্য নয় কেন?
৯. PCl_5 গঠিত হলেও NCl_5 গঠিত হয় না কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১. পর্যায় সারণি বলতে কী বুঝায়? আধুনিক পর্যায় সারণির বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।
২. পর্যায় সারণির মূলভিত্তি যুক্তিসহ ব্যাখ্যা করুন।
৩. ইলেকট্রন বিন্যাস হতে কীভাবে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবস্থান নির্ণয় করা যায় তা উদাহরণসহ লিখুন ।
৪. মেন্ডেলিফের পর্যায় সারণির সীমাবদ্ধতা বা ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করুন।
৫. পর্যায় সারণির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৬. আয়নিক বন্ধন খুব শক্তিশালী হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করুন।
৭. যে পরমাণুর মডেলে পরমাণুর বর্ণালী ব্যাখ্যা করা সেই মডেলের স্বীকার্যসমূহ বর্ণনা করুন।
৮. তেজষ্ক্রিয়তা কাকে বলে? তেজষ্ক্রিয় আইসোটোপসমূহের ব্যবহার লিখুন।

ইউনিট ৬ : রাসায়নিক গণনা

রসায়ন প্রকৃতিবিজ্ঞানের এমন একটি বিষয় যাতে তত্ত্বীয় জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে পরীক্ষাগারে বিভিন্ন প্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে ব্যবহারিক কাজ সম্পন্ন করতে হয়। আর এসকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার হিসাব নিকাশ করার প্রয়োজন হয়। পরীক্ষাগারে এরূপ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করতে হলে কতকগুলো বিষয় জানতে হবে, যেমন– এই পরীক্ষা করার জন্য কী কী বিকারক প্রয়োজন? এসকল বিকারক কী পরিমাণ প্রয়োজন? এই বিক্রিয়ায় কী কী উৎপাদ উৎপন্ন হবে? এবং উৎপন্ন উৎপাদগুলো কী পরিমাণে উৎপন্ন হবে? এসকল হিসাব করার যোগ্যতা আর্জন করার জন্য শিক্ষার্থীদের রসায়নের কতকগুলো মৌলিক ধারণা ও বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক গণনা পদ্ধতি জানা প্রয়োজন। এজন্য মাধ্যমিক পর্যায়ের শিখার্থীদের গণনা পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার জন্য এ অধ্যায়ে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলো আলোচনা করা হলো–

৬.১ প্রতীক ও সংকেত

৬.২ রাসায়নিক সমীকরণ

৬.৩ যৌগের শতকরা সংযুক্তি থেকে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয়

৬.৪ মোল (mole) এর ধারণা

৬.৫ বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতি

৬.১ প্রতীক ও সংকেত

রসায়নবিদগণ রাসায়নিক পরিবর্তনকে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পরমাণু , অণু ও যৌগসমূগকে বিভিন্ন প্রকার সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে প্রকাশ করে থাকেন। মৌলিক পদার্থের পরমাণুকে প্রকাশের জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে প্রতীক বলা হয়। আবার মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুকে প্রকাশ করার জন্য যে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে সংকেত বলা হয়।

প্রতীক : The International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)-এর নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে কোনো মৌলিক পদার্থের ইংরেজি নামের বানানের প্রথম বর্ণ বা প্রথম দুইটি বর্ণ বা প্রথম বর্ণসহ দুইটি বর্ণ দিয়ে তার প্রতীক লিখা হয়। প্রতীকের প্রথম বর্ণ অবশ্যই বড় হাতের হতে হবে এবং পরের বর্ণটি ছোট হাতের হবে। যেমন- ক্যালিফোর্নিয়ামের ইংরেজি বানান 'Californium' এর প্রথম বর্ণ ও পরবর্তি একটি বর্ণ নিয়ে এর প্রতীক 'Cf ' লিখা হয়। আবার ইউরেনিয়ামের ইংরেজি বানান 'Uranium' এর প্রথম বর্ণ ও পরবর্তি একটি বর্ণ নিয়ে এর প্রতীক 'Ur' লিখা হয়। **IUPAC** গঠনের পূর্বেই অনেক মৌলের নামকরণ ও প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছে। এজন্য অনেক মৌলিক পদার্থের প্রতীক ইংরেজি নামের পরিবর্তে ল্যটিন , গ্রিক বা অন্য কোনো ভাষার নামের ওপর ভিত্তি করে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে সকল ক্ষেত্রেই ইংরেজি বর্ণ দিয়ে প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছে। নিচে ইংরেজি ছাড়া অন্য ভাষার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত কিছু মৌলের প্রতীক ও নাম তালিকা আকারে উল্লেখ করা হলো :

ল্যটিন নামের উপর ভিত্তি করে দেওয়া কিছু মৌলের প্রতীক নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো

সারণি ৬.১ : মৌলের প্রতীক তালিকা

মৌলের প্রতীক	মৌলের ইংরেজি নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম
Na	Sodium	Natrium
K	Potassium	Kalium
Fe	Iron	Ferrum
Cu	Copper	Cuprum

মৌলের প্রতীক	মৌলের ইংরেজি নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম
Ag	Silver	Argentum
Sn	Tin	Stannum
Sb	Antimony	Stibium
Au	Gold	Aurum
Pb	Lead	Plumbum
Al	Aluminum	Alumen
Hg	Mercury	ল্যাটিন নাম Hydrargyrum যা গ্রিক নাম থেকে নেওয়া Hydrargyros

গ্রিক নামের ওপর ভিত্তি করে দেওয়া কিছু মৌলের প্রতীক নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হলো

মৌলের প্রতীক	মৌলের ইংরেজি নাম	মৌলের গ্রিক নাম
Ac	Actinium	Aktinos
Ar	Argon	Argon
At	Astatine	Astatos
Ba	Barium	Barys
H	Hydrogen	Hydrogen
He	Helium	Helios
Li	Lithium	Lithos
Se	Selenium	Selene
Br	Bromine	Bromos
Kr	Krypton	Kryptos

অন্যান্য ভাষা থেকে নির্ধারিত মৌলের নাম ও প্রতীক

মৌলের প্রতীক	মৌলের ইংরেজি নাম	মৌলের নামের উৎস
Zr	**Zirconium**	Arabian *Zargun*, meaning *gold-coloured*
W	**Tungsten**	Swedish *tung sten*, meaning *heavy stone*; W from *wolfram*, the old name of the tungstenn mineral wolframite
Ni	**Nickel**	German *kupfernickel*, meaning *devil's copper* or *St. Nicholas' copper*
Zn	Zinc	German *zink*

সংকেত : কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের অণুকে যে সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা প্রকাশ করা হয় তাকে সংকেত বলা হয়। নিষ্ক্রিয় গ্যাস ব্যতীত অন্য সকল মৌলিক গ্যাস দ্বি-পারমাণবিক অণু গঠন করে থাকে। এ সকল গ্যসের অণুর সংকেত লিখার জন্য প্রথমে উক্ত গ্যসের প্রতীক লিখতে হয় এবং পরে প্রতীকের ডান দিকে নিচে অণুকে উপস্থিত পরমাণু সংখ্যা ২ লিখতে হয়। যেমন– হাইড্রোজেন গ্যাসের সংকেত হচ্ছে H_2 এবং নাইট্রোজেন গ্যাসের সংকেত হচ্ছে N_2 । সাধারণত দুইভাবে অণুর সংকেত লিখার প্রচলন রয়েছে, যথা (ক) স্থূল সংকেত ও (খ) আণবিক সংকেত।

স্থূল সংকেত : কোনো যৌগের অণুতে উপস্থিত সকল মৌলের পরমাণুসমূহ যে ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে থাকে, যদি ঐ সকল মৌলসমূহের প্রতীক সেই একই অনুপাত সহযোগে প্রকাশ কর হয় তবে তাকে ঐ যৌগের স্থূল সংকেত বলা হয়।

যেমন, মিথেন এর অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন মৌল দুটির পরমাণুসমূহের ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে 1 : 4। সুতরাং মিথেন-এর স্থূল সংকেত হলো CH_4।

আণবিক সংকেত : কোনো যৌগের অণুতে উপস্থিত প্রতিটি মৌলের পরমাণুর প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ করে প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করলে তাকে ঐ যৌগের আণবিক সংকেত বলা হয়।

যেমন, ইথেন এর অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন প্রকৃত সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ৬। সুতরাং ইথেনের আণবিক সংকেত হলো C_2H_6। উল্লেখ্য, কিছু কিছু যৌগের ক্ষেত্রে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত অভিন্ন হয়। যেমন– পানি (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4) ইত্যাদি।

সাধারণভাবে যৌগিক পদার্থের অণু দুইভাবে গঠিত হতে পারে যথা : (১) দুইটি ভিন্ন মৌলের নিরপেক্ষ পরমাণু যুক্ত হয়ে আথবা (২) দুইটি ভিন্ন প্রকৃতির আধান যুক্ত আয়ন যুক্ত হয়ে অণু যৌগিক পদার্থের গঠন করতে পারে। আণবিক সংকেত লিখার নিয়ম নিম্নে দেওয়া হলো :

(১) নিরপেক্ষ পরমাণু দিয়ে গঠিত যৌগের আণবিক সংকেত লিখার নিয়ম–

(ক) প্রথমে যে দুটি পরমাণু দিয়ে যৌগিক পদার্থ গঠিত তাদের প্রতীক পাশাপাশি লিখতে হবে। এখানে প্রথমে ধাতব পরমাণু বা পর্যায় সারণির বামদিকের পরমাণুর প্রতীক লিখতে হবে।

(খ) এবার প্রথম পরমাণুর যোজনী দ্বিতীয় পরমাণুর ডান দিকে নিচে এবং দ্বিতীয় পরমাণুর যোজনী প্রথম পরমাণুর ডান দিকে নিচে লিখতে হবে।

(গ) এবার পরমাণুর প্রতীকের পাশে লিখিত যোজনী সংখ্যাকে ২,৩..... ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা গেলে ভাগ করতে হবে এবং পরমাণুর ডান পাশে সেই ভাগফল লিখতে হবে।

(ঘ) এবার উল্লিখিত ভাগফলের মধ্যে যদি কোনো ভাগফল এক হয় তবে তা আর লিখতে হবে না।

উদাহরণ ১ : জিঙ্ক ও অক্সিজেন দিয়ে যৌগ গঠিত হলো। এবার উল্লিখিত নিয়মে এর সংকেত লেখা যাক।

১ম ধাপ : জিঙ্ক ও অক্সিজেনের প্রতীক পাশাপাশি লিখে পাই

$$ZnO$$

২য় ধাপ : এবার জিঙ্কের যোজনী অক্সিজেনের ডান পাশে নিচে বসাই এবং অক্সিজেনের যোজনী জিঙ্কের ডান পাশে নিচে বসাই

$$Zn_2O_2$$

৩য় ধাপ : জিঙ্কের যোজনী ২এবং অক্সিজেনের যোজনী ২ হওয়ায় উভয়কে ২ দ্বারা নিঃশেষে ভাগ করা যায় বলে ২ দ্বারা ভাগ করে পাই

$$Zn_1O_1$$

৪র্থ ধাপ : এবার জিঙ্কের ডান পাশে নিচে ১ এবং অক্সিজেনের ডান পাশে নিচে ১ হওয়ায় তা বাদ দেই

$$ZnO$$

উদাহরণ ২ : অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেন দিয়ে যৌগ গঠিত হলো। এবার উল্লিখিত নিয়মে এর সংকেত লেখা যাক।

১ম ধাপ : অ্যালুমিনিয়াম ও অক্সিজেনের প্রতীক পাশাপাশি লিখে পাই

$$AlO$$

২য় ধাপ : এবার অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী অক্সিজেনের ডান পাশে নিচে বসাই এবং অক্সিজেনের যোজনী অ্যালুমিনিয়ামের ডান পাশে নিচে বসাই

$$Al_2O_3$$

৩য় ধাপ : অ্যালুমিনিয়ামের যোজনী ৩ এবং অক্সিজেনের যোজনী ২ হওয়ায় কোনো সংখ্যা দিয়ে উভয়কে নিঃশেষে ভাগ করা যায় না বলে উপরোক্ত সংকেতই হবে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের সংকেত।

(২) নিরপেক্ষ পরমাণু ও যৌগমূলক দিয়ে গঠিত যৌগের আণবিক সংকেত লেখার নিয়ম :

(ক) প্রথমে যে দুটি আয়ন দিয়ে যৌগিক পদার্থ গঠিত তাদের মধ্যে ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নের প্রতীক বামদিকে এবং ঋণাত্মক আয়ন ডানদিকে পাশাপাশি লিখতে হবে।

(খ) এবার ধনাত্মক আয়নের যোজনী ঋণাত্মক আয়নের ডান দিকে নিচে এবং ঋণাত্মক আয়নের যোজনী ধনাত্মক আয়নের ডান দিকে নিচে লিখতে হবে।

(গ) এবার আয়নের প্রতীকের পাশে লিখিত যোজনী সংখ্যাকে ২,৩..... ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে নিঃশেষে ভাগ করা গেলে ভাগ করতে হবে এবং আয়নের ডান পাশে সেই ভাগফল লিখতে হবে।

(ঘ) এবার উল্লিখিত ভাগফলের মধ্যে যদি কোনো ভাগফল এক হয় তবে তা আর লিখতে হবে না।

উদাহরণ ১ : ম্যাগনেসিয়াম ও সালফেট আয়ন দিয়ে যৌগ গঠিত হলো। এবার উল্লিখিত নিয়মে এর সংকেত লিকা যাক।

১ম ধাপ : ম্যাগনেসিয়াম এর প্রতীক ও সালফেট যৌগমূলকের সংকেত দুটি পাশাপাশি লিখে পাই

$$Mg(SO_4)$$

২য় ধাপ : এবার ম্যাগনেসিয়াম আয়নের যোজনী সালফেট আয়নের ডান পাশে নিচে বসাই এবং সালফেট আয়নের যোজনী ম্যাগনেসিয়াম আয়নের ডান পাশে নিচে বসাই

$$Mg_2(SO_4)_2$$

৩য় ধাপ : এবার ম্যাগনেসিয়াম আয়নের যোজনী ২ এবং সালফেট আয়নের যোজনী ২ হওয়ায় উভয়কে ২ দ্বারা ভাগ করে পাই

$$Mg_1(SO_4)_1$$

৪র্থ ধাপ : এবার ম্যাগনেসিয়াম আয়নের ডান পাশে নিচে ১ এবং সালফেট আয়নের ডান পাশে নিচে ১ হওয়ায় তা বাদ দেই

$$Mg(SO_4) \text{ বা } MgSO_4$$

এটিই ম্যাগনেসিয়াম সালফেটের সংকেত।

৬.২ রাসায়নিক সমীকরণ

রসায়নবিদ্যায় বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করা হয়। এ সকল কাজের সুবিধার জন্য রাসায়নিক পরিবর্তনকে সহজবোধ্য ও সুনির্দিষ্টভাবে প্রকাশের একটি পদ্ধতি প্রয়োজন। এজন্যই রাসায়নিক পরিবর্তনকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সমীকরণ আকারে প্রকাশ করা হয়। যখন কোনো রাসায়নিক পরিবর্তনকে ঐ বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উৎপাদসমূহের প্রতীক, সংকেত এবং কিছু বীজগণিতীয় চিহ্ন ব্যবহার করে প্রকাশ হয় তবে তাকে রাসায়নিক সমীকরণ বলে। যেমন- দুই অণু হাইড্রোজেন ও এক অণু অক্সিজেনের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে দুই অণু পানি উৎপন্ন হয়। এ রাসায়নিক পরিবর্তনকে বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারি পদার্থের সংকেত , বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের সংকেত এবং একটি তির চিহ্ন ব্যবহার করে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায়।

$$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$$

এটি একটি রাসায়নিক সমীকরণ। তবে এই সমীকরণে উক্ত বিক্রিয়া সম্পর্কে সকল তথ্য প্রকাশ করে না। অর্থাৎ বিক্রিয়ক ও উৎপাদসমূহের ভৌত অবস্থা কীরূপ তা প্রকাশ করে না। নিম্নলিখিতভাবে সমীকরণের মাধ্যমে তা প্রকাশ করা যায়।

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O\ (l)$$

উপরিউক্ত সমীকরণের বিক্রিয়ক ও উৎপাদের ডান পাশে বন্ধনীর ভিতরে ইংরেজি বর্ণ দিয়ে তাদের ভৌত অবস্থা প্রকাশ করা হয়েছে।

সমীকরণ লেখার নিয়ম : রাসায়নিক সমীকরণকে সঠিকভাবে ও শুদ্ধভাবে লিখতে হলে কতকগুলো নিয়ম মেনে চলতে হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রথম ধাপ : বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী পদার্থের প্রতীক বা/ও সংকেত বাম দিকে লিখতে হবে। যদি বিক্রিয়ায় একাধিক পদার্থ অংশগ্রহণ করে তবে একটির সংকেত/প্রতীকের পর একটি যোগ চিহ্ন দিয়ে অপরটির সংকেত/প্রতীক লিখতে হবে। অতঃপর এটি তীর চিহ্ন দিয়ে তার ডান দিকে একই নিয়মে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থের/ পদার্থসমূহের প্রতীক/সংকেত লিখতে হবে। এটাকে সমীকরণের কঙ্কাল বলা যেতে পারে । যেমন–

$$CH_4(g) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + H_2O(g)$$

দ্বিতীয় ধাপ : এবার বিক্রিয়ার পূর্বে এবং পরের অবস্থার মধ্যে অর্থাৎ সমীকরণের বাম ও ডান দিকে সমতা বিধান করতে হবে। কারণ বিক্রিয়ার পূর্বে ও পরে পরমাণুর সংখ্যা বা ভর অপরিবর্তিত থাকবে। এজন্য সমীকরণের বাম ও ডান দিকে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের অণুতে/অণুসমূহে প্রতিটি মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করতে হয়। এবার বিক্রিয়ক ও উৎপাদের সংকেত/প্রতীক এর বাম দিকে এমনভাবে উপযুক্ত পূর্ণসংখ্যা বসাতে হবে যাতে সমীকরণের উভয় দিকের পরমাণুর সংখ্যা সমান হয়। যেমন– উপরিউক্ত সমীকরণের বাম পাশে অক্সিজেনের পূর্বে এবং ডান পাশে পানির পূর্বে 2 বসালে সমীকরণটির বাম পাশের প্রতিটি পরমাণুর সংখ্যা যথাক্রমে ডান পাশের একই পরমাণু সংখ্যার সমান হবে।

$$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$$

সমীকরণ লেখার ক্ষেত্রে সমতাকরণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ যা শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। সমীকরণ সমতাকরণ দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা- ১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি এবং ২) বীজগাণিতীয় পদ্ধতি।

১) পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে সমীকরণ সমতাকরণের কৌশল কতকগুলো উদাহরণ এর মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো,

উদাহরণ-১ :

$$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

উপরিউক্ত সমীকরণের ডানদিকে দুটি Cl পরমাণু রয়েছে, কিন্তু বাম দিকে একটি Cl পরমাণু রয়েছে। এবার বামদিকে HCl-এর সহগরূপে ২ বসালে উভয়দিকে Cl পরমাণুর সংখ্যা সমান হবে এবং একই সাথে উভয়দিকে H পরমাণুর সংখ্যা সমান হবে।

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

উদাহরণ-২ : নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস বিক্রিয়া করে অ্যামোনিয়া উৎপাদন হয়। এ বিক্রিয়াকে সমীকরণের মাধ্যমে নিম্নরূপে লেখা যায়।

$$N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$$

কিন্তু এ সমীকরণের বাম ও ডান দিকে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণু সমান নয়। এখন ডান দিকে NH_3-এর আগে সহগরূপে 2 বসালে N-পরমাণুর সংখ্যা উভয়দিকে সমান হয়।

$$N_2 + H_2 \rightarrow 2NH_3$$

কিন্তু এখনও সমীকরণের বাম ও ডানদিকে H-পরমাণুর সংখ্যা সমান হয় না। এখন বামদিকে H_2-এর সহগরূপে 3 বসালে উভয়দিকে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংখ্যাও সমান হয়ে যায় এবং সম্পূর্ণ সমীকরণের মধ্যে সমতা তৈরি হয়। ফলে সমতাযুক্ত সমীকরণটি নিম্নরূপ হয় :

$$N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$$

২) বীজগণিতীয় নিয়ম : বীজগণিতীয় নিয়মে সমীকরণ সমতাকরণের পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। আমরা জানি, জিঙ্ক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড বিক্রিয়া করে জিঙ্ক ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি নিম্নলিখিত সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে।

$$Zn + HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

মনে করি, উপরোক্ত সমীকরণের বিক্রিয়ক এবং উৎপাদগুলোর সহগ হিসেবে যথাক্রমে a, b, c ও d বসালে সমীকরণটির সমতা সৃষ্টি হবে। এবার সমীকরণের বিক্রিয়ক এবং উৎপাদগুলোর সহগ হিসেবে যথাক্রমে a, b, c ও d বসালে সমীকরণটি হবে নিম্নরূপ :

$$aZn + bHCl \rightarrow cZnCl_2 + dH_2$$

উপরিউক্ত সমীকরণে a, b, c ও d মোট চারটি অজানা রাশি আছে। আমরা জানি কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার পূর্বে এবং পরে ভরের কোনো পরিবর্তন হয় না। সুতরাং লেখা যায়–

জিঙ্কের সমতাকরণের ক্ষেত্রে $a = c$.....(1)

হাইড্রোজেনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে $b = 2d$.....(2)

ক্লোরিনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে $b = 2c$.....(3)

এবার $b = 1$ ধরে সমীকরণ (2) থেকে পাই

$b = 2d$

বা $1 = 2\ d$

অতএব $\frac{1}{2} = d$.....(4)

এবং একইভাবে সমীকরণ (3) থেকে পাই

$$b = 2c$$

বা $1 = 2c$

অতএব $\frac{1}{2} = c$.....(5)

এবার সমীকরণ (1) ও (5) থেকে পাই

$$a = c = \frac{1}{2}$.....(6)$$

এবার রাসায়নিক সমীকরণে a, b, c, d এর মান বসিয়ে পাই

$$\frac{1}{2}\,Zn + 1HCl \rightarrow \frac{1}{2}\,ZnCl_2 + \frac{1}{2}\,H_2$$

অতএব সমীকরণের দুই দিকে 2 দিয়ে গুণ করে পাই

$$1Zn + 2HCl \rightarrow 1ZnCl_2 + 1H_2$$

কিন্তু সমীকরণের কোনো মৌলের বা যৌগের প্রতীকের সহগ 1 হলে তা লিখতে হয় না। অতএব উপরিউক্ত সমীকরণের যে সকল উপাদানের প্রতীকের সহগ 1 , তাদের সহগকে বাদ দিয়ে পাই

$$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$$

এখন সমীকরণটি সমতাকরণ সম্পন্ন হলো।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া হলো : নিচের সমীকরণের বিজগণিতীয় পদ্ধতিতে সমতাকরণ করতে হবে।

$$\mathbf{KMnO_4 + HCl \rightarrow KCl + MnCl_2 + H_2O + Cl_2}$$

ধরি সমীকরণের বিক্রিয়কসমূহ ও উৎপদসমূহের সহগ যথাক্রমে a, b, c, d, e, f হলে সমীকরণটির সমতাকরণ সম্পন্ন হবে। অতএব সমতাকৃত সমীকরণটি হবে নিম্নরূপ :

$$\mathbf{\mathit{a}KMnO_4 + \mathit{b}HCl \rightarrow \mathit{c}KCl + \mathit{d}MnCl_2 + \mathit{e}H_2O + \mathit{f}Cl_2}$$

আমরা জানি, ভরের নিত্যতার সূত্র আনুযায়ী কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার আগে ও পরে মোট ভর অপরিবর্তিত থাকে। অর্থাৎ কোনো বিক্রিয়ায় কোনো নির্দিষ্ট পরমাণু বিক্রিয়ার আগে ও পরে সমান হবে। সুতরাং উপরিউক্ত সমীকরণের জন্য লিখতে পারি–

ম্যাঙ্গানিজের সমতাকরণের ক্ষেত্রে, $a = d$.....2

পটাসিয়ামের সমতাকরণের ক্ষেত্রে, $a = c$ 1

অক্সিজেনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে, $4a=e$.....3

হাইড্রোজেনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে, $b=2e$.....4

ক্লোরিনের সমতাকরণের ক্ষেত্রে, $b= c + 2d + 2f$.....5

এবার যদি $a = 1$ হয়, তবে 1, 2 ও 3 নং সমীকরণ থেকে পাই

$$d = 1.....6$$
$$c = 1.....7$$
$$e = 4.....8$$

এবার $e = 4$, বসিয়ে 4 নং সমীকরণ থেকে পাই

$$b= 8.....9$$

এবার b, c, d, মান বসিয়ে 5 নং সমীকরণ থেকে পাই

$$8 = 1 + 2 + 2f$$

বা $8 = 3 + 2f$

বা $8 - 3 = 2f$

বা $5 = 2f$

বা $5/2 = f.....10$

এখন রাসায়নিক সমীকরণের মধ্যে এর মান বসিয়ে পাই

$$1\mathbf{KMnO_4} + 8\mathbf{HCl} \rightarrow 1\mathbf{KCl} + 1\mathbf{MnCl_2} + 4\mathbf{H_2O} + 5/2\mathbf{Cl_2}$$

এবার রাসায়নিক সমীকরণের উভয় পক্ষকে 2 দিয়ে গুণ করে পাই

$$2\ \mathbf{KMnO_4} + 16\ \mathbf{HCl} \rightarrow 2\ \mathbf{KCl} + 2\ \mathbf{MnCl_2} + 8\ \mathbf{H_2O} + 5\ \mathbf{Cl_2}$$

এখন সমীকরণটি সমতাকরণ সম্পন্ন হলো।

রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য : কোনো একটি রাসায়নিক সমীকরণ থেকে ঐ রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পর্কে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। কোনো রাসায়নিক সমীকরণ থেকে যে সকল তথ্য পাওয়া যায় তাকে রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য বলা হয়। নিম্নে রাসায়নিক সমীকরণের তাৎপর্য বর্ণনা করা হলো–

১) বিক্রিয়ায় কী কী রাসায়নিক পদার্থ অংশগ্রহণ করেছে ও কী কী রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়েছে
২) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল বিক্রিয়কের ও উৎপন্ন সকল পদার্থের প্রতীক ও সংকেত
৩) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল বিক্রিয়কের ও উৎপন্ন সকল পদার্থের তুল্যসংখ্যা
৪) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল বিক্রিয়কের ও উৎপন্ন সকল পদার্থের তুল্যভর
৫) বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সকল বিক্রিয়কের ও উৎপন্ন সকল পদার্থের ভৌত অবস্থা

রাসায়নিক সমীকরণের মাত্রিক তাৎপর্য থেকে উৎপাদের পরিমাণ নির্ণয় : কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার একটি বিক্রিয়কের ভর থেকে অন্য একটি বিক্রিয়কের ভর নির্ণয় করা যায়। যেমন- ধাতব ম্যাগনেসিয়াম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$$2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO$$

উপরিউক্ত বিক্রিয়া থেকে পাই 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম 1 অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। এখন উপরিউক্ত সমীকরণে ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের গ্রামে প্রকাশিত পারমাণবিক ভরের মান বসিয়ে পাওয়া যায় যে, 48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম ও 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার করে 80 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। এখন যদি উক্ত বিক্রিয়ায় 12 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করে, তবে বিক্রিয়ায় কী পরিমাণ অক্সিজেন ব্যবহৃত হয় এবং কী পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয় তা নিম্নরূপে হিসাব করা যায়। যেমন–

48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম 32 গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার করে

$\therefore$ 12 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম $\frac{32\times12}{48}$ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার করে

$= 8$ গ্রাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়ার করে

একইভাবে কী পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হবে তা হিসাব করা যায়। যেমন-

48 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম 80 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে

$\therefore$ 12 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম $\frac{80\times12}{48}$ গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

$=$ 20 গ্রাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে

৬.৩ যৌগের শতকরা সংযুক্তি থেকে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয়

আমরা জানি, কোনো যৌগের স্থূল সংকেতে ঐ অণুতে উপস্থিত সকল মৌলের পরমাণুসমূহ যে ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতে থাকে যদি সেই একই অনুপাতে প্রকাশ কর হয়ে থাকে। যেমন– ইথেন (CH_3CH_3)-এর অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন মৌল দুটির পরমাণুসমূহের ক্ষুদ্রতম পূর্ণ সংখ্যার অনুপাত হচ্ছে $1 : 3$। সুতরাং ইথেন-এর স্থূল সংকেত হলো C_2H_6। শতকরা সংযুক্তি থেকে স্থূল সংকেত নির্ণয় করতে হলে সংশ্লিষ্ট যৌগের অণুতে যে সকল মৌল থাকে তাদের পারমাণবিক ভর ও উক্ত যৌগে তাদের শতকরা পরিমাণ কত তা জানা থাকা প্রয়োজন।

স্থূল সংকেত নির্ণয়

নিম্নে শতকরা সংযুক্তি থেকে আণবিক সংকেত নির্ণয়ের নিম্নে দেওয়া হলো :

(ক) প্রথমে যৌগের উপাদান মৌলসমূহের শতকরা পরিমাণগুলোকে যোগ করতে হবে

(খ) যোগফল 100 বা এর খুব কাছাকাছি কোনো সংখ্যা হবে। যদি 100 বা এর খুব কাছাকাছি কোনো সংখ্যা না হয় তবে ধরে নিতে হবে অবশিষ্ট অংশ। অন্য কোনো মৌল।

(গ) এবার প্রত্যেক মৌলের শতকরা পরিমাণকে তাদের নিজ নিজ পারমাণবিক ভর দ্বারা ভাগ করতে হবে। এই ভাগফলগুলো যৌগের উপাদান মৌলসমূহের পরমাণুর আনুপাতিক সংখ্যা প্রকাশ করে।

(ঘ) এবার ভাগফলসমূহকে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সংখ্যায় প্রকাশ করার জন্য এদের মধ্যে যার মান সবচেয়ে ছোট সেই সংখ্যা দিয়ে প্রত্যেক সংখ্যাকে ভাগ করতে হবে। প্রাপ্ত ভাগফলই যৌগের অণুতে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলসমূহের পরমাণুর ক্ষুদ্রতম অনুপাত প্রকাশ করে।

(ঙ) এভাবে প্রাপ্ত ভাগফলগুলো যদি পূর্ণ সংখ্যা না হয় তখন প্রাপ্ত ভাগফলসমূহকে তাদের নিকটতম পূর্ণ সংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হয। যেমন– ভাগফলসমূহের মধ্যে যদি একটি 1.5 হয় তবে সুবিধাজনক পূর্ণসংখ্যা যেমন ২ দ্বারা সব ভাগফলকে গুণ করে পূর্ণসংখ্যায় রূপান্তরিত করতে হবে। এভাবে প্রাপ্ত পরমাণুসমূহের পূর্ণ সংখ্যার অনুপাতই হবে যৌগের স্থূল সংকেতে বিদ্যমান মৌলসমূহের নিজ নিজ পরমাণুর সংখ্যা।

আণবিক সংকেত নির্ণয় : কোনো যৌগের আণবিক সংকেতে ঐ যৌগের অণুতে উপস্থিত প্রতিটি মৌলের পরমাণুর প্রকৃত সংখ্যা উল্লেখ থাকে। যেমন– ইথেন এর অণুতে কার্বন ও হাইড্রোজেন এর প্রকৃত সংখ্যা যথাক্রমে ২ ও ৬ । সুতরাং ইথেনের আণবিক সংকেত হলো C_2H_6। উল্লেখ্য, কিছু কিছু যৌগের ক্ষেত্রে স্থূল সংকেত ও আণবিক সংকেত অভিন্ন হয়। যেমন– পানি (H_2O), অ্যামোনিয়া (NH_3), মিথেন (CH_4) ইত্যাদি। সাধারণত কোনো যৌগের আণবিক সংকেত ঐ যৌগের স্থূল সংকেতের সাধারণ গুণিতক হয়ে থাকে। স্থূল সংকেত থেকে কোনো যৌগের আণবিক সংকেত নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ঐ যৌগের উপাদান মৌলসমূহের শতকরা পরিমাণ, পারমাণবিক ভর ও যৌগের আণবিক ভর জানা থাকতে হবে। নিম্নলিখিতভাবে আণবিক সংকেত ও স্থূল সংকেতের সম্পর্ক প্রকাশ করা যায় :

$$\text{আণবিক সংকেত} = (\text{স্থূল সংকেত}) \times n \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

[যেখানে, n=1, 2, 3, ... ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা।]

ধরা যাক, কোনো যৌগের স্থূল সংকেত = $(A_a B_b C_c)$

অতএব ঐ যৌগের আণবিক সংকেত = $(A_a B_b C_c)_n$

অর্থাৎ যৌগের স্থূল সংকেত , $A_a B_b C_c$ = যৌগের আণবিক সংকেত $(A_a B_b C_c)_n$

$$\text{বা } n = \frac{\text{যৌগের আণবিক সংকেত ভর}}{\text{যৌগের স্থূল সংকেত ভর}} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

(২) থেকে প্রাপ্ত n এর মান দ্বারা স্থূল সংকেতের প্রত্যেক মৌলের পরমাণু সংখ্যাকে গুণ করলে ঐ যৌগের আণবিক সংকেত পাওয়া যাবে।

উদাহরণ ১ : গ্লুকোজের, শতকরা সংযুক্তি হচ্ছে, C = 40 , H = 6.67 ও O = 53.33 এবং আণবিক ভর = 180 । গ্লুকোজের আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে হবে।

প্রশ্নানুসারে গ্লুকোজের C , H ,O এর শতকরা ভরের যোগফল = (40 + 6.67 + 53.33) = 100

এবার C , H ,O এর শতকরা পরিমাণকে তাদের নিজ নিজ পারমাণবিক ভর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করে পাই,

C = 40 ÷ 12 =3.33 , H = 6.67 ÷ 1= 6.67 ও O = 53.33 ÷ 16 = 3.33.....(3)

প্রাপ্ত ভাগফলগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতম সংখ্যা = 3.33 দ্বারা উপরিউক্ত ভাগলফগুলোকে পুনরায় ভাগ করি

C = 3.33 ÷ 3.33 = 1 , H = 6.67 ÷ 3.33= 2 (প্রায়) ও O = 3.33 ÷ 3.33 = 1.....(4)

সুতরাং গ্লুকোজের স্থূল সংকেত = CH_2O

অতএব গ্লুকোজের স্থূল ভর = (12 + 2 +16) = 30

দেওয়া আছে, গ্লুকোজের আণবিক ভর = 180

ধরি গ্লুকোজের অণবিক সংকেত = $(CH_2O)_n$

অতএব $n = \frac{\text{গ্লুকোজের প্রকৃত আণবিক ভর}}{\text{গ্লুকোজের স্থূল সংকেত ভর}}$

বা $n = \frac{180}{30} = 6$

সুতরাং গ্লুকোজের আণবিক সংকেত = $(CH_2O)_6$

$= C_6H_{12}O_6$

তুঁতের কেলাস পানির শতকরা সংযুক্তির গাণিতিক হিসাব

কোনো যৌগের আণবিক ভরের ১০০ ভাগের কত অংশ ভর হিসেবে ঐ যৌগটিতে উপস্থিত পরমাণুসমূহ বিদ্যমান তা বোঝায়। যেমন- হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন এ দুটি মৌল নিয়ে পানির অণু গঠিত। পানি আণবিক ভরের ১০০ ভাগের কত অংশ হাইড্রোজেনের ভর এবং কত অংশ অক্সিজেনের ভর তাই হচ্ছে পানির শতকরা সংযুক্তি। কোনো যৌগের শতকরা সংযুক্তি হিসাব করতে হলে ঐ যৌগের আণবিক সংকেত এবং তার উপাদান মৌলগুলোর পারমাণবিক ভর জানা থাকতে হবে। এজন্য নিম্নোক্তভাবে হিসাব করতে হবে-

(১) প্রথমে যৌগটির আণবিক ভর নির্ণয় করতে হবে

(২) এবার যৌগটির অণুতে বিদ্যমান কোনো একটি মৌলের পারমণবিক ভরকে ঐ যৌগে উপস্থিত ঐ পরমাণু সংখ্যা দিয়ে গুণ করতে হবে

(৩) এবার আণবিক ভর দ্বারা ভাগ করে ১০০ দ্বারা গুণ করলে যৌগটিতে ঐ মৌলের শতকরা সংযুক্তি পাওয়া যাবে

অর্থাৎ যৌগের কোনো একটি মৌলের শতকরা পরিমাণ = $\frac{\text{যৌগটিতে মৌলের পরমাণু সংখ্যা} \times \text{পারমাণবিক ভর} \times ১০০}{\text{যৌগটির আণবিক ভর}}$

$\therefore$ যৌগের কোনো একটি মৌলের শতকরা পরিমাণ = $\frac{\text{সেই মৌলের পরমাণুসমূহের মোট ভর} \times ১০০}{\text{যৌগটির আণবিক ভর}}$

উদাহরণ-১ : আমরা জানি, তুঁতের আণবিক সংকেত হলো $CuSO_4.5H_2O$। তুঁতের কেলাস পানির শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় করতে হবে।

তুঁতের আণবিক ভর = $(63.5 + 32 + 16 \times 9 + 1 \times 10) = 249.5$

$$\text{তুঁতের কেলাস পানির শতকরা সংযুক্তি} = \frac{90 \times 100}{249.5} = 36.07\%$$

পরীক্ষণের মাধ্যমে তুঁতের কেলাস পানির পরিমাণ নির্ণয়

প্রয়োজনীয় উপকরণ : তুঁতে, নিক্তি, পোর্সেলিনের বাটি , তারজালি, ত্রিপদী স্ট্যান্ড, ক্রুসিবল, টংজ, ও বার্নার/ স্পিরিট ল্যাম্প ইত্যাদি।

মূলনীতি : তুঁতে নীল বর্ণের একটি স্ফটিকাকার (দানাদার) পদার্থ যার রাসায়নিক সংকেত $CuSO_4.5H_2O$ । তুঁতের নীল স্ফটিকে পাঁচ অণু কেলাস পানি থাকে। পানিশূন্য (Anhydrous) কপার সালফেট ($CuSO_4$) এর বর্ণ সাদা। নীল বর্ণের কপার সালফেটকে উত্তপ্ত করলে এর কেলাস পানি বাষ্পীভূত হয়ে দূরীভূত হয় এবং সাদা বর্ণের পানিশূন্য কপার সালফেট উৎপন্ন করে। তাপ প্রয়োগের আগে এবং তাপ প্রয়োগ মাধ্যমে কেলাস পানি দূরীভূত করে তুঁতের ভর পরিমাপ করা হয়। এই দুই ভরের পার্থক্যই তুঁতের কেলাস পানির ভর।

কাজের ধারা: নিক্তির সাহায্যে অল্প পরিমাণ নীল তুঁতে বা $CuSO_4.5H_2O$-এর ওজন করি। এবার ওজনকৃত $CuSO_4.5H_2O$-কে পোর্সেলিনের বাটিতে নিয়ে ত্রিপদী স্ট্যান্ডের ওপর রেখে ভালোভাবে উত্তপ্ত করি। কপার সালফেট পুরোপুরি সাদা না হওয়া পর্যন্ত তাপ দিতে হবে। কপার সালফেটের বর্ণ পুরোপুরি সাদা হওয়ার পর দ্রুত ওজন নেই। দ্রুত ভর নির্ণয় করতে হবে কারণ সাদা কপার সালফেট ধীরে ধীরে শীতল হতে থাকে এবং বাতাস থেকে পানি শোষণ করে পুনরায় নীল কপার সালফেটে পরিণত হয়।

হিসাব :

মনে করি, পোর্সেলিনের বাটির ভর = X গ্রাম

তাপ দেওয়ার পূর্বে $CuSO_4.5H_2O$-সহ পোর্সেলিনের বাটির ভর = Y গ্রাম

তাপ দেওয়ার পর $CuSO_4$-সহ পোর্সেলিনের বাটির ভর = Z গ্রাম

$CuSO_4.5H_2O$-এর ভর = $(Y - X)$ গ্রাম

তাপ দেওয়ার পর $CuSO_4$-এর ভর = $(Z - X)$ গ্রাম

উত্তাপে অপসারিত পানির ভর = $(Y - X) - (Z - X)$ গ্রাম

= $(Y - Z)$ গ্রাম

$(Y - X)$ গ্রাম $CuSO_4.5H_2O$ -এর সাথে যুক্ত কেলাস পানির ভর = $(Y - Z)$ গ্রাম

$$100 \text{ গ্রাম } CuSO_4.5H_2O \text{ -এর সাথে যুক্ত কেলাস পানির ভর} = \frac{(Y - Z) \times 100 \text{ গ্রাম}}{(Y - X)}$$

৬.৪ মোল (mole)-এর ধারণা

রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক কণিকা, পরমাণু, অণু, বা আয়ন ইত্যাদির পরিমাণ হিসাবের জন্য মোল (mole) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। International System of Units (SI) বা আন্তর্জাতিক একক অনুসারে 0.012 kg কার্বন-১২ তে যত সংখ্যক কার্বন পরমাণু আছে তত সংখ্যক কোনো মৌলিক কণিকা, পরমাণু , অণু বা আয়নের ভরকে এক মোল বলা হয়। আন্তর্জাতিক একক অনুসারে 0.012 kg বা 12 g কার্বন-১২ তে মোট 6.022×10^{23} টি কার্বন পরমাণু থাকে। আমরা জানি কার্বন-১২ এর ভরের সাথে তুলনা করে সকল মৌলের পারমাণবিক ভর নির্ণয় করা হয়েছে। ১২ গ্রাম কার্বন হচ্ছে গ্রামে প্রকাশিত কার্বনের

পারমাণবিক ভর। সুতরাং গ্রামে প্রকাশিত পারমাণবিক ভরের সকল মৌলেই সমান সংখ্যক পরমাণু থাকবে এবং (SI) বা আন্তর্জাতিক একক অনুসারে এই সংখ্যা 6.022×10^{23} যাকে অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা বা ধ্রুবক বলা হয়।

উদাহরণ- ১ : 1 মোল O পরমাণু হলো 16g অক্সিজেন পরমাণু এবং এতে 6.022×10^{23} টি অক্সিজেন পরমাণু থাকে। একইভাবে 1 মোল O_2 অণু হলো 32g অক্সিজেন অণু এবং এতে 6.022×10^{23} টি আক্সিজেন অণু থাকে।

উদাহরণ- ২ : 1 মোল পানি (H_2O) বলতে 18g পানিকে বোঝায় এবং 1 মোল পানি বা 18g পানিতে 6.022×10^{23} টি পানির অণু থাকে।

মোলের গুরুত্ব : যে কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমীকরণ থেকে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী বিক্রিয়কের অণু বা পরমাণুর সংখ্যা সহজেই হিসাব করতে পারি। কিন্তু বাস্তবে অণু বা পরমাণু সংখ্যা গণনা করে পরীক্ষাগারে রাসায়নিক বিক্রিয়ার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। এজন্য বিকল্প উপায় হচ্ছে মোল এককে হিসাব করা যা ওজন করে বের করা যায়। উল্লেখ্য, ওজন করে বের করলেও 1 মোল পরমাণু বা অণু বা আয়ন বা ইলেকট্রন বা অন্যান্য কণার ক্ষেত্রেও একই সংখ্যা , অর্থাৎ 6.022×10^{23} টি বোঝায়।

গ্যাসের মোলার আয়তন

আমরা জানি, গ্যাসীয় পদার্থও নির্দিষ্ট আয়তন দখল করে থাকে এবং এই আয়তনের মান গ্যাসের ভর , তাপমাত্রা ও চাপের ওপর নির্ভরশীল। 1 atm চাপে ও 100°C তাপমাত্রা পানি বাষ্পে পরিণত হয় আর্থাৎ গ্যাসীয় অবস্থায় তাকে। এই গ্যাসীয় আবস্থায় 1 মোল বা 18g পানি প্রায় 30.6L আয়তন দখল করে। এক মোল গ্যাসীয় পদার্থ যে আয়তন দখল করে তাকে ঐ গ্যাসের মোলার আয়তন বলে। সুতরাং এই অবস্থায় পানির মোলার আয়তন হবে 30.6L। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক গণনার জন্য গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন প্রয়োজন হয়।

১. **গ্যাসীয় পদার্থর মোলার আয়তন :** নির্দিষ্ট তাপমাত্রা ও চাপে, কোনো নির্দিষ্ট গ্যাসের এক মোল যে আয়তন দখল করে তাকে ঐ গ্যাসের মোলার আয়তন বলে। অ্যাভোগাড্রো প্রকল্প অনুসারে সমান তাপমাত্রা ও চাপে সকল গ্যাসের মোলার আয়তন পরস্পর সমান এবং প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে (অর্থাৎ 0°C বা 273K এবং 1 atm চাপে) তা 22.4 L । (আবার 25°C ও 1 atm চাপে গ্যাসের মোলার আয়তন 24.789 L হয়।)

২. কোনো পদার্থের মোলার আয়তন ও অ্যাভোগাড্রো সংখ্যা থেকে নিম্নোলিখিত সম্পর্ক পাওয়া যায়-

(ক) এক মোল অণুর ভর = গ্রাম আণবিক ভর = 6.022×10^{23} টি অণুর ভর।

= 22.4 L (STP তে)-এর ভর।

(খ) কোনো পদার্থের একটি অণুর ভর = $\frac{\text{গ্রাম আণবিক ভর}}{6.022 \times 10^{23}}$ গ্রাম।

(গ) এক গ্রাম পদার্থে অণুর সংখ্যা = $\frac{6.022 \times 10^{23}}{\text{পদার্থের গ্রাম আণবিক ভর}}$ টি।

(ঘ) এক গ্রাম গ্যাসের আয়তন (STP তে) = $\frac{22.4}{\text{গ্যাসের গ্রাম আণবিক ভর}} L$।

(ঙ) গ্যাসের একটি অণুর দখলকৃত আয়তন (STP তে) = $\frac{22.4}{6.022 \times 10^{23}} L$ ।

(চ) প্রমাণ অবস্থায় 1 L গ্যাসে অণুর সংখ্যা = $\frac{6.022 \times 10^{23}}{22.4}$ টি।

(ছ) মৌলের একটি পরমাণুর ভর = $\frac{\text{গ্রাম আণবিক ভর}}{6.022 \times 10^{23}}$ g.

মোল এবং আণবিক সংকেত

কোনো যৌগের আণবিক সংকেত থেকে ঐ যৌগটিতে কি কি মৌল রয়েছে এবং কি অনুপাতে রয়েছে তা জানা যায়। যেমন- HCl অণু হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিন পরমাণু দিয়ে গঠিত। এক পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু ক্লোরিন যুক্ত হয়ে এক অণু HCl গঠন করে। একে মোল এককে প্রকাশ করলে হবে এক মোল হাইড্রোজেন ও এক মোল ক্লোরিন যুক্ত হয়ে এক মোল HCl অণু গঠন করে।

পারমাণবিক ও আণবিক ভর

যে কোনো পরমাণুতে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন এই তিনটি স্থায়ী কণিকা থাকে। প্রতিটি পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে। তবে হাইড্রোজেন ব্যতীত সাধারণত পরমাণুর নিউট্রন সংখ্যা প্রোটন সংখ্যার সমান আথবা বেশি হয়ে থাকে। হাইড্রোজেন পরমাণুতে কোনো নিউট্রন নেই। কোনো নির্দিষ্ট মৌলের সকল পরমাণু একই রাসায়নিক ধর্ম প্রর্দশন করে। প্রোটন ও নিউট্রনের আপেক্ষিক ভর সমান এবং ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর প্রোটন বা নিউট্রনের ভরের 1840 ভাগের 1 ভাগ । প্রোটন ও নিউট্রনের আপেক্ষিক ভরের তুলনায় ইলেকট্রনের আপেক্ষিক ভর অত্যন্ত কম হওয়ায় পারমাণবিক ও আণবিক ভর হিসাবের ক্ষেত্রে একে অগ্রাহ্য করা হয়।

পারমাণবিক ভর : কোনো পরমাণুর নিউক্লিয়াসে উপস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের ভরের সমষ্টিই হবে ঐ পরমাণুর পারমাণবিক ভর।

আণবিক ভর : কোনো অণুর আণবিক ভর হচ্ছে ঐ অণুতে উপস্থিত সকল পরমাণুর পারমাণবিক ভরের সমষ্টির সমান।

আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর : কার্বন মৌলের সবচেয়ে বেশি প্রাপ্ত আইসোপটোপ কার্বন-১২ এর ভর ১২ ধরা হয় এবং এই ভরের সাথে তুলনা করে সকল মৌলের ভর নির্ণয় করা হয়। এভাবে প্রাপ্ত পরমাণুর ভরকে আপেক্ষিক ভর বলা হয়। নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর প্রকাশ করা যায়-

$$\text{কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর} = \frac{\text{মৌলের একটি পরমাণুর ভর} \times 12}{\text{একটি কার্বন-12 পরমাণুর ভর}}$$

বিভিন্ন পরমাণুর ভর পূর্ণ সংখ্যায় না পেয়ে ভগ্নাংশে পাওয়া যায়। কারণ প্রকৃতিতে প্রতিটি পরমাণুরই একাধিক আইসোটোপ পাওয়া যায়। এজন্য কোনো মৌলের আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রকৃতিতে প্রাপ্ত আইসোটোপের পর্যাপ্ততার ভিত্তিতে গড় ভর নির্ণয় করা হয়। যেমন- ক্লোরিনের দুইটি আইসোটোপ রয়েছে, এদের একটি ^{35}Cl ও অপরটি ^{37}Cl এবং এদের পর্যাপ্ততা যথাক্রমে 75% ও 25% । নিম্নে ক্লোরিনের গড় আপেক্ষিক ভর নির্ণয়ের পদ্ধতি দেখানো হলো-

^{35}Cl এর 75 টির ভর = $35 \times 75 = 2625$
^{37}Cl এর 25 টির ভর = $37 \times 25 = 925$
মোট 100 টি ক্লোরিনের ভর = 35250
অতএব ক্লোরিনের গড় ভর = $35250 \div 100 = 35.5$

যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয় : কোনো যৌগের আপেক্ষিক আণবিক ভর ঐ যৌগের উপাদান পরমাণুগুলোর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর ও পরমাণুগুলোর সংখ্যা থেকে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়। যেমন- H_2SO_4-এর আপেক্ষিক ভর নির্ণয় করতে হবে

সারণি ৬.২ : আপেক্ষিক আণবিক ভর নির্ণয়

পরমাণু	পরমাণুর গড় আপেক্ষিক ভর	পরমাণুর সংখ্যা	মোট ভর
H	1	2	$1 \times 2 = 2$
O	16	4	$16 \times 4 = 64$
S	32	1	$32 \times 1 = 32$
H_2SO_4 এর আপেক্ষিক আণবিক ভর =			98

৬.৫ বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতি

রসায়ন বিদ্যায় বিভিন্ন পরীক্ষণ বা গবেষণার কাজে বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণের ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এ কারণে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের দ্রবণ তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন একক সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা প্রয়োজন। তাছাড়া এ সকল একক ব্যবহার করে বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরির দক্ষতা অর্জন করতে হবে। পরীক্ষাগারে বিভিন্ন প্রকার বিশ্লেষণিক জানা ঘনমাত্রার দ্রবণ ব্যবহৃত হয়। এসকল জানা ঘনমাত্রার দ্রবণকে প্রমাণ দ্রবণ বলে। প্রমাণ দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন একক বা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন - এদের মধ্যে নরমালিটি ও মোলারিটি আয়তনিক বিশ্লেষণে বেশি ব্যবহৃত হয়।

মোলার দ্রবণ : যদি কোনো নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় এক লিটার দ্রবণের মধ্যে এক মোল দ্রব দ্রবীভূত থাকে তবে তাকে ঐ দ্রবের মোলার দ্রবণ বলা হয়। মোলার দ্রবণের একক হচ্ছে মোল/লিটার (mol/L) এবং একে M দ্বারা প্রকাশ করা হয়। সাধারণত মোলার ঘনমাত্রাকে মোলারিটিও বলা হয়। কোনো দ্রবণের মোলারিটি বা মোলার ঘনমাত্রা নিম্নলিখিত সূত্র দ্বারা নির্ণয় করা হয়।

$$\text{মোলারিটি বা মোলার ঘনমাত্রা, } \mathbf{M} = \frac{\text{দ্রবের মোল সংখ্যা (n)}}{\text{লিটারে দ্রাবকের আয়তন (v)}}$$

উদাহরণ : এক লিটার 1 মোল/লিটার Na_2CO_3-এর দ্রবণ প্রস্তুত করতে হলে কত গ্রাম Na_2CO_3 প্রয়োজন হবে?

এক মোল Na_2CO_3এর ভর = গ্রামে প্রকাশিত Na_2CO_3এর আণবিক ভর

= 2 × Na এর আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর
+ C এর পারমাণবিক ভর
+ 3 × O এর পারমাণবিক ভর

$= 2 \times 23 + 12 + 3 \times 16 = 46 + 12 + 48$

$= 106$ গ্রাম

অতএব এক লিটার 1 মোল/লিটার Na_2CO_3-এর দ্রবণ প্রস্তুত করতে হলে 106 গ্রাম Na_2CO_3 প্রয়োজন হবে।

বিভিন্ন ঘনমাত্রার মোলার দ্রবণ প্রস্তুতি : বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে :

(১) প্রথমে দ্রবণের আয়তন ও ঘনমাত্রা নির্ধারণ করতে হবে
(২) অতঃপর নির্ধারিত দ্রবণ প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় দ্রবের পরিমাণ হিসাব করতে হবে এবং সেই হিসাব অনুসারে দ্রব মেপে নিতে হবে
(৩) এবার নির্ধারিত দ্রবণের আয়তন অনুসারে নির্দিষ্ট মাপের আয়তনিক ফ্লাস্ক নিতে হবে এবং তাতে পরিমাপকৃত দ্রব যোগ করতে হবে
(৪) এবার আয়তনিক ফ্লাস্কের আয়তন নির্দেশক দাগ পর্যন্ত ধীরে ধীরে দ্রাবক যোগ করতে হবে।
(৫) এবার ফ্লাস্কের মুখ বন্ধ করে ঝাঁকাতে হবে যাতে সমসত্ত্ব দ্রবণ তৈরি হয়।

মোলার দ্রবণ তৈরির ক্ষেত্রে কতকগুলো সাধারণ হিসাব :

(ক) ১ লিটার মাপের আয়তনিক ফ্লাস্কে ১ মোল দ্রব নিয়ে প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ১ মোল/ লিটার
(খ) ৫০০ মিলি মাপের আয়তনিক ফ্লাস্কে ১ মোল দ্রব নিয়ে প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ২ মোল/ লিটার
(গ) ২৫০ মিলি মাপের আয়তনিক ফ্লাস্কে ১ মোল দ্রব নিয়ে প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ৪ মোল/ লিটার
(ঘ) ১ লিটার মাপের আয়তনিক ফ্লাস্কে ০.৫ মোল দ্রব নিয়ে প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্রা হবে ০.৫ মোল/ লিটার
(ঙ) ৫০০ মিলি মাপের আয়তনিক ফ্লাস্কে ০.৫ মোল দ্রব নিয়ে প্রস্তুতকৃত দ্রবণের ঘনমাত্র হবে ১ মোল/ লিটার

উদাহরণ-১ : 250 mLআয়তনের 1 M Na_2CO_3দ্রবণ প্রস্তুত করতে হবে।

এক মোল Na_2CO_3এর ভর = গ্রামে প্রকাশিত Na_2CO_3এর আণবিক ভর = 106 গ্রাম Na_2CO_3
অতএব 1000 mL আয়তনের 1M Na_2CO_3দ্রবণ প্রস্তুতিতে প্রয়োজন = 106 গ্রাম Na_2CO_3

$$250 \text{ mL আয়তনের } 1M\ Na_2CO_3 \text{ দ্রবণ প্রস্তুতিতে প্রয়োজন} = \frac{106 \times 250 \text{ গ্রাম } Na_2CO_3}{1000}$$

$$= 26.5 \text{ গ্রাম } Na_2CO_3$$

$$250 \text{ mLআয়তনের } 0.1M\ Na_2CO_3 \text{ দ্রবণ প্রস্তুতিতে প্রয়োজন} = 2.65 \text{ গ্রাম } Na_2CO_3$$

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১) প্রতীক ও সংকেত বলতে কী বুঝায় ? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুণ ।
২) রাসায়নিক সমীকরণ লিখার নীতিমালা বর্ণনা কর।
৩) স্থূল সংকেত থেকে আণবিক সংকেত নির্ণয়ের পদ্ধতি বর্ণনা করুণ ।
৪) মোলের ধারণা ব্যাখ্যা কর।
৫) আণবিক ও পারমাণবিক ভর বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুণ।
৬) মোলার দ্রবণ কী ? মোলার দ্রবণ প্রস্তুতির নিয়ম বর্ণনা করুণ।

সৃজনশীল প্রশ্ন

৭) উদ্দীপক : কাজল ও সজল দলগতভাবে তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয়ের পরীক্ষাটি করতে গেল। তারা একটি চিনামাটির পাত্রের ওজন নিল। এবার চিনামাটির পাত্রে 10g পরিমাণ তুঁতে নিয়ে পাত্রসহ তুঁতের ওজন নিল। অতঃপর তুঁতেসহ চিনামাটির পাত্রটি ভালোভাবে উত্তপ্ত করে প্রথমে কাজল এবং পরে সজল ওজন নিল। কাজলের নেয়া ওজনের চেয়ে সজলের নেওয়া ওজন কিছুটা বেশি হলো। অতঃপর দুজনে তাদের নেওয়া ওজন অনুসারে কেলাস পানির শতকরা ওজন হিসাব করল। দুজনের নির্ণয়কৃত তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ গাণিতিকভাবে হিসাবকৃত মানের চেয়ে কম হলো।

(ক) তুঁতের রাসায়নিক সংকেত লিখুন। ১

(খ) কেলাস পানি কী? ব্যাখ্যা করুন। ২

(গ) উদ্দীপকে উল্লিখিত তুঁতের মধ্যে কেলাস পানির পরিমাণ নির্ণয় কর? হলো ৩

(ঘ) দুজনের নির্ণয়কৃত তুঁতের কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ গাণিতিকভাবে হিসাবকৃত মানের চেয়ে কম হলো কেন? ৪

ইউনিট ৭ : রসায়ন শিখনে ব্যবহারিক কাজ

বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহারিক কাজ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এতে শিক্ষার্থী কোনো বিষয় বা ঘটনা বা সমস্যার কারণ, ফলাফল, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি অনুসন্ধানের মাধ্যমে উদঘাটন করে। আমরা এ ইউনিটে ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্য, ব্যবহারিক কাজের মডেল এবং ব্যবহারিক কাজ সম্পাদনে শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা বিষয়ে আলোচনা করবো। এ ইউনিটে অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে :

৭.১ রসায়নের ব্যবহারিক কাজের লক্ষ্য ও শিখন এবং ব্যবহারিক কাজে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন

৭.২ ব্যবহারিক কাজে অনুসন্ধানের মডেল, মাধ্যমিক শিক্ষাক্রম অনুসারে নমুনা অনুসন্ধান

৭.৩ ব্যবহারিক কাজের জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

৭.১ রসায়নের ব্যবহারিক কাজের লক্ষ্য ও শিখন, এবং ব্যবহারিক কাজে অনুসন্ধানের প্রয়োজনীয়তা ও ধরন

বিজ্ঞান শিখন শেখানো কার্যক্রমে ব্যবহারিক কাজ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে বেশকিছু ধরনের শিখন নিশ্চিত করা যায়। রসায়নের ব্যবহারিক কাজের উদ্দেশ্যগুলোকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা :

ক. **শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তিক শিখন (Cognitive learning) :** রসায়নের তত্ত্ব ও ধারণাসমূহকে বুঝতে, ব্যাখ্যা করতে ও এদের সত্যতা যাচাই করতে ব্যবহারিক কার্যাবলি প্রয়োজন। ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিখনকে শক্তিশালী করে। বর্তমানে গঠনবাদের আলোকে বলা যায়, ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞানকে পরিমার্জিত করে তাকে পুনর্গঠনে সহায়তা করে।

খ. **শিক্ষার্থীদের মনোপেশীজ দক্ষতার উন্নয়ন (Development of Psychomotor skills) :** ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি নিপূণভাবে ব্যবহার করার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটায়, যেমন- ব্যুরেট ও পিপেট কীভাবে ব্যবহার করতে হয়, ভর পরিমাপক দাঁড়িপাল্লা বা স্কেলের সাহায্যে কীভাবে নিখুঁতভাবে ভর পরিমাপ করা যায় ইত্যাদি। এই দক্ষতাসমূহ শিক্ষার্থীরা যেমন সাধারণ ও কারিগরি ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারে, তেমনি ভবিষ্যতে একজন বিজ্ঞানী বা বিজ্ঞান পেশাজীবী হিসেবে কাজ করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে হয়।

গ. **অনুসন্ধানমূলক দক্ষতার উন্নয়ন (Development of Investigation skills) :** ব্যবহারিক কাজের আরেকটি লক্ষ্য শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানমূলক দক্ষতার উন্নয়ন। অনুসন্ধানমূলক দক্ষতা মূলত সমস্যা চিহ্নিতকরণ, পরিকল্পনা প্রণয়ন, উপাত্ত সংগ্রহ, উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ, ফলাফলের ব্যাখ্যাদান এবং মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ ইত্যাদি কাজের সমন্বয়ে গঠিত। পরবর্তী দৈনন্দিন জীবনে একজন শিক্ষার্থী বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট সমস্যা সমাধানে এই অনুসন্ধানমূলক দক্ষতাসমূহের প্রয়োগ ঘটাবে বলে আশা করা হয়। একইসাথে, শিক্ষার্থী পরবর্তীতে রসায়নবিজ্ঞানী বা বিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট কোনো পেশাজীবী হলে তাকে অবশ্যই অনুসন্ধানমূলক দক্ষতার প্রয়োগ ঘটাতে হবে।

ঘ. **শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধ ও বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়ন (আবেগিক শিখন) :** ব্যবহারিক কাজ শিক্ষার্থীদের আনন্দ ও পরিতুষ্টি দেয় যা তাদের বিজ্ঞান শেখা ও বিজ্ঞান চর্চার প্রতি আগ্রহ, প্রেষণা, আত্মবিশ্বাস ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটায়। একই সাথে এটি নৈর্ব্যক্তিকতা, যাচাই প্রবণতা, অনুসন্ধিৎসা, পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভরতা এবং যুক্তিনির্ভরতা ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক মূল্যবোধের উন্নয়ন ঘটায়, যা শিক্ষার্থীদের বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ করতে ও চিন্তা করতে সাহায্য করে।

ব্যবহারিক কাজের ধরন

রসায়ন শিখন-শেখানোতে বিভিন্ন ধরনের ব্যবহারিক কাজ রয়েছে। বিভিন্ন বিবেচনায় রসায়নের ব্যবহারিক কাজকে বিভিন্ন ক্যাটেগরি বা শ্রেণিতে ফেলা যায়। একটি বিবেচনা হলো কাজের উদ্দেশ্য, আরেকটি বিবেচনা হলো কাজের বৈশিষ্ট্য।

গুণগত ও পরিমাণগত রাসায়নিক বিশ্লেষণ : রসায়নের ব্যবহারিক কাজকে উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় - গুণগত বিশ্লেষণ ও পরিমাণগত বিশ্লেষণ। গুণগত বিশ্লেষণ হলো কোনো পদার্থে বা নমুনায় কী কী উপাদান বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে তা নির্ণয় করা। যেমন– একটি লবণের নমুনায় কী কী ক্যাটায়ন ও অ্যানায়ন আছে তা নির্ণয় করা গুণগত বিশ্লেষণ। আবার কোনো দ্রবণ অম্লীয় না ক্ষারীয় তা নির্ণয় করাও গুণগত বিশ্লেষণ। অন্যদিকে কোন পদার্থে বা নমুনায় কোন উপাদান কত পরিমাণে আছে তা নির্ণয় করা পরিমাণগত বিশ্লেষণ। একটি দ্রবণের pH কত তা নির্ণয় করা পরিমাণগত বিশ্লেষণ। অথবা তুঁতের মধ্যে পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় একটি পরিমাণগত বিশ্লেষণ।

ব্যবহারিক কাজের কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবহারিক কাজকে চারটি দলে (Johnstone and Al-Shuaili, 2001) ভাগ করা যায়। বিবেচ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

ক. কাজটির সমস্যা বা প্রশ্ন নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে কি না
খ. কাজটি কীভাবে করা হবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া আছে কি না
গ. কাজটি করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া আছে কি না
ঘ. কাজটির ফলাফল বা প্রশ্নের উত্তর জানা আছে কি না

উপরিউক্ত বৈশিষ্টের ভিত্তিতে ব্যবহারিক কাজগুলোর ধরনা আলোচনা করা হলো।

যাচাইকরণ (verification) : এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন বা সমস্যা, উপকরণ, কার্যপদ্ধতি, এবং প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর বলে দেওয়া থাকে। শিক্ষার্থীদের শুধু উত্তরটি যাচাই (verification) করতে হয়। এ ধরনের ব্যবহারিক কাজকে বলা হয় যাচাইকরণ বা verification। বাংলাদেশে আমরা সাধারণত এ ধরনের ব্যবহারিক কাজই বেশি দেখে থাকি। নিচের কাজটি বিবেচনা করি। এখানে কাজের শিরোনাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে, বিক্রিয়ায় অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হবে।

৭.৭ অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া পরীক্ষার মাধ্যমে প্রদর্শন

প্রয়োজনীয় উপকরণ : সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ, ফেরাস সালফেট, বিশুদ্ধ পানি, টেস্টটিউব।

একটি পরিষ্কার টেস্টটিউব নাও। টেস্টটিউবে 1 মি.লি. ফেরাস সালফেট দ্রবণ নিয়ে তাতে ফোঁটায় ফোঁটায় সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ যোগ কর এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

$$FeSO_{4(aq)} + 2NaOH_{(aq)} \longrightarrow Fe(OH)_{2(s)} + Na_2SO_{4(aq)}$$

ফেরাস সালফেট দ্রবণের সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড দ্রবণ বিক্রিয়া করে পানিতে অদ্রবণীয় ফেরাস হাইড্রক্সাইড ও দ্রবণীয় সোডিয়াম সালফেট উৎপন্ন হয়। অদ্রবণীয় হালকা সবুজ বর্ণের ফেরাস হাইড্রক্সাইড টেস্টটিউবের তলদেশে অধঃক্ষেপ হিসেবে জমা হয়।

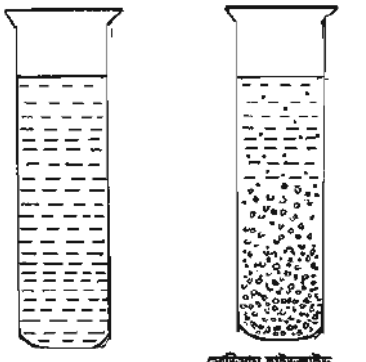

চিত্র ৭.৪ : অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া

চিত্র ৭.১ : মাধ্যমিক রসায়ন বইয়ে একটি যাচাইকরণ ধরনের ব্যবহারিক কাজ যেখানে ফলাফলটি শিক্ষার্থীদের কাছে জানা থাকে।

নির্দেশিত অনুসন্ধান (guided inquiry) : এ ধরনের কাজের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন বা সমস্যা, উপকরণ এবং কার্যপদ্ধতি বলে দেওয়া থাকে। নির্ধারিত কার্যপদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। এ ধরনের কাজকে বলা হয় নির্দেশিত অনুসন্ধান বা guided inquiry। লবণের গুণগত বিশ্লেষণ এ ধরনের নির্দেশিত অনুসন্ধান যেখানে প্রদত্ত কার্যপদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে লবণটি কী তা বের করতে হয়।

বিক্রিয়ার হার পরীক্ষা:

চারটি টেস্টটিউব বা স্বচ্ছ কাচের গ্লাস নাও এবং তাদেরকে 1, 2, 3 ও 4 নম্বর দিয়ে চিহ্নিত কর। প্রতিটি টেস্টটিউবে সমপরিমাণ আনুমানিক 0.5/1 মি.গ্রা. সোডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) অথবা কাপড়কাচা সোডা নাও। অতঃপর 1 ও 2 নম্বর টেস্টটিউবে স্বাভাবিক পানি এবং 3 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে গরম পানি যোগ করে 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবে 1 মি.লি. লেবুর রস (Citric acid) অথবা ভিনেগার (5-6% Acetic acid) মিশ্রিত করে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ কর।

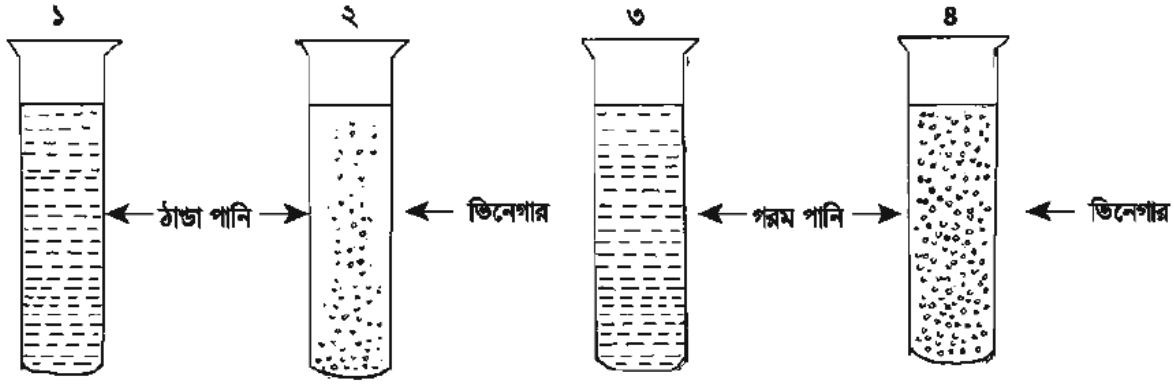

চিত্র ৭.৩ : সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের সাথে ভিনেগার বা অ্যাসেটিক এসিডের বিক্রিয়া।

১. কোন কোন টেস্টটিউবে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

২. কোন টেস্টটিউবে অধিক পরিমাণে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

৩. কোন টেস্টটিউবে সবচেয়ে কম পরিমাণে বুদবুদ করে গ্যাস নির্গত হয় ?

৪. 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবের কোনটিতে বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয় ?

চিন্তা কর: 2 ও 4 নম্বর টেস্টটিউবের একটিতে বেশি পরিমাণে গ্যাস নির্গত হয় কেন ?

চিত্র ৭.২ মাধ্যমিক রসায়ন বইয়ে একটি নির্দেশিত অনুসন্ধান যেখানে ফলাফলটি শিক্ষার্থীদের কাছে জানা থাকে না।

নির্দেশিত উন্মুক্ত অনুসন্ধান (open guided inquiry) : এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন বা সমস্যা এবং উপকরণ অথবা শুধু অনুসন্ধানের বিষয় বলে দেওয়া থাকে। উপকরণ ও কার্যপদ্ধতি নির্বাচন করে শিক্ষার্থীদের নিজেদেরই প্রশ্ন বা সমস্যার উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। যেমন, শিক্ষক যদি বিদ্যালয়ের পাশের খাল বা নদীর পানিতে রাসায়নিক দূষণ ঘটেছে কি না তা অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদেরকে সমস্যা নির্ধারণ করে দেন যে, পানিতে ভারী ধাতুর ঘনমাত্রা কত, পানির pH কত ইত্যাদি মেপে পানি দূষিত হয়েছে কি না নির্ণয় করতে হবে। এরকম একটি সমস্যা শিক্ষার্থীরা নিজেরা যদি কার্যপদ্ধতি নির্বাচন করে সমাধানের চেষ্টা করে তাহলে তা হবে নির্দেশিত উন্মুক্ত অনুসন্ধান।

উন্মুক্ত অনুসন্ধান (open inquiry) : অনুসন্ধানের মধ্যে সবচেয়ে উন্মুক্ত হচ্ছে এটি যেখানে শিক্ষার্থীদের নিজেদের অনুসন্ধানের প্রশ্ন বা সমস্যা নির্বাচন করতে হয় এবং সে অনুযায়ী উপকরণ ও কার্যপদ্ধতি নির্বাচন করে সম্ভাব্য উত্তর খুঁজে বের করতে হয়। এরকম অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজেও প্রশ্নের উত্তর জানেন না! একটি উদাহরণ দেওয়া যাক এ ধরনের অনুসন্ধানের। শিক্ষক যদি বিদ্যালয়ের পাশের খাল বা নদীর পানির দূষণ ঘটেছে কি না তা অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদের বলেন যেখানে শিক্ষক বলবেন না যে, কী পরিমাপ করে দূষণ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে কিংবা কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে কিংবা কী পদ্ধতিতে কাজটি করতে হবে। কোনো একদল শিক্ষার্থী পানিতে ভারী ধাতুর ঘনমাত্রা পরিমাপ করে দূষণ ঘটেছে কিনা তা বলতে পারে, আবার কোনো একদল শিক্ষার্থী পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের ঘনমাত্রা ও পানির pH মেপে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে । এরকম একটি সমস্যায় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই চলক বা নিয়ামক নির্বাচন করবে এবং প্রয়োজনী কার্যপদ্ধতি নির্বাচন করে কাজটি সম্পন্ন করবে।

নিচের ছকটিতে উপরে বর্ণিত চার ধরনের ব্যবহারিক কাজের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে তুলনা দেওয়া হলো।

অনুসন্ধানের ধরন	**সমস্যা**	**উপকরণ**	**কার্যপদ্ধতি**	**ফলাফল**
যাচাইকরণ	সুনির্দিষ্ট ও দেওয়া থাকে	সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে	সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে কীভাবে কাজটি করতে হবে	শিক্ষার্থীদের জানা থাকে
নির্দেশিত অনুসন্ধান	সুনির্দিষ্ট ও দেওয়া থাকে	সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে	সুনির্দিষ্টভাবে বলা থাকে কীভাবে কাজটি করতে হবে	জানা থাকে না
নির্দেশিত উন্মুক্ত অনুসন্ধান	সুনির্দিষ্ট ও দেওয়া থাকে	কোন কোনো ক্ষেত্রে বলা থাকে কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, কোনো ক্ষেত্রে বলা থাকে না	কীভাবে কাজটি করতে হবে তা বলে দেওয়া হয় **না**	জানা থাকে না
উন্মুক্ত অনুসন্ধান	অনুসন্ধানের ক্ষেত্র বলা হয় শুধু; সমস্যা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া হয় না	কী উপকরণ ব্যবহার করতে হবে তা বলা থাকে **না**	কীভাবে কাজটি করতে হবে তা বলে দেওয়া হয় **না**	শিক্ষার্থীদের জানা থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষকও জানেন না।

৭.২ অনুসন্ধানমূলক কাজের মডেল

আমরা যদি আমাদের দেশের রসায়ন ও অন্যান্য বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখা যাবে তাদের বেশিরভাগই হয়তো যাচাইকরণ (চিত্র-৭.১) বা নির্দেশিত অনুসন্ধানের (চিত্র-৭.২) মধ্যে পড়ে। বর্তমান শিক্ষাক্রমে চেষ্টা করা হয়েছে ব্যবহারিক কাজগুলোকে নির্দেশিত অনুসন্ধান ও নির্দেশিত উন্মুক্ত অনুসন্ধানের দিকে নিয়ে যেতে। আমাদের দেশে এখনও উম্মুক্ত অনুসন্ধানের চর্চা আমরা করতে পারছি না। তবে উন্নত বিশ্বে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ অনেকটাই উন্মুক্ত অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। আমরা এখন উন্মুক্ত অনুসন্ধান এর একটি মডেল আলোচনা করবো। হ্যাকলিং এবং ফেয়ারব্রাদার (১৯৯৬) উন্মুক্ত অনুসন্ধান পরিচালনাকে ৪টি ধাপে ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো, উন্মুক্ত অনুসন্ধানে এই চারটি ধাপের প্রতিটি কাজই শিক্ষার্থীরা করবে, কেবল প্রয়োজনবোধে শিক্ষক তাদেরকে নির্দেশনা দিবেন। শিক্ষার্থীদের সাধারণত দলগতভাবে কাজ করতে দেওয়া হয়। ধাপ চারটি নিম্নরূপ :

- প্রথম ধাপ : অনুসন্ধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন
- দ্বিতীয় ধাপ : পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা পরীক্ষণ
- তৃতীয় ধাপ : তথ্য প্রক্রিয়াকরণ
- চতুর্থ ধাপ : মূল্যায়ন

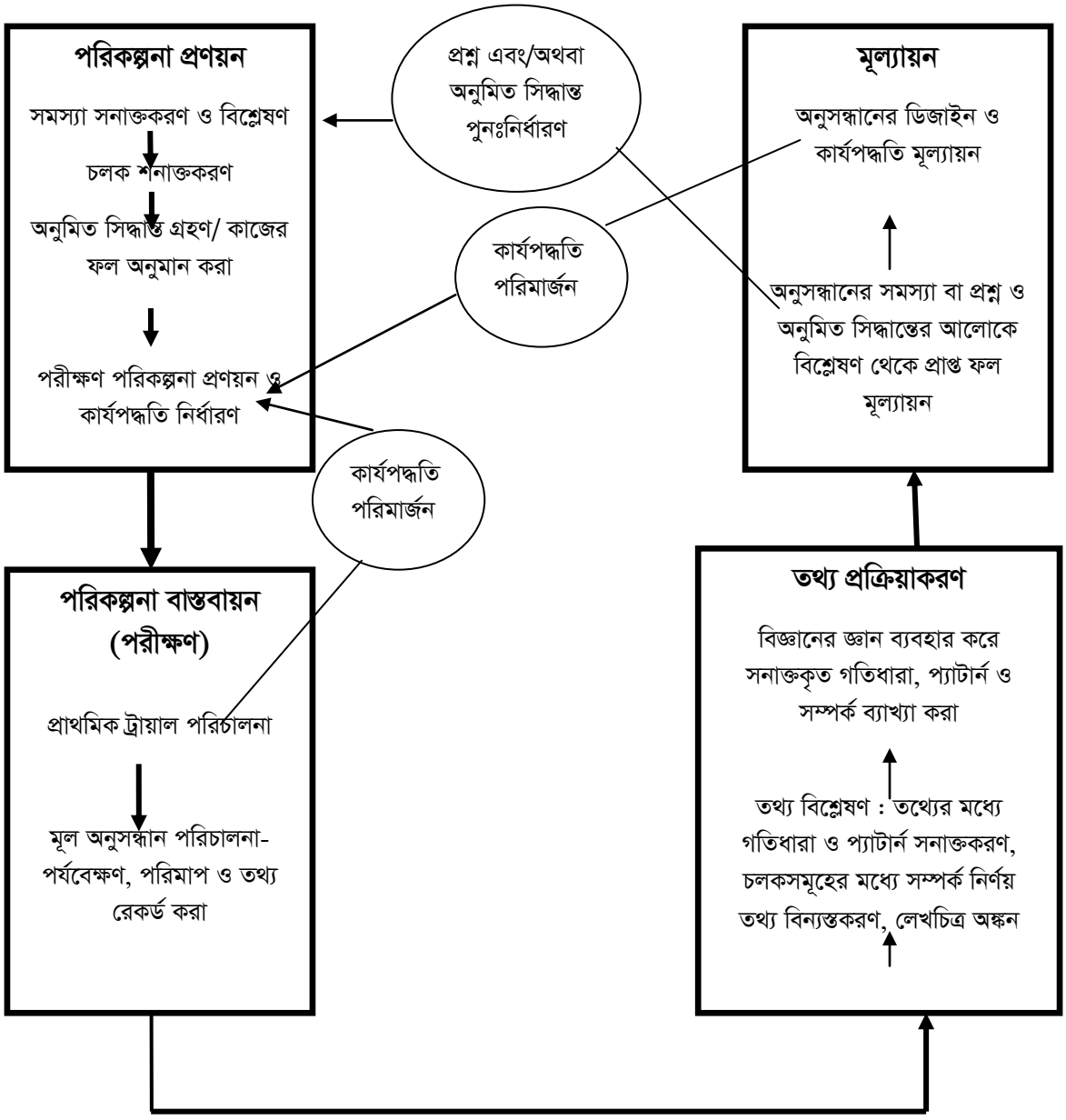

চিত্র ৭.৩ : অনুসন্ধানের একটি মডেল (Hackling and Fairbrother, ১৯৯৬, পৃ. ২৭)

উন্মুক্ত অনুসন্ধানের প্রথম ধাপটি হলো- অনুসন্ধানের পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই ধাপে, অনুসন্ধানের সমস্যা সনাক্ত করার পর সেটি বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত নিয়ামক বা চলকসমূহ সনাক্ত করা হয়। এরপর অনুসন্ধানের জন্য অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis) গঠন অথবা ফলাফল সম্পর্কে পূর্বানুমান করা হয়। এরপর কোন চলক স্থির রেখে কোন চলকটি পরিবর্তন করা হবে তা নির্ধারণসহ অনুসন্ধানের কৌশল এবং প্রক্রিয়া নির্ধারণ করা হয়।

দ্বিতীয় ধাপে অর্থাৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন বা conducting ধাপে প্রথমে অনুসন্ধান কৌশলের কার্যকারিতা যাচাইয়ের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে পরীক্ষণটি সম্পন্ন করা হয়। প্রয়োজনবোধে অনুসন্ধান কৌশল এবং পদ্ধতিকে পরিমার্জন করা হয়। এরপর মূল কাজ বা পরীক্ষণটি সম্পন্ন করা হয়। এ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণ ও পরিমাপের মাধ্যমে data বা উপাত্ত সংগ্রহ এবং রেকর্ড করা হয়।

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের তৃতীয় ধাপটি হলো- তথ্য প্রক্রিয়াকরণ বা processing। এ ধাপে পরীক্ষণে প্রাপ্ত তথ্যকে ছক বা লেখচিত্রের মাধ্যমে সুবিন্যস্ত করা হয়। এরপর বিন্যস্ত তথ্যকে বিশ্লেষণ করা হয়। অর্থাৎ, চলকগুলোর মাঝে প্যাটার্ন ও গতিধারা/প্রবণতা এবং সম্পর্ক খুঁজে বের করা হয়। এরপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তথ্যের এই গতিধারা/প্রবণতা অথবা সম্পর্কের ব্যাখ্যা দাঁড় করানো হয়।

অনুসন্ধানের সর্বশেষ ধাপটি হলো– অনুসন্ধান পদ্ধতি এবং ফলাফলের মূল্যায়ন। অনুসন্ধানের সমস্যা, প্রশ্ন অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রাপ্ত ফলাফলের মূল্যায়ন করা হয়। অনুসন্ধানের ফলাফল নির্ধারিত সমস্যা, প্রশ্ন অথবা অনুমিত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হলে সমস্যা অথবা অনুমিত সিদ্ধান্ত পুনঃনির্ধারণ করা হয়। সবশেষে, অনুসন্ধানের ডিজাইন এবং ব্যবহৃত কৌশল ও পদ্ধতিরও মূল্যায়ন করা হয়। প্রয়োজনে এই কৌশল ও পদ্ধতির পরিমার্জন করা হয় এবং গবেষণা প্রশ্ন ও অনুমিত সিদ্ধান্ত পুনর্গঠন করে পুনরায় পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা হয়।

অনুসন্ধানমূলক কাজ সম্পাদন শেষে শিক্ষার্থীদের রিপোর্ট বা প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হয়। এই প্রতিবেদনে সম্পাদনকৃত কাজের বর্ণনা, তথ্য বিশ্লেষণ, ফলাফল ও ফলাফল মূল্যায়ন উপস্থাপন করতে হয়। প্রতিবেদন এককভাবে বা দলগতভাবে করা যেতে পারে তবে বর্তমান শিক্ষাক্রমে প্রতিবেদন প্রণয়ন এককভাবে করার কথা বলা হয়েছে।

৭.৩ ব্যবহারিক কাজের জন্য শিক্ষকের প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা, প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি নির্বাচন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার

আমরা ইতোমধ্যে বিজ্ঞানে ব্যবহারিক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জেনেছি। ব্যবহারিক কাজ পরিচালনা করার জন্য বিজ্ঞান শিক্ষককে বিশেষভাবে দক্ষতা অর্জন করতে হবে যাতে বিজ্ঞানের ধারণাসমূহ আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও জীবনঘনিষ্ঠ করে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন । একসময় বিজ্ঞান শিক্ষায় তত্ত্ব, তথ্য ও সূত্র শেখানোকেই গুরুত্ব দেওয়া হতো, কিন্তু বর্তমানে এগুলোর সাথে সাথে এগুলো অর্জনের প্রক্রিয়াকে শেখানোর ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়। আমাদের বর্তমান শিক্ষানীতিতে 'কি শিখতে হবে' এর পরিবর্তে 'কীভাবে শিখতে হবে' এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রসায়নের তত্ত্বীয় জ্ঞানের সাথে সমন্বিতভাবে ব্যবহারিক কাজ বা অনুসন্ধান পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের পূর্ব প্রস্তুতি অতি আবশ্যক।

শিক্ষকের পূর্বপ্রস্তুতি

আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে, রসায়ন ব্যবহারিক কাজ এখন বছরের নির্দিষ্ট সময়ে আলাদাভাবে করানোর সুযোগ নেই। বিভিন্ন তত্ত্বীয় বিষয় শিখন-শেখানোর সুবিধার্থে তত্ত্বীয় বিষয়ের সাথে সাথেই সমন্বিতভাবে ব্যবহারিক কাজ সম্পাদন করতে হবে। এজন্য শিক্ষককে সবসময় ভালোভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে।

- শিক্ষকের প্রস্তুতিতে সবচেয়ে ভালোভাবে সাহায্য করতে পারে ইউনিট বা অধ্যায়ের জন্য একটি পরিকল্পনা। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুর আগে একজন শিক্ষককে ভালোভাবে পুরো অধ্যায়টির ওপর দখল নিতে হবে। এজন্য প্রথমেই তাকে দেখতে হবে শিক্ষাক্রমে এ অধ্যায়ের জন্য কী কী শিখনফল নির্ধারণ করা আছে। শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা সম্পর্কেও শিক্ষাক্রমে ধারণা দেওয়া থাকে। শিক্ষককে শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক পড়ে বুঝতে হবে কোন ব্যবহারিক কাজটি শিক্ষার্থীদের কোন জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জনে সহায়তা করবে। এরপর শিক্ষক পুরো অধ্যায়টির জন্য একটি পরিকল্পনা সাজাবেন।
- পুরো অধ্যায়টিতে যে ব্যবহারিক কাজগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে সেগুলো পরিচালনার জন্য কী কী উপকরণ দরকার তার একটি তালিকা তৈরি করবেন। তালিকাটি নিম্নরূপ হতে পারে :

অধ্যায় ১

ব্যবহারিক কাজ	প্রয়োজনীয় উপকরণ	বিদ্যালয়ে ব্যবহার উপযোগী অবস্থায় আছে	যে যে উপকরণ সংগ্রহ করতে হবে	মন্তব্য/কীভাবে বা কোথা থেকে সংগ্রহ করা হবে

- এরপর শিক্ষক নিজে ব্যবহারিক কাজটি (বিশেষ করে নতুন হলে বা জটিল মনে হলে) নিজে নিজে করে দেখবেন (ট্রায়াল)। এতে শিক্ষক বুঝতে পারবেন কাজটি কীভাবে পরিচালনা করতে হবে আর উপকরণগুলো ঠিক আছে কি না।
- শিক্ষাক্রম, পাঠ্যপুস্তক, পূর্ব অভিজ্ঞতা ও ট্রায়ালের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের পরিচালনার জন্য শিক্ষক তার পরিকল্পনা করবেন। এখানে তিনি লক্ষ রাখবেন, কাঙ্ক্ষিত শিখনফল অর্জনের জন্য কীভাবে তত্ত্বীয় বিষয়ের সাথে ব্যবহারিক কাজের সমন্বয় বা সংযোগ সাধন করা যায়। এছাড়া উপকরণ নির্বাচনে সহজলভ্য ও স্থানীয় উপকরণ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে তিনি অবশ্যই চিন্তা করবেন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার।

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে তৈরি করার উদ্দেশ্য সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। মাধ্যমিক স্তরের সকল বিদ্যালয় তাদের ল্যাবরেটরির উন্নয়নের জন্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর থেকে বাৎসরিক একটা অনুদান/আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকে। এই টাকা দিয়ে বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরির প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের রসায়ন শিক্ষক ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার জন্য ল্যাবরেটরির যন্ত্রপাতি ব্যবহারের পাশাপাশি স্বল্পমূল্য ও সহজলভ্য জিনিস থেকে হাতে তৈরি শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের দিকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করবেন। কেননা আমাদের পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা উপকরণ নেই যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজ হাতে উপকরণ নিয়ে ব্যবহারিক কাজ করতে পারে। বাড়ির পরিত্যক্ত জিনিসপত্র (বোতল, টিনের কৌটা, পাটকাঠি, ডিমের খোসা, লেবু, জবা ফুল ইত্যাদি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় উপকরণ (বিকার, চামচ, ফানেল, লিটমাস পেপার, ইত্যাদি) তৈরি করা যায় যার নির্মাণ খরচ অতি অল্প। এসম্পর্কে পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

রসায়ন শিখন-শেখানো উপকরণ সংরক্ষণের নীতি ও কৌশল

শ্রেণিকক্ষে ও ল্যাবরেটরিতে রসায়ন শিখন শেখানো কাজ পরিচালনার জন্য যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা না হলে পরবর্তীকালে আর হয়তো ব্যবহার করার মতো উপযোগী থাকে না। আবার রাসায়নিক দ্রব্যসমূহের মধ্যে অনেকগুলো বিষাক্ত, দাহ্য কিংবা বিস্ফোরক ধরনের। ঠিকমতো সংরক্ষণ করা না হলে অনেক সময় বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই উপকরণ সংগ্রহের সাথে সাথে সেগুলো সংরক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। এসব উপকরণকে সংরক্ষণের কৌশলগুলো দুইভাগে আলোচনা করা হলো– যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ এবং রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ।

যন্ত্রপাতি সংরক্ষণ

রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সংরক্ষণে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে :

- যন্ত্রপাতিগুলো নামের অক্ষর ক্রমে স্টক রেজিস্টারে লিখতে হবে। ষ্টক রেজিস্টারে লেখার পর উপকরণ পরীক্ষাগারে পরিকল্পনা মাফিক সাজিয়ে রাখতে হবে যেন প্রয়োজনের সময় তালিকা দেখে সহজেই পাওয়া যায়। যন্ত্রপাতি প্রতিদিনের ব্যবহারের গুরুত্ব অনুসারে আলমারির ভিন্ন ভিন্ন তাকে সাজিয়ে রাখতে হবে।
- যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণের জন্য ল্যাবরেটরি কক্ষের নিরাপত্তা বিধান করতে হবে যাতে এগুলো যায়।
- লোহার যন্ত্রপাতিতে ভেসলিন লাগিয়ে রাখতে হবে যেন মরিচা না ধরে।
- তড়িৎ কোষগুলোকে আলমারিতে শুষ্ক স্থানে রাখতে হবে যেন ড্যাম্প না ধরতে পারে।
- রাবারের পাইপে যেন রৌদ্র বা তাপ না লাগে তার ব্যবস্থা করতে হবে।
- যন্ত্রপাতিসমূহ যেমন– নিক্তি ব্যবহারের পর ভালোভাবে পরিষ্কার করে ও মুছে পলিথিন বা কাগজের প্যাকেটে রাখতে হবে।
- ল্যাবরেটরি কিংবা উপকরণ রাখার কক্ষ বা আসবাবপত্র কীটপতঙ্গমুক্ত হতে হবে। কক্ষটি মাঝে মাঝে পরিষ্কার করতে হবে এবং দ্রব্যটি রৌদ্রে দিয়ে শুকিয়ে রাখতে হবে।
- প্রতিবছর একবার স্টক রেজিস্টার নিরীক্ষণ বা ভেরিফাই করা প্রয়োজন।

রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ

ল্যাবরেটরিতে ব্যবহারিক কাজ করার জন্য শিক্ষককে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রি ব্যবহারের পুর্বে তার গুণাগুণ, ব্যবহারের ক্ষেত্র, বিপদের মাত্রা সম্পর্কে পূর্ব ধারণা থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষককে রাসায়নিক দ্রব্য সামগ্রি সম্পর্কে নিচের বিষয়সমূহ গুরুত্ব সহকারে মেনে চলা প্রয়োজন। বিষয়গুলো হলো

ক. রাসায়নিক দ্রব্যের বিন্যাস (Ordering of Chemical)
খ. রাসায়নিক দ্রব্যের সংরক্ষণ (Storing of Chemical)
গ. রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার (Using of Chemical)

ক. রাসায়নিক দ্রব্যের বিন্যাস (Ordering of Chemical) : রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণে প্রথমেই একটি রাসায়নিক দ্রব্য নিরাপত্তা তথ্য পত্র বা Material Safety Data Sheet [MSDS] প্রস্তুত করে নিতে হবে। MSDS এ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানের নাম, এদের সতর্ক ব্যবহার, সম্ভাব্য ঝুঁকি ও নিরাপত্তা সতর্কতা, সংরক্ষণের তারিখ, উপাদানের পরিমাণ বর্ণিত থাকে। রাসায়নিক উপাদানের প্রতিনিয়ত ব্যবহারের মাত্রা এবং পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে আলমারির সেলফে রাখতে হবে। রাসায়নিক উপাদানকে বিন্যাসের ক্ষেত্রে ইংরেজি বর্ণমালাকে অনুসরণ না করে রাসায়নিক উপাদানের ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। যেসব রাসায়নিক দ্রব্য পরস্পরের সাথে বিক্রিয়া করে সেগুলো পাশাপাশি রাখা যাবে না। দাহ্য, অদাহ্য, বিকারক, তীব্র এসিড , তীব্র ক্ষার, বিষাক্ত পদার্থ ইত্যাদি উপাদানসমূহকে পৃথক পৃথক শেলফে সাজিয়ে রাখতে হবে। বেঞ্চের ওপর বা ফিউম হুডে রাসায়নিক দ্রব্য রাখা উচিত নয়। তাপ বা প্রত্যক্ষ সূর্যালোকের প্রভাব থেকে দাহ্য রাসায়নিক পদার্থসমূহকে নিরাপদ রাখতে হবে।

খ. রাসায়নিক দ্রব্যের সংরক্ষণ (Storing of Chemical) : রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারের পূর্বে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রাসায়নিক উপাদানসমূহকে আমরা সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারবো কি না। রাসায়নিক উপাদান ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা, রাসায়নিক উপাদানের ব্যবহার ও সম্ভাব্য বিপদের ঝুঁকি জানা দরকার। নিরাপদে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের উপায়সমূহ নিচে বর্ননা করা হলো :

- ক্ষতিকারক, বিষাক্ত ও বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্য খুব সাবধানে তালাবদ্ধ করে সংরক্ষণ করতে হবে। রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষণের জন্য দুই প্রলেপ দেওয়া প্যাকেট অথবা প্লাস্টিকের বোতলে আবদ্ধ অবস্থায় রাখতে হবে যাতে কোনোরূপ ক্ষয় বা মরিচা না ধরে। এ্যাসিডসমূহকে তাদের ধর্ম অনুসারে রঙিন অথবা সাদা কাচের বোতলে সংরক্ষণ করতে হবে ।
- প্রত্যেকটি রাসায়নিক দ্রব্যের নামের লেবেল স্পষ্ট করে লিখতে হবে সংরক্ষণ পাত্রের গায়ে। খেয়াল রাখতে হবে লেবেলে পদার্থের নাম, সংকেত, সংগ্রহের তারিখ, দ্রব্যের ব্যবহারের মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, দ্রব্যটি কতটা বিপজ্জনক এবং সম্ভাব্য ব্যবহার বিধি লিখতে হবে। লেবেল নষ্ট হওয়ার পূর্বেই পুনরায় লেবেল লাগাতে হবে।
- কোনো অবস্থায় যেন রাসায়নিক পদার্থ মেঝেতে বা উন্মুক্ত স্থানে না থাকে। রাসায়নিক পদার্থ চোখের সমান উঁচু ক্যাবিনেটে রাখা বাঞ্ছনীয়।
- উচ্চ তাপমাত্রায় সংবেদনশীল বা বিয়োজিত হয় এরূপ রাসায়নিক দ্রব্যকে রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করতে হবে
- দ্রবণের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা লিখতে হবে এবং এর প্রস্তুতির তারিখ উল্লেখ করে লেবেল করতে হবে।

রাসায়নিক পদার্থ রাখার বোতলে বিভিন্ন সতর্কীকরণ চিহ্ন ব্যবহার করা হয় যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এ সকল চিহ্ন বা প্রতীকগুলো হ্যাজার্ড চিহ্ন (Hazard symbol) নামে পরিচিত। রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনকারী ফ্যাক্টরিসমূহ এসব প্রতীক ব্যবহার করে থাকে। নিচে ল্যাবরেটরিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ঝুঁকি ও ঝুঁকির মাত্রা নির্দেশের ক্ষেত্রে নির্ধারিত প্রতীক ও সাবধাণতা উল্লেখ করা হলো :

প্রতীক	রাসায়নিক উপাদানের ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
১। দাহ্য পদার্থ (Flammable)	অ্যালকোহল, অ্যারোসল, ইথোক্সি ইথেন, ইথাইন গ্যাস, বেনজিন, টলুইন, ইথানোয়িক এসিড ইত্যাদি পদার্থ আগুনের সংস্পর্শে এলে মারাত্মকভাবে প্রজ্জ্বলিত হয়। তাই এদেরকে অতি সাবধানে আগুন থেকে দূরে সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণের স্থানটিতে স্বাভাবিক চলাচল ও পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা থাকতে হবে। সংরক্ষিত পদার্থের রেকর্ড কপি ফায়ার সার্ভিসে দিয়ে রাখতে হবে।
২। অস্বস্তিকর/ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টিকারী **(Irritant)**	গাঢ় ক্ষার, সোডিয়াম, ফেনল, ক্লোরফর্ম, এসিটোন, পিকরিক এসিড, কীটনাশক ও অধিকাংশ বালাইনাশক ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ ত্বক ও চোখের সংস্পর্শে এলে প্রদাহ সৃষ্টি করে। এসব পদার্থ অবশ্যই ক্যাবিনেটে তালাবদ্ধভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। ব্যবহারের সময় হ্যান্ড মোজা, নাকে মুখে মাস্ক, অ্যাপ্রোন, চোখে নিরাপদ চশমা ব্যবহার করতে হবে।

প্রতীক	রাসায়নিক উপাদানের ঝুঁকি, ঝুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
৩। ক্ষয়কারক (Corrosive)	যে সব রাসায়নিক পদার্থের pH এর মান ২ .৫ বা তার চেয়ে কম অথবা ১২.৫ এর চেয়ে বেশি তারাই সাধারণত ক্ষয়কারক। যেমন– কস্টিক সোডা, কস্টিক পটাশ, গাঢ় খনিজ এসিডসমূহ, ব্লিচিং দ্রবণ, লিকার, অ্যামোনিয়া, ইত্যাদি রাসায়নিক ক্ষয়কারী পদার্থ জীবন্ত টিস্যুকে আক্রমণ ও ধ্বংস করে এবং এসব পদার্থের সংস্পর্শে চামড়া পুড়ে যায় এবং চোখের ক্ষতি হয়। তাই এসব পদার্থ ব্যবহারের সময় নিরাপদ চশমা, হাতে মোজা, নাকে মুখে মাস্ক ও শরীর এর জন্য অ্যাপ্রোন ব্যবহার করা উচিত।
৪। **বিষাক্ত পদার্থ (Toxic)**	পটাশিয়াম সায়ানাইড, মারকারি, ফেনল, সোডিয়াম আজাইড, মিথানল, কারসিনজেন, মিউটাজেন, ক্রোমিয়াম লবণ, রাসায়নিক কীটনাশক ও বালাইনাশক রাসায়নিক পদার্থ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। শ্বাসের সাথে, গলাধকরণ করলে বা চামড়ার ওপর পড়লে চামড়ায় ক্যানসার এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। তাই এসব পর্দাথ ব্যবহারের সময় নিরাপদ চশমা, হাতে মোজা, নাকে মুখে মাস্ক ও শরীরে প্রবেশ এড়াতে এপ্রোন ব্যবহার করা উচিত।
৫। বিস্ফোরক (Explosive)	নাইট্রোগ্লিসারিন, টি এন্ড টি, পিকরিক এসিড , ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড, পুরাতন টলেন বিকারক ইত্যাদি বিস্ফোরক পদার্থ নিজে নিজেই বিক্রিয়া করে। উচ্চ তাপমাত্রা, উচ্চচাপ ও আঘাতজনিত কারণে নিজে নিজে এরা বিস্ফোরণ ঘটায়। তাই এদের ব্যবহারের সময় সাবধানে নাড়াচাড়া করা, ঘর্ষণ এড়ানোর জন্য নির্জনে স্থিতিশীল জায়গায় সংরক্ষণ করা উচিত।
৬। তেজস্ক্রিয় রশ্মি (Radiation)	X-Ray যন্ত্রপাতি, তেজস্ক্রিয় মৌল এবং এদের আইসোটোপসমূহ যা মানবদেহকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে এবং শরীরে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত ও এমনকি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। এ ধরনের তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গমন রোধে লেড (Pb) ধাতুর আবরণযুক্ত পাত্রে এদের সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
৭। দীর্ঘমেয়াদে স্বাস্থ্য ঝুঁকি (Health Hazard)	কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (CO_2), কার্বন মনোঅক্সাইড গ্যাস (CO), সালফার ডাই অক্সাইড গ্যাস (SO_2), হাইড্রোজেন পার অক্সাইড গ্যাস (H_2O_2), ফেনল, ইথানয়িক এসিড , সিলভার নাইট্রেট ইত্যাদি মানবদেহের শ্বাস-প্রশ্বাস সংশ্লিষ্ট তন্ত্রের জন্য সংবেদনশীল ও সংক্রমন ঘটাতে পারে। এমনকি মারাত্মক ব্যাধি ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে। তাই এদেরও নির্জন স্থানে সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সময় নিরাপদ চশমা, হাতে মোজা, নাকে মুখে মাস্ক ও শরীরে প্রবেশ এড়াতে অ্যাপ্রোন ব্যবহার করা প্রয়োজন।
৮। বৈদ্যুতিক ঝুঁকি (Electric hazard)	ব্যবহারিক কাজে বিদ্যুত ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাবধান থাকতে হবে। ভিজা হাতে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার এমনকি বৈদ্যুতিক সুইচ ব্যবহার করা যাবে না। বিদ্যুতের সংযোগ ঢিলেঢালা আছে কিনা তা দেখে ব্যবহার করা উচিত।
১০। জৈব দূষক (Organic polutant)	পেট্রোলিয়াম জাতীয় দূষক, সংশ্লেষিক কীটনাশক ও বালাইনাশক, সংশ্লেষিক রঙ বিভিন্ন প্রকারের জৈব দ্রাবক, সাবান, ডিটারজেন্ট, প্লাস্টিক জার ইত্যাদি জৈব দূষক সরাসরি পরিবেশে ফেলা যাবে না । এদের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্লাস্টিকের বোতলে মুখ আটকিয়ে নির্জন স্থানে রাখতে হবে।

চিত্র ৭.৪ : নির্ধারিত প্রতীক ও সাবধানতা

গ. ব্যবহার (Using of Chemical) : ব্যবহারিক কাজে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত শিক্ষককে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করার পূর্বে এসব পদার্থের ব্যবহারের ক্ষেত্র, ক্ষতিকর প্রভাব, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, উৎপাদনের তারিখ ইত্যাদি সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। পাত্রের গায়ের লেবেল দেখে সঠিক পদার্থ নেওয়া হচ্ছে কিনা নিশ্চিত হতে হবে। কোনো অবস্থায় পাত্র থেকে রাসায়নিক পদার্থ চামচ দিয়ে বের করে পুনরায় পাত্রে রাখা যাবে না। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ড্রপার ব্যবহার করা হলে খেয়াল রাখতে হবে এক পাত্রের ড্রপার অন্য পাত্রে না যায়। রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের পর পাত্রের মুখ ভালোভাবে বন্ধ করে রাখা উচিত। রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের পর পরই বোতলের ছিপিগুলো এটে রাখতে হবে। উপকরণ বা রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা এবং আগের জায়গায় সাজিয়ে রাখা অবশ্য করণীয়।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। ব্যবহারিক বা অনুসন্ধানমূলক কাজ থেকে শিক্ষার্থীদের কী কী আবেগিক শিখন হয়?

২। নির্দেশিত অনুসন্ধান কী?

৩। কী কী বিবেচনার ভিত্তিতে একজন শিক্ষক ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার পরিকল্পনার করবেন?

৪। কীসের ভিত্তিতে রাসায়নিক দ্রব্যসমূহকে ল্যাবরেটরিতে বিন্যস্ত করে রাখা হয়?

৫। হ্যাজার্ড চিহ্ন কী ও কেন ব্যবহার করা হয়?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। রসায়নের ব্যবহারিক বা অনুসন্ধানমূলক কাজের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

২। কীসের ভিত্তিতে রসায়নের ব্যবহারিক কাজের শ্রেণিবিভাগ করা যায়? ব্যবহারিক কাজের ধরনগুলোর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

৩। উন্মুক্ত অনুসন্ধানের একটি মডেল উপস্থাপন করুন।

৪। ব্যবহারিক কাজ সফলভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষক কীভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন আলোচনা করুন।

৫। রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণে রসায়ন শিক্ষকের করণীয় বর্ণনা করুন।

ইউনিট ৮ : রসায়ন শিখন-শেখানোর উপকরণ

শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সাথে সমৃদ্ধ করে তোলা, বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করা এবং শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করে পাঠদানকে উপভোগ্য করার জন্য শিক্ষা উপকরণ এখন অপরিহার্য বিষয়। রসায়ন বক্তৃতার বিষয় নয়, রসায়ন বিজ্ঞান শেখানোর মূল কথা হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও কাজের মাধমে শেখানো। তাই, রসায়নের মতো বিষয়কে শিক্ষার্থীদের কাছে সহজবোধ্য এবং ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য শিক্ষা উপকরণ অতি প্রয়োজনীয়। আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ায় উপকরণ ব্যবহার শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। এই ইউনিটের বিষয়বস্তুসমূহকে নিম্নোক্ত উপায়ে সাজানো হয়েছে :

৮.১ শিক্ষা উপকরণের ধারণা ও রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত উপকরণের প্রকারভেদ

৮.২ স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহারের মূল্য তৈরি ও সংগ্রহ, রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহারের নীতি ও বিবেচ্য

৮.৩ রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে তথ্য প্রযুক্তি

৮.১ শিক্ষা উপকরণের ধারণা ও রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত উপকরণের প্রয়োজনীয়তা, প্রকারভেদ ও সংগ্রহ

শিক্ষা উপকরণের ধারণা

আপনারা এডগার ডেল (Edger Dale)-এর অভিজ্ঞতার কোণ সম্পর্কে জেনেছেন হয়তো। নিচের এই কোণ থেকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে, শিক্ষার্থীরা সবচেয়ে কম শেখে শুধু পড়ার মাধ্যমে। সাধারণত দেখা যায় শিক্ষার্থী পড়ার মাধ্যমে যত তথ্য গ্রহণ করে তার ১০ শতাংশ তার মস্তিষ্কে টিকে থাকে। শিক্ষার্থী এ চেয়ে আরেকটু বেশি শেখে শোনার মাধ্যমে, তারপর স্থির চিত্র দেখার মাধ্যমে। এরপর চলন্ত ছবি ও ভিডিও দেখলে আরো বেশি শেখে। শিক্ষার্থী আরো বেশি শেখে কোনো কিছু ঘটতে দেখে এবং ঘটনার ভূমিকাভিনয় করে। তবে সবচেয়ে বেশি শিখে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে বাস্তব কোনো কাজে বা ঘটনায় অংশ নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের মাধ্যমে।

চিত্র ৮.১: এডগার ডেল এর অভিজ্ঞতার কোণ (Cone of Experience)

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে আমরা সাধারণত বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা শিক্ষার্থীদের নিকট ব্যাখ্যা করি কখনও কখনও বোর্ডে কিছু লিখে দিই। শিক্ষার্থীরা আমাদের শিক্ষকদের কথা শোনে এবং খাতায় লিখে নেয়। বাড়িতে গিয়ে হয়তো শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লেখা নোটের সাথে মিলিয়ে পাঠ্যপুস্তকটি পড়ে বোঝার চেষ্টা করে শ্রেণিকক্ষে আলোচিত ধারণাটি। শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান শিখনের এ প্রক্রিয়াটি আপনারা এবার অভিজ্ঞতার কোণের সাথে মিলিয়ে দেখুন তো। শিক্ষার্থীরা এ প্রক্রিয়ায় কেবল পড়া ও শোনার সুযোগ পায় যাতে তার খুবই কম পরিমাণে শিখন হয় এবং এ শিখন স্থায়ীও হয় না। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার্থীর শিখনকে স্থায়ী ও সার্থক করার জন্য শিক্ষককে তার শিখন-শেখানো কাজে নানা ধরনের উপকরণ ব্যবহার করতে হয়। একজন শিক্ষক শিখন-শেখানো কাজে যে সকল উপকরণ ব্যবহার করেন তাদেরকে সাধারণভাবে শিক্ষা উপকরণ বলা হয়। এ বিবেচনায় শ্রেণিকক্ষের চকবোর্ড এবং পাঠ্যপুস্তকও শিক্ষা উপকরণ। এছাড়া, শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত পোস্টার, মাল্টিমিডিয়া, কোনো একটি অণুর মডেল এসবই শিক্ষা উপকরণ।

রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা

রসায়ন শিখন শেখানো কাজে উপকরণের ব্যবহার অত্যাবশ্যক। রসায়ন পদার্থের অভ্যন্তরীণ গঠন ও ধর্ম সম্পর্কিত জ্ঞান। কোনো এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে না লাল লিটমাসকে নীল করে এটি মুখস্থ করার বিষয় নয়। মুখস্থ করলেও যে কেউ দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়তে পারে আসলে রং এর কোন পরিবর্তনটি হয় এসিডের ক্ষেত্রে। এর সহজ সমাধান আছে। কোনো শিক্ষার্থীকে যদি একবার সুযোগ দেওয়া যায়, কোনো একটি এসিডে নীল ও লাল লিটমাস কাগজ একসাথে ডুবিয়ে দেখতে, শিক্ষার্থী কখনই আর ভুলবে না যে, এসিড নীল লিটমাসকে লাল করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে হাতে কলমে বাস্তব অভিজ্ঞতার সুযোগ দেওয়া হলো তার শিখনকে স্থায়ী করার জন্য। এ ধরনের কাজের জন্য লিটমাস, এসিড ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহার আবশ্যক।

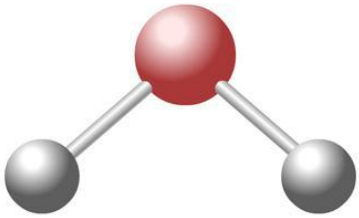

চিত্র ৮.২ : পানির অণুর মডেল

রসায়নের অনেক ধারণা আছে যা বিমূর্ত। এসকল ধারণাকে মূর্ত করার জন্য উপকরণ ব্যবহার আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন, পানির অণুর গঠন আকৃতি। খালি চোখে কিংবা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেও দেখা সম্ভব নয় পানির অণুর আকৃতি কেমন। এক্ষেত্রে খুব সহজেই কাঠি ও প্লাস্টিক বলের সাহায্যে পাশের চিত্রের মতো একটি মডেল তৈরি করতে দেওয়া যায় শিক্ষার্থীদের। শিক্ষার্থীরা এই মডেল তৈরি করার মাধ্যমে পরিষ্কার ধারণা পাবে প্রকৃতপক্ষে পানির অণুর গঠন আকৃতি কেমন।

একজন শিক্ষকের জন্যও শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার করা অনেক সুবিধা দেয়। উপকরণ ব্যবহার করে একজন শিক্ষক অতি সহজে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। উপকরণ ব্যবহারের ফলে পাঠগ্রহণে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রেষণা সৃষ্টি হয়। ফলে শ্রেণিকক্ষের একঘেয়েমী দূর হয়, পাঠদানে বৈচিত্র্য আসে। শ্রেণি ব্যবস্থাপনা সহজতর হয়ে ওঠে শিক্ষকের জন্য।

শিক্ষা উপকরণের প্রকারভেদ

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহার শুরু হওয়ার পর শুধুমাত্র চক বোর্ডকে কেন্দ্র করেই শ্রেণিতে শিখন কাজ পরিচালনা করা হতো। বর্তমানে শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারের ব্যাপ্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই শিক্ষা উপকরণ বিভিন্ন রূপ লাভ করেছে। রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহৃত উপকরণগুলোকে বিভিন্ন বিবেচনায় শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যেমন– সংগ্রহের উৎস হিসেবে উপকরণ তিন ধরনের–

(ক) বাণিজ্যিক উপকরণ : যেসব উপকরণ বানিজ্যিকভাবে কারখানায় তৈরি হয় এবং দোকান থেকে কেনা হয়। যেমন- চকবোর্ড, মাল্টিমিডিয়া, দেওয়ালে ঝোলানোর উপযোগী বড় পর্যায় সারণি, পোস্টার, রাসায়নিক দ্রব্যাদি, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

(খ) সহজলভ্য স্থানীয় উপকরণ : আশপাশের পরিবেশ ও সমাজ থেকে সংগ্রহ করা যায় এমন উপকরণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কর্তৃক সংগৃহীত বা অল্প খরচে স্থানীয়ভাবে তৈরি। যেমন– ফেলে দেওয়া প্লাস্টিক পানির বোতল কেটে ফানেল বা বিকার তৈরি।

(গ) সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত উপকরণ : আমাদের দেশে সরকারি সংস্থা যেমন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করে থাকে। আবার কোনো মন্ত্রণালয় বা ইউনিসেফের মতো প্রতিষ্ঠান বিশেষ কোনো পুস্তিকা বিতরণ করে থাকে।

ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী উপকরণকে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা : প্রক্ষিপ্ত (Projected) ও অপ্রক্ষিপ্ত (Non-projected): উপকরণ।

(১) প্রক্ষিপ্ত (Projected) উপকরণ : যে সকল উপকরণ দূর থেকে প্রক্ষেপনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে হয় এদের প্রক্ষিপ্ত উপকরণ বলে। এগুলোকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়–

- **দর্শনযোগ্য উপকরণসমূহ (Visual Aids) :** ফিল্ম স্ট্রিপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ওভারহেড প্রজেক্টর ইত্যাদি।
- **শ্রবণযোগ্য উপকরণসমূহ (Auditory Aids) :** রেডিও, গ্রামোফোন, সিডি প্লেয়ার ইত্যাদি।
- **শ্রবণ-দর্শনযোগ্য উপকরণসমূহ (Audi-Visual Aids) :** চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, আধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরে প্রদর্শিত ভিডিও ইত্যাদি।

(২) **অপ্রক্ষিপ্ত (Non-projected) :** যেসব উপকরণকে দূর থেকে প্রক্ষিপ্ত করার মাধ্যমে ব্যবহার করতে হয় না। এগুলো সবই প্রায় দর্শনযোগ্য উপকরণ, যেমন– চার্ট, গ্রাফ, নকশা, ছবি, ফটোগ্রাফ, অঙ্কিত চিত্র, পাঠ্যপুস্তক, লিফলেট, মডেল, নমুনা।

উপরিউক্ত ধরনগুলো ছাড়াও বিজ্ঞান শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রে উপকরণসমূহকে আরেকটি ধরনে ফেলা যায়। এটি হলো অনুসন্ধানমূলক শিক্ষা উপকরণ। বিজ্ঞান যেমন রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে ব্যবহারিক কাজ তথা অনুসন্ধানমূলক কাজ একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রসায়নে অনুসন্ধান পরিচালনা করার জন্য বিশেষ ধরনের উপকরণ প্রয়োজন হয়। নিচে বিভিন্ন প্রকার শিক্ষা উপকরণের বর্ণনা উদাহরণসহ দেওয়া হলো।

(ক) দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Visual Teaching Aids)

যেসব শিক্ষোপকরণ শুধুমাত্র দর্শনযোগ্য এবং শিক্ষার্থীরা দর্শন ইন্দ্রিয় ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়বস্তু আয়ত্ত করে, তাকে দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ বলে।

চিত্র ৮.৩: মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর

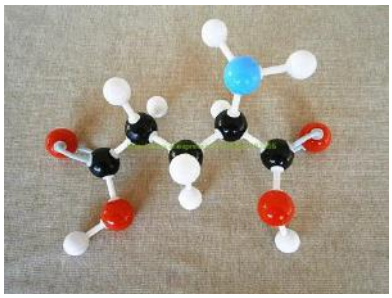

চিত্র ৮.৪ : অণুর মডেল

উদাহরণ : পাঠ্যপুস্তক, মডেল, কর্মপত্র, বাস্তব নমুনা, বোর্ড, বুলেটিন বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড, অঙ্কিত চিত্র, ছবি, মানচিত্র, ধারণা মানচিত্র, ভিপ কার্ড, প্রবাহ চিত্র, ম্যাজিক ল্যান্টার্ন, মোবাইল, চার্ট, ওভার হেড প্রজেক্টর (OHP), ফ্লিপচার্ট, নির্বাক চলচ্চিত্র।

(খ) শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audio Teaching Aids)

শোনা যায় এবং শুধুমাত্র শ্রবণ ইন্দ্রিয় ব্যবহৃত হয় এ ধরনের শিক্ষোপকরণকে শ্রবণভিত্তিক শিক্ষোপকরণ বলে।
উদাহরণ : রেডিও, ক্যাসেট প্লেয়ার, টেলিফোন, সিডি প্লেয়ার।

চিত্র ৮.৫: রেডিও

চিত্র ৮.৬: ক্যাসেট প্লেয়ার

(গ) শ্রবণ ও দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ (Audio-Visual Teaching Aids)

দর্শন ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের সক্রিয়তার মাধ্যমে যেসব উপকরণ বিষয়বস্তু উপস্থাপনে ব্যবহৃত হয়, তাকে শ্রবণ-দর্শনভিত্তিক শিক্ষোপকরণ বলে। এর উদাহরণ হলো টেলিভিশন, কম্পিউটার (সাউন্ড সিস্টেমসহ) এবং চলচ্চিত্র।

চিত্র ৮.৭ : টেলিভিশন

চিত্র ৮.৮ : ল্যাপটপ কম্পিউটার

(ঘ) অনুসন্ধানমূলক শিক্ষোপকরণ (Investigatory Teaching Aids)

যেসব উপকরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করে, নতুন তথ্য খোঁজ করে এবং পরীক্ষণমূলক কাজ করে, তাকে অনুসন্ধানমূলক শিক্ষোপকরণ বলে।

উদাহরণ : রাসায়নিক সামগ্রী, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, পরিমাপক যন্ত্রসমূহ, পরীক্ষণযন্ত্রসমূহ ও রাসায়নিক পদার্থের বাস্তব নমুনা, রাসায়নিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান।

চিত্র ৮.৯ : রাসায়নিক সামগ্রী ও যন্ত্রপাতি

রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ

আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে সরকার বিভিন্ন সময়ে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক কাজ পরিচালনার জন্য অর্থ বরাদ্দ করে কিংবা উপকরণ সরবরাহ করে থাকে। তবে সরকারি উদ্যোগ সকল উপকরণের চাহিদা মেটাতে পারে না। উপকরণের চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান শিক্ষক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তায় পরিকল্পিতভাবে উপকরণ সংগ্রহ করবেন। রসায়ন শিখন-শেখানো পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের জন্য শিক্ষকের করণীয়সমূহ নিম্নরূপ :

- ✓ প্রতিবছর শ্রেণি-কার্যক্রম শুরু হওয়ার আগেই বিষয় শিক্ষককে শিক্ষাক্রম, সম্পূর্ণ পাঠ্যবইটি ও শিক্ষক নির্দেশিকাটি অধ্যয়ন করে বিষয়বস্তু, শিখনফল ও শিখানো শেখানো কার্যক্রম বিশ্লেষণ করে প্রয়োজনীয় উপকরণের তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। কোনো প্রকার যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য কি পরিমাণ প্রয়োজন তার সঠিক পরিমাণ নিরূপণ করতে হবে।
- ✓ বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে কী পরিমাণ দ্রব্যাদি আছে তা যাচাই বা নিরীক্ষণ করতে হবে। উপকরণ অপর্যাপ্ত হলে আগে প্রাধিকার নির্ধারণ করতে হবে কোনো উপকরণটি বেশি প্রয়োজন। এরপর আইটেম অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরিমাণ দ্রব্যাদি ক্রয়ের জন্য বিদ্যালয় প্রশাসনকে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে। এক্ষেত্রে বাজার যাচাই করে সম্ভাব্য বাজেট প্রণয়ন বা সমন্বয়ের জন্য প্রশাসনকে সহায়তা করতে হবে।
- ✓ যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করতে হবে।
- ✓ বাণিজ্যিক উপকরণ ছাড়াও সহজলভ্য বা স্থানীয় বাজার থেকে স্বল্পমূল্যের উপকরণ সংগ্রহ বা ক্রয় করতে হবে।

৮.২ স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহারের মূল্য, উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ, রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ ব্যবহারের নীতি ও বিবেচ্য

আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি উপকরণ ব্যবহার শিক্ষার্থীর শিখনকে কীভাবে ফলপ্রসূ করে তোলে। আপনারা আরো উপলব্ধি করেছেন যে, রসায়ন শিক্ষায় শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার কতটা প্রয়োজনীয়। কিন্তু রসায়ন শিক্ষায় উপকরণসমূহ অনেক সময় ব্যয়বহুল হয়ে থাকে। একজন শিক্ষককে বা একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণির জন্য অনেক উপকরণ তৈরি অথবা সংগ্রহ করতে হয়। আমাদের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেক বিদ্যালয়েই উপকরণ সংগ্রহের জন্য যথেষ্ট অর্থ পাওয়া যায় না। এ সমস্যা সমাধানের উপায় হলো স্বল্প মূল্যে তৈরি বা হাতে তৈরি উপকরণ। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী স্বল্পমূল্য বা বিনামূল্যে বিভিন্ন উপকরণ সংগ্রহ করে নিজ হাতে বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি বা মডেল বা শিক্ষার উপকরণ তৈরি করতে পারেন। এসব উপকরণকে স্বল্পমূল্য বা স্বল্পমূল্যের উদ্ভাবনীমূলক (Low cost Improvised) বা বিনামূল্যে ঘরোয়াভাবে প্রস্তুত (Home Made) উপকরণ বলে। এরকম উপকরণ তৈরির সকল উপাদানই আশপাশের পরিবেশ ও কম্যুনিটি থেকে সংগ্রহ করা হয়। বিদ্যালয় ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের বাড়ি বা পরিবেশ থেকে ফেলে দেওয়া অব্যবহার্য কোনো জিনিস বা স্থানীয় বাজার থেকে খুবই অল্প দামের জিনিসপত্র কিনে এ ধরনের যন্ত্রপাতি ও উপকরণ তৈরি করা হয়। এ ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরিতে দরকার শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও সৃজনশীলতা।

স্বল্পমূল্য শিক্ষা উপকরণ তৈরির গুরুত্ব বা মূল্য

স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের শিক্ষা উপকরণের কয়েক ধরনের মূল্য রয়েছে। এগুলো নিম্নরূপ :

- **অর্থনৈতিক মূল্য :** ইতোমধ্যেই আলোচনা করা হয়েছে যে, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠার জন্যই স্বল্প ও বিনা মূল্যের উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের উপকরণ তৈরি করা হয় ফেলে দেওয়া বা অব্যবহৃত জিনিসপত্র থেকে বা অল্পদামে স্থানীয় বাজার থেকে কিনে। প্লাস্টিক বা কাঁচের বোতল ও অন্যান্য পাত্র, ব্যবহৃত ব্যাটারি, ব্যবহৃত কাঠ, নষ্ট বাল্ব, তারকাঁটা ইত্যাদি থেকে আমরা এমন উপকরণ তৈরি করতে পারি যা অনেক দামী উপকরণের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় (এহসান এবং আখতার, ২০০০)। এতে বিদ্যালয়ের অর্থের সাশ্রয় হয়।
- **শিক্ষাগত মূল্য :** স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারের শিক্ষাগত মূল্য অনেক। প্রথমত, উপকরণ তৈরিতে ও সংগ্রহে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করা হলে শিক্ষার্থীর শিখন বেশি স্থায়ী হয়। যেমন শিক্ষার্থী নিজে পানির অণুর মডেল তৈরি করলে পানির অণুর গঠন ও আকৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীর কোনো রকম দ্বিধা থাকে না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষার্থী সরাসরি এ কাজে যুক্ত হয় বলে শিক্ষার্থী রসায়ন শিখন প্রক্রিয়াতে নিজেকে একাত্ম করতে পারে, শেখাকে নিজের বলে মনে করে এবং স্ব-শিখনে উদ্বুদ্ধ হয়। তৃতীয়ত, শিক্ষার্থীদের নিজ হাতে কিছু তৈরির দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বিকশিত হয়। বিজ্ঞানের ধারণা ব্যবহার করে ব্যবহার উপযোগী কোনো যন্ত্র তৈরি করা বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য। সবশেষে, শিক্ষার্থী নিজ হাতে কোনো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে ব্যবহার করলে বিজ্ঞান শেখার প্রতি তার আগ্রহ ও আস্থা বৃদ্ধি পায়।
- **সামাজিক মূল্য :** স্বল্পমূল্য ও বিনামূল্যের উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একসাথে কাজ করেন। এর ফলে কাজের প্রতি বা কায়িক শ্রমের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তৈরি হয়। শিক্ষার্থী ও শিক্ষক একসাথে কাজ করলে সহযোগিতামূলক মানসিকতা ও দক্ষতা তৈরি হয়। আবার ফেলে দেওয়া উপকরণ ব্যবহার করে কোনো কিছু তৈরি করা হলে বিভিন্ন জিনিসপত্রের পুনঃব্যবহার ও পুনরুৎপাদনে শিক্ষার্থীদের মানসিকতা, সচেতনতা ও দক্ষতা তৈরি হয়। এটি পরিবেশ সংরক্ষণের জন্য সহায়ক।

হাতে তৈরি স্বল্পমূল্যের উদ্ভাবনীমূলক উপকরণের উদাহরণ

১. **বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ যন্ত্র :** একটি প্লাস্টিকের বাটি বা মগ, দুইটি তামার বড় রড বা কাঠ দণ্ড, কিছু তামার তার, দুইটি টেস্টটিউব, হোল্ডারসহ দুইটি ব্যাটারি প্রভৃতি উপকরণ ব্যবহার করে এটি তৈরি করা যায়।
২. **লিবিগ কনডেনসার :** ধাতু বা টিনের মোটা পাইপ, পরিত্যক্ত রাবার কর্ক, ধাতুর চিকন পাইপ ব্যবহার করে তৈরি করা যায়।
৩. **স্পিরিট ল্যাম্প :** কালির দোয়াত বা পরিত্যক্ত ছোট আকারের কাচের বোতল, কাপড়ের সলতে ব্যবহার করে তৈরি করা যায়।
৪. **গোলতলী ফ্ল্যাক্স :** পুরানো ইলেকট্রিক বাল্ব দ্বারা এটি সহজেই প্রস্তুত করা যায়।
৫. **প্লাষ্টিক বিকার :** প্লাস্টিকের গোল কৌটা, কাটার ব্লেড ও মোমবাতি দিয়ে তৈরি করা যায়।
৬. **ওয়াশ বোতল :** একটি নরম প্লাস্টিকের বোতল, প্লাস্টিকের নল, ছিদ্র বিশিষ্ট ছিপি।
৭. **বিকার, চামচ ও ফানেল :** প্লাস্টিকের পানির বোতল, কাটার, মোম, ও কাচি।

এছাড়াও বিকার, থার্মোফ্ল্যাক্স, ক্যালোরিমিটার, তারজাল, চিমটা, গ্যাসজার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি স্বল্পমূল্যের উপকরণ ব্যবহার করে হাতে তৈরি করা সম্ভব। তবে রসায়নের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহারিক কাজের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির বিস্তারিত তালিকা দেওয়া আছে।

কয়েকটি স্বল্পমূল্যের উদ্ভাবনীমূলক উপকরণ/যন্ত্রপাতি তৈরির কার্যপ্রণালি[১]

ওয়াশ বোতল

উপকরণ : ২৫০ মিলি আয়তনের একটি নরম প্লাস্টিকের বোতল, বোতলের উচ্চতার চেয়ে ২০ মিমি, ০.৫ মিমি ব্যাসবিশিষ্ট একটি কাচনল অথবা প্লাস্টিকের নল, নল ভালোভাবে প্রবেশ করতে পারে এমন ছিদ্রবিশিষ্ট একটি ছিপি যা বোতলের মুখে আটা যাবে।

চিত্র ৮.১০ : ওয়াশ বোতল

প্রস্তুত প্রণালী

- নলটির মাথায় একটি নজল তৈরি করুন অর্থাৎ তাপ দিয়ে নলটির মাথা সরু করুন।
- চিত্রের মতো নলটি বাঁকা করুন।
- ছিপির ছিদ্র দিয়ে নলটি এঁটে ঢুকান যাতে বাতাস প্রবেশ করতে না পারে।
- ছিপিটি বোতলের মুখে এঁটে বসান যাতে বাতাস যাতায়াত না করে।

ব্যবহার পদ্ধতি : বোতলে পানি ভর্তি করে চাপ দিলে নলের সরু মুখ দিয়ে সজোরে পানি বের হয়ে আসবে।

বিকার, চামচ ও ফানেল

প্রয়োজনীয় উপকরণ : ১ লিটার পরিমাণ খালি নরম প্লাস্টিকের পানির বোতল, মোম বা স্পিরিট ল্যাম্প, স্ট্যাপলার, কাঁচি।

প্রস্তুত প্রণালি : ১ লিটার সাইজের নরম প্লাস্টিকের খালি পানির বোতল নিন। বোতলটিকে তিনটি অংশে ভাগ করুন। উপরের অংশ, মধ্যকার অংশ, নীচের অংশ। বোতলের উপরের অংশ কাটার দিয়ে কাটুন। এটিকে উল্টিয়ে আমরা ফানেল হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। মধ্যের অংশটুকু দিয়ে ৬টি চামচ তৈরি করা যায়। তাই মধ্যের অংশটুকুকে কেটে ছয়টি টুকরা করতে হবে। প্রত্যেকটি টুকরার এক মাথার অংশটুকু কাঁচি দিয়ে ছোট গোলমতো করে অন্য মাথার অংশটুকু স্টেপলার দিয়ে আটকিয়ে নিন। আর নিচের যে অংশটুকু থাকল সেটা দিয়ে বিকার তৈরি করা যাবে। মোম বা স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে উপরের কাটা অংশ তাপ দিন যাতে ধারালো অংশ হাতে না লাগে এবং অতঃপর চাপ দিয়ে বিকারের ঠোঁট তৈরি করুন। যে সব তরল পদার্থ প্লাস্টিকের সাথে বিক্রিয়া করে না তা শিক্ষার্থীরা উপরিউক্ত বিকারে সহজে রাখতে পারবে ও রসায়নের বিভিন্ন পরীক্ষা করতে পারবে।

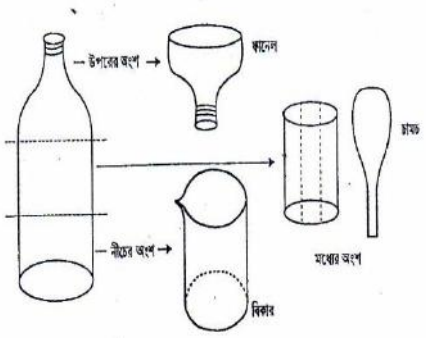

স্বল্পমূল্য উপকরণের আরো কয়েকটি উদাহরণ

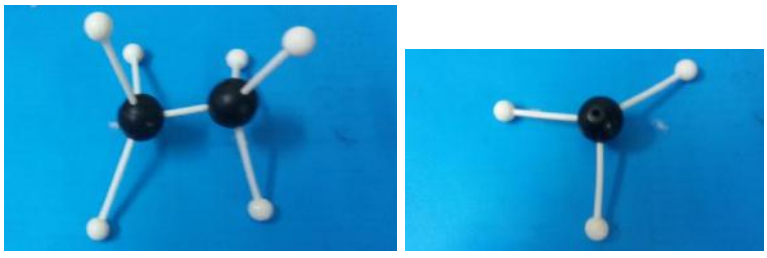

চিত্র ৮.১১ : কাঠি এবং মাটি দিয়ে তৈরি রসায়নের উপকরণ

[১] জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির 'হাতে-কলমে বিজ্ঞান শিক্ষা' শিরোনামের শিক্ষক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া হয়েছে। ম্যানুয়ালের প্রকাশকাল মার্চ ২০১৬।

রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের নীতিমালা

শিক্ষা উপকরণ ব্যবহারকে ফলপ্রসূ করার ক্ষেত্রে শিক্ষককে কিছু নীতি অনুসরণ করতে হয়। পর্যাপ্ত পরিমাপ এবং দামী শিক্ষা উপকরণ হলেই শিখন ফলপ্রসূ হবে এমন কোনো কথা নেই। বরং অধিক উপকরণের সমাবেশ শিখন প্রক্রিয়াকে কখনো কখনো বিঘ্নিত করতে পারে। তাই উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহারের নিচে প্রদত্ত বিষয়সমূহ ও নীতি বিবেচনা করা ও অনুসরণ করা আবশ্যক।

- উপকরণ নির্বাচনে প্রথমেই যে বিষয়টি বিবেচনা করা দরকার তা হলো, উপকরণটি শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত শিখনফল অর্জনে সহায়তা করবে কি না। আপনি যে অধ্যায়টি শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন সেটিতে হয়তো শিখনফল আছে 'শিক্ষার্থীরা নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করতে পারবে' । এই শিখনফল অর্জনের জন্য আপনি যদি মাপচোঙ ও বিকারের ছবি প্রদর্শন করেন তাহলে তা কোনো কাজে আসবে না। কিংবা কীভাবে নির্দিষ্ট ঘনমাত্রার দ্রবণ তৈরি করতে হবে সে সংক্রান্ত ভিডিও প্রদর্শনও খুব কাজে আসবে না। উল্লিখিত শিখনফল অর্জনের জন্য অবশ্যই শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া অনুসরণ করে ও নির্দিষ্ট যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের হাতে কলমে কাজ করতে দিতে হবে। অর্থাৎ উপকরণ নির্বাচনটি হতে হবে শিখনফল অর্জনের লক্ষ্যটি মাথায় রেখে যথাযথ শিখন-শেখানো কার্যাবলির সাথে সঙ্গতি রেখে।
- শিক্ষার্থীদের শিখন ফলপ্রসূ করার জন্য উপকরণ নির্বাচনে ডেল এর অভিজ্ঞতার কোণ ব্যবহার করা দরকার। যে ধরনের উপকরনে শোনা, পড়া, দেখার সমন্বিত ব্যবহার হয় তাতে শিক্ষার্থীদের শিখন ভালো হয়। তবে সবচেয়ে শিখন সবচেয়ে ভালো হয় যখন শিক্ষার্থীরা উপকরণ ব্যবহার করে হাতে কলমে অনুসন্ধান করতে পারে। কোন দ্রবের পানিতে দ্রাব্যতা কেমন তা শেখার জন্য দ্রবগুলো দ্রাবকে দ্রবীভূত করার মাধ্যমেই শিক্ষার্থী সবচেয়ে ভালো শিখবে।
- স্বল্প ও বিনামূল্যের উপকরণ তৈরি ও ব্যবহারে প্রাধান্য দেওয়া। আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তাই সম্ভব হলে উপকরণ তৈরি বা নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেশীয় ও সহজলভ্য কাঁচামাল ও উপকরণ ব্যবহার করা দরকার।
- উপকরণটি যেন সহজে সংরক্ষণ, বহন করা যায় ও ব্যবহার করা যায়।
- শিক্ষার্থীর বয়স, মানসিক পরিপক্বতা, চাহিদা ও অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে উপকরণ নির্বাচন করা দরকার। কম বয়সী শিক্ষার্থীদের ক্লাসে যথাসম্ভব সহজবোধ্য উপকরণ ব্যবহার করা দরকার। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের পরিচিত উপকরণ ব্যবহার করা ভালো। উপকরণ যেন আকর্ষণীয় হয়, তবে যেন খুব চাকচিক্যপূর্ণ না হয়।

৮.৩ রসায়ন শিখন-শেখানো কাজে তথ্য প্রযুক্তি

রসায়ন শিক্ষায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের পরিধি/সুযোগ

শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে ও বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শ্রেণিকক্ষে ও শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমকে অনেকখানি পাল্টে দিয়েছে। নিচে রসায়ন শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বর্তমানে কীভাবে ও কতটুকু ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতে আরও কীভাবে ব্যবহার হতে পারে তা আলোচনা করা হলো।

ক. শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজে তথ্য প্রযুক্তি

শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই এখন আইসিটি ব্যবহার করছেন। বর্তমানে অনেক শিক্ষক মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ব্যবহার করে পাওয়ার পয়েন্টে পাঠ উপস্থাপন করে থাকেন। বাংলাদেশে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টে ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে ব্যবহার করার। ডিজিটাল কনটেন্টে চিত্র, এনিমেশন, ভিডিও ও অডিও যোগ করে শিক্ষকরা পাঠকে আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ করে তোলেন। রসায়নের অনেক বিমূর্ত ধারণা রয়েছে যা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের বোঝানো বেশ কঠিন। যেমন– বোরের পরমাণু মডেল। একজন শিক্ষক খুব সহজেই

এনিমেশন তৈরি করে বা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে দেখাতে পারেন যে, নিউক্লিয়াসের চারপাশে ইলেকট্রন নির্দিষ্ট শক্তিস্তরে কীভাবে ঘুরছে। অথবা, নিচের চিত্রের মতো রঙিন চিত্র ব্যবহার করে সিগমা ও পাই বন্ধন বোঝাতে পারেন।

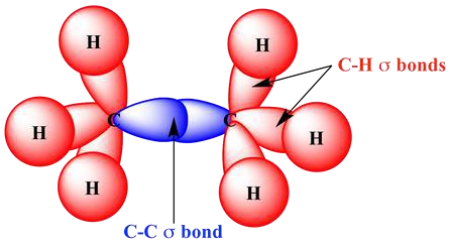

চিত্র ৮.১২ : সিগমা বন্ধন

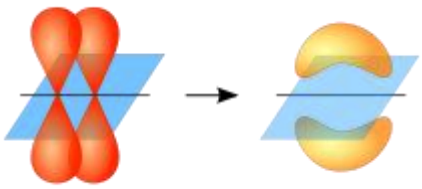

চিত্র ৮.১৩ : পাই বন্ধন

এছাড়া অনেক রাসায়নিক বিক্রিয়া রয়েছে যেগুলো আমাদের বিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরিতে শিক্ষার্থী-শিক্ষকের পক্ষে হাতে কলমে করে দেখা সম্ভব নয়। এসব বিক্রিয়া দুইভাবে শিক্ষার্থীদের দেখানো যেতে পারে। প্রথমত, কিছু কিছু বিক্রিয়ার ভিডিও ইউটিউব কিংবা অন্য ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। ঐ ভিডিওগুলো ডাউনলোড করে ক্লাসে প্রদর্শন করা যেতে পারে। আবার বর্তমানে ইন্টারএকটিভ প্রোগাম বা সফটওয়্যার তৈরি করা সম্ভব যার মাধ্যমে ভার্চুয়ালি বা কম্পিউটারে বিভিন্ন পরীক্ষার সিমুলেশন করা সম্ভব। অর্থাৎ শিক্ষার্থী কম্পিউটার স্ক্রিনে মাউস ক্লিক করে টেস্টটিউব কিংবা বিকারে বিক্রিয়কসমূহ পরিমাণমতো যোগ করতে পারবে। কম্পিউটারে সত্যিকারের বিক্রিয়া ঘটবে না তবে বিক্রিয়া ঘটার মতো মনে হবে। শিক্ষার্থীরা সেটি পর্যবেক্ষণ করে পরীক্ষার ফল নির্ধারণ করতে পারবে। রসায়নের যেসব ব্যবহারিক কাজ ল্যাবরেটরিতে বিপজ্জনক ও ব্যয়বহুল, সেগুলি কম্পিউটার সিমুলেশনের মাধ্যমে করা যেতে পারে।

এছাড়া শ্রেণিকক্ষে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করে শিক্ষক সরাসরি বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে ভিডিও বা ডিজিটাল পাঠ সামগ্রী উপস্থাপন করতে পারেন। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বর্তমানে দূরে অবস্থানকারী কোনো বিশেষজ্ঞ দ্বারা শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা যায়। ভবিষ্যতে হয়তো কোনো শিক্ষার্থী অসুস্থ থাকলে বাসায় বসেও ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে শ্রেণি শিখন-শেখানো কাজে যুক্ত হতে পারেন।

শ্রেণি শিখন-শেখানো কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সর্বশেষ একটি সংযোজন হচ্ছে স্মার্টবোর্ড। স্মার্টবোর্ড আসলে একটি ডিজিটাল বোর্ড যেটি কম্পিউটার ও প্রজেক্টরের সাথে যুক্ত থাকে। এই বোর্ডটিতে সরাসরি যেমন লেখা বা আঁকা যায় আবার বিভিন্ন ধরনের ইন্টারঅ্যাকটিভ এনিমেশন দেখানো যায়।

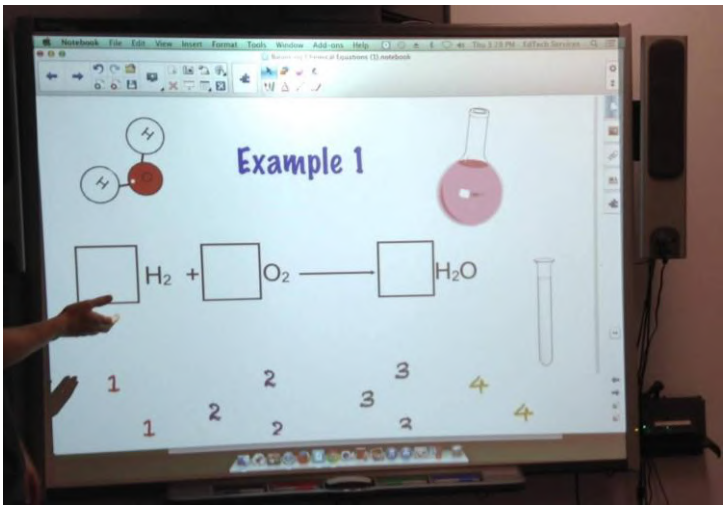

চিত্র ৮.১৪ : স্মার্টবোর্ডের সাহায্যে রসায়নের শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনা

শ্রেণি শিখন-শেখানো কাজে শিক্ষার্থীরা বর্তমানে অনেক দেশেই ল্যাপটপ বা ট্যাবলেট কম্পিউটার ব্যবহার করছে। শিক্ষক কোনো বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধান করতে দিলে শিক্ষার্থীরা তাদের ট্যাবলেট ও ইন্টারনেট ব্যবহার করে তা করতে পারছে। কোনো এসাইনমেন্ট বা অর্পিত কাজ দিলেও শিক্ষার্থীরা তাদের ট্যাবলেট ব্যবহার করে সেটি সম্পন্ন করছে।

খ. শিক্ষক-শিক্ষার্থীর স্ব-শিখনে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিখন-শেখানো কাজে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

একজন শিক্ষক ক্লাস নেওয়ার প্রস্তুতির জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তক এর বাইরের বাড়তি, হালনাগাদ বা সর্বশেষ তথ্য ও ধারণা জানতে ইন্টারনেট-এর সহায়তা নেওয়া যায়। শ্রেণিকক্ষে শিখন শেখানো কাজে ব্যবহারের জন্য শিক্ষক কর্মপত্র ও নির্দেশনা তৈরি করে প্রিন্ট নিতে পারেন। শিক্ষার্থীরা ইন্টারনেট থেকে তথ্য সংগ্রহ করে কম্পিউটারে তা প্রক্রিয়াকরণ করে বাড়ির কাজ ও এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করতে পারে। শ্রেণিকক্ষে আলোচিত কোনো বিষয় বা পাঠ্যপুস্তকের কোনো বিষয় শিক্ষার্থীর বুঝতে অসুবিধা হলে শিক্ষার্থী ইন্টারনেট থেকে বাড়তি তথ্য সংগ্রহ করে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করতে পারে। আবার এখন শিক্ষামূলক বিভিন্ন ওয়েবসাইটে এবং ইউটিউবে বিভিন্ন বিষয়ের কঠিন ধারণাসমূহের ভিডিও টিউটোরিয়াল পাওয়া যায়। এসব ভিডিও টিউটোরিয়াল থেকে শিক্ষার্থী খুব সহজেই কোনো বিষয় সম্পর্কে শিখতে পারে। এসব ভিডিও থেকে শিক্ষকও ধারণা পেতে পারেন কীভাবে কার্যকর উপায়ে একটি বিষয় শিক্ষাদান করা যায়। শিক্ষামূলক এমন ওয়েবসাইট ও উদ্যোগের উদাহরণ হলো খান একাডেমি (www.khanacademy.org) এবং শিক্ষক.কম (shikkhok.com) ।

কম্পিউটারে বিভিন্ন প্রোগাম ব্যবহার করে শিক্ষার্থীকে নিজে নিজে বিভিন্ন বিষয় শিখতে সহায়তা করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে Computer Assisted Learning (CAL) বলা হয়। এ ধরনের শিখন প্রক্রিয়ায় গেমস, টিউটোরিয়াল, ড্রিল ও অনুশীলন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

গ. শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

শিক্ষার্থীর শিখন মূল্যায়নের বিভিন্ন স্তরে আইসিটির ব্যবহার করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা OMR উত্তরপত্র ভরাট করার পর সেটি যন্ত্র দিয়ে মূল্যায়ন করে শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর সাথে সাথে কম্পিউটারে শিক্ষার্থীদের নাম ও রোল নম্বরের পাশে সংরক্ষণ করা যায়। শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন যেমন, কুইজ পরিচালনার জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়। সকল শিক্ষার্থীর কাছে ইন্টারনেট সংযোগসহ কম্পিউটার বা ল্যাপটপ থাকলে শিক্ষক অনলাইন কুইজের ব্যবস্থা করতে পারেন।

একজন শিক্ষককে পরীক্ষার খাতা মূল্যায়ন করার পরে ক্লাস টেস্ট, এসাইনমেন্ট ও চূড়ান্ত পরীক্ষার নম্বর ইত্যাদি যোগ করে চূড়ান্ত গ্রেড তৈরি করতে হয়। হাতে হাতে ফলাফল তৈরি যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কম্পিউটারে সহজেই মাইক্রোসফট এক্সেল ব্যবহার করে একজন শিক্ষক গ্রেড প্রস্তুতের কাজটি করতে পারেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিক্ষক তৈরিকৃত ফলাফল অনলাইনে জমা দিতে পারছেন।

তৈরিকৃত ফলাফল প্রকাশের জন্য আজকাল তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশে কোনো পাবলিক পরীক্ষার ফল একজন পরীক্ষার্থী ঘরে বসেই মোবাইলে এসএমএস এ বা অনলাইনে পেয়ে যাচ্ছে। অনলাইন থেকে একজন শিক্ষার্থী তার সাময়িক নম্বরপত্রও প্রিন্ট করে নিতে পারছে।

চিত্র ৮.১৫ : শিক্ষক ডট কম ওয়েবসাইটের একটি স্ক্রিনশট

ঘ. শিক্ষকের পেশাগত শিখনে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

একজন শিক্ষককে রসায়নের বিষয়জ্ঞান ফুও পেডাগজীক্যাল জ্ঞানের (Pedagogical Knowledge) সমন্বয় করে পাঠ পরিচালনা করতে হয়। এজন্য শিক্ষককে দুই ধরনের জ্ঞানেই হালনাগাদ থাকতে হয়। তথ্য প্রযুক্তি আজকাল সর্বশেষ তথ্যকে সহজলভ্য করেছে শিক্ষকের কাছে। রসায়নে নতুন কিছু আবিষ্কৃত হলে ইন্টারনেট ব্যবহার করে রসায়ন শিক্ষক দ্রুত তা জেনে নিতে পারেন। শিক্ষকেরা অনলাইনে সারা দেশের ও বহির্বিশ্বের রসায়ন শিক্ষকদের সাথে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে পারেন। বাংলাদেশে শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে সারাদেশের শিক্ষকেরা ইতোমধ্যে যুক্ত। শিক্ষক বাতায়ন থেকে শিক্ষকেরা প্রয়োজনে অন্য শিক্ষকের তৈরি করা ডিজিটাল কনটেন্ট ডাউনলোড করে ব্যবহার করতে পারেন। আবার নিজে একটি ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করে তার উন্নয়নের জন্য অন্য শিক্ষকের কাছে সহায়তা চাইতে পারেন। একজন শিক্ষক কোনো ধারণা না বুঝতে পারলে শিক্ষক বাতায়নের মাধ্যমে অন্যদের কাছে পরামর্শ চাইতে পারেন।

রসায়ন শিক্ষকেরা রসায়নের কোনো ধারণা ঠিকমতো না বুঝলে ইন্টারনেট থেকে সহায়তা নিতে পারেন। ইউটিউব কিংবা বিভিন্ন শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটে রসায়নের বিভিন্ন ধারণার ওপর ভিডিও টিউটোরিয়াল রয়েছে যা দেখে শিক্ষক ধারণাটি সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষক ডট কম ওয়েবসাইটটিতে গেলে আপনি কোর্সের তালিকায় ক্লিক করলে একটি কোর্সতালিকা পাবেন। ওখানে এইচ এস সি রসায়ন কোর্সটি আছে যেখানে রসায়নের মৌলিক বিষয়গুলোর ওপর বিভিন্ন লেকচার রয়েছে।

একইভাবে আপনি ইন্টারনেট ব্রাউজিং-এ অভ্যস্থ হয়ে গেলে রসায়ন শিখন-শেখানোর অন্যান্য ওয়েবসাইট খুঁজে পাবেন ও ব্যবহার করতে পারবেন। রসায়ন শিখন শেখানো সংক্রান্ত কয়েকটি ওয়েবসাইটের ঠিকানা নিচে দেওয়া হলো :

http ://Scienceworld.wolfram.com/chemistry/

http ://webbook.nist.gov/chemistry/

http ://www.icho.sk/

http ://www.rsc.org/

http ://shikkhok.com/

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

১. শিক্ষা উপকরণ বলতে কী বুঝায়?
২. টেলিভিশন কী ধরনের উপকরণ?
৩. স্বল্পমূল্যের শিক্ষা উপকরণ কী?
৪. প্লাস্টিকের বোতল থেকে তৈরি বিকার কী কাজে লাগে?
৫. ওভারহেড প্রজেক্টর কোন ধরনের উপকরণ?
৬. শিক্ষা উপকরণ সংরক্ষণ কেন প্রয়োজন?

রচনামূলক প্রশ্নাবলি

১. শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।
২. শিক্ষা উপকরণ কত প্রকার ও কী কী উদাহরণসহ বর্ণনা দিন।
৩. স্বলমূল্যের শিক্ষা উপকরণের গুরুত্ব উল্লেখ করুন।
৪. শিক্ষা উপকরণ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কী কী নীতি অনুসরণ করা দরকার ব্যাখ্যা করুন।
৫. রসায়ন পরীক্ষাগারে উপকরণ, যন্ত্রপাতি ও রাসায়নিক দ্রব্যাদি সংরক্ষণ ও সজ্জা সম্পর্কে বর্ণনা দিন।
৬. রসায়ন শিক্ষক কী কী ভাবে তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারেন তা আলোচনা করুন।

ইউনিট ৯ : শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানো

রসায়ন আমাদের জীবনের সর্বত্র বিরাজমান। আমাদের চারপাশের প্রকৃতি বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য সমন্বয়ে গঠিত। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ব্যবহার্যসমূহও আসলে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য। তাই রসায়নের ধারণা কিংবা ব্যবহার শিক্ষার্থীদের বোঝানোর জন্য শ্রেণিকক্ষ যথেষ্ট নয়। শিক্ষার্থীদের রসায়নের সম্যক ধারণা দেওয়ার জন্য তাদের শ্রেণিকক্ষ তথা বিদ্যালয়ের বাইরে এনে বৃহৎ পরিবেশে তাদের শেখার সুযোগ করে দিতে হবে। আমরা এ ইউনিটে শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর প্রয়োজনীয়তা, ক্ষেত্র বা ব্যাপ্তি, শিখন-শেখানো পরিচালনার কৌশল ইত্যাদি আলোচনা করব। এ বিষয়সমূহকে নিম্নোক্ত উপায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে :

৯.১ শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্র
৯.২ শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা শিক্ষা সফর, শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

৯.১ শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর ধারণা, প্রয়োজনীয়তা ও ক্ষেত্র

আমরা জেনেছি, বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কিত জ্ঞান। অর্থাৎ আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করলে আমাদের আশে পাশের প্রকৃতি ও প্রকৃতিতে ঘটা ঘটনাকে বুঝতে পারি এবং ব্যাখ্যা করতে পারি। রসায়ন বিজ্ঞানের একটি শাখা। প্রকৃতি গঠিত হয়েছে পদার্থ ও শক্তির সমারোহে। রসায়ন মূলত পদার্থের গঠন ও গুণাবলি এবং এর সাথে শক্তির সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করে। পদার্থের গঠন এবং শক্তির প্রভাবে পদার্থ কীভাবে পরিবর্তিত হয় সেটিই রসায়নের আলোচনার বিষয়।

আমাদের চারপাশের যা কিছু দেখতে পাই, গন্ধ নিতে পারি, ছুঁতে পারি, স্বাদ নিতে পারি - সবই কোনো না কোনো পদার্থ (রাসায়নিক পদার্থ) দ্বারা গঠিত। রাসায়নিক পদার্থগুলোর মধ্যে ১১৮টি মৌলিক পদার্থ এবং কোটি কোটি যৌগিক পদার্থ। রসায়ন প্রথমত সকল রাসায়নিক পদার্থের গঠন ও বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করে। প্রকৃতপক্ষে, মৌলিক পদার্থসমূহ একে অন্যের সাথে বিভিন্নভাবে যুক্ত হয়ে সকল রাসায়নিক যৌগিক পদার্থ সৃষ্টি করে। মৌলিক পদার্থসমূহ কী অনুপাতে ও কী রকম বিন্যাসে যুক্ত হয় তার ওপর ভিত্তি করে রাসায়নিক পদার্থের গুণাগুণ তৈরি হয়। অর্থাৎ রসায়নের জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদের চারপাশে থাকা সকল পদার্থকে অধ্যয়ন (পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করতে হবে। শ্রেণিকক্ষে তাত্ত্বিক আলোচনা বা বক্তৃতার মাধ্যমে হয়তো বিভিন্ন পদার্থের গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু তথ্য মুখস্থ করা যায়। কিন্তু রসায়নের প্রকৃতি জ্ঞান অর্জন করতে হলে আমাদের রাসায়নিক পদার্থসমূহকে অধ্যয়ন (পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা) করতে হবে। বিদ্যালয়ে যদি ল্যাবরেটরি থাকে, তাহলে হয়তো সেখানেও রাসায়নিক পদার্থসমূহকে অধ্যয়ন করা যায়। তবে আমাদের চারপাশের প্রকৃতিতে ও দৈনন্দিন জীবনে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রাপ্যতা বা প্রাচুর্য ও ব্যবহার ব্যাপক যা ল্যাবরেটরিতে নিয়ে আসা সম্ভব নয়। শ্রেণিকক্ষের বাইরে প্রকৃতি ও বাস্তবের কাছে গিয়ে শিক্ষার্থীর শিখন সম্পূর্ণ করা সম্ভব। শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানো বলতে আমরা বুঝব, শ্রেণিকক্ষ ও ল্যাবরেটরির বাইরে শিক্ষার্থীদের নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে গৃহীত শিখন-শেখানো কার্যক্রম।

আমরা দেখলাম, রসায়ন বিষয়টির ধরন বা বৈশিষ্ট্যের কারণেই রসায়ন শিখন-শেখানোকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে যেতে হবে। রসায়ন শিখন-শেখানোকে শ্রেণিকক্ষের বাইরে নেওয়ার পেছনে আরো একটি বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। আমরা জানি, বিজ্ঞান বা রসায়ন শিখন-শেখানোতে অনুসন্ধানভিত্তিক শিখন পরিচালনা করার কথা বলা হয়। নিজেদের দৈনন্দিন বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান পরিচালনা করে বিজ্ঞানের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ অর্জন করে। তাই শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যা নিয়ে অনুসন্ধান পরিচালনা করতে হলে তা করতে হবে ল্যাবরেটরি ও শ্রেণিকক্ষের বাইরের পরিবেশেই।

শ্রেণিকক্ষে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে শিখনের সামাজিক গঠনবাদ সমর্থন করে। একজন শিশু তার পরিবেশে (প্রকৃতি ও সমাজে) অভিজ্ঞতা অর্জন করে যা থেকে সে নিজের মতো করে অর্থ গঠন করে। একজন শিক্ষার্থী যখন শ্রেণিকক্ষের বাইরে বাস্তব পরিবেশে বিজ্ঞান শেখে তখন সে তার নিজস্ব পরিচিত পরিবেশে তার বিদ্যমান জ্ঞানের সাথে নতুন জ্ঞানের সংযোগ ঘটায় যার কারণে শিক্ষার্থী শিখনকে নিজের মনে করে। সম্প্রতি পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, (Sultana &

Siddique, 2014) বাংলাদেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা মনে করেন যে, শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও পরিবেশের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানের নানা বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় অংশ নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধান দক্ষতা অর্জন করে এবং ফলস্বরূপ তারা তাদের জীবনে বিজ্ঞান সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ একথা বলা যায় যে, শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সাক্ষরতা অর্জনে শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো জোরালো ভূমিকা রাখে। শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো যেভাবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সাক্ষরতা বিকাশে ভূমিকা রাখে তা একটি চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

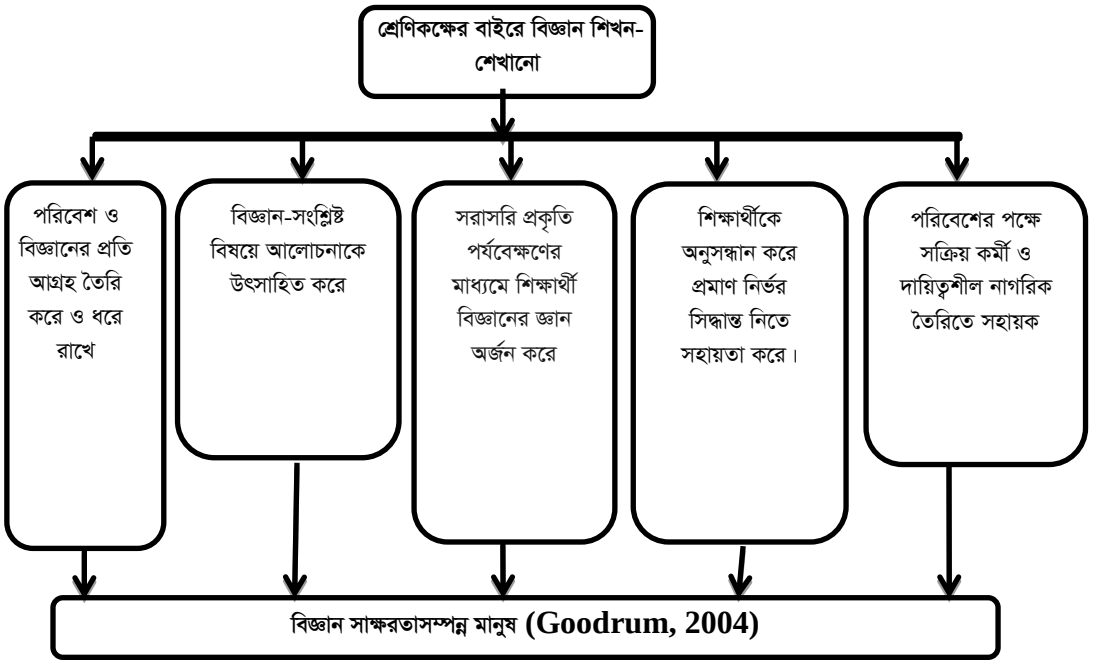

চিত্র ৯.১ : শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিজ্ঞান শিখন-শেখানো যেভাবে শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান সাক্ষরতা বিকাশে ভূমিকা রাখে (Sultana and Siddique, 2014 থেকে পরিমার্জনসহ গৃহীত) ।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখনের সুযোগ

ওপরের আলোচনা থেকে এটি সহজেই বলা যায় যে, বিদ্যালয়ের বাইরের পৃথিবী রসায়ন শেখার জন্য বিশাল এক ল্যাবরেটরি। অর্থাৎ আমাদের বাসস্থান থেকে শুরু করে সর্বত্রই রসায়ন শেখার সুযোগ রয়েছে; তবে কোথাও এ সুযোগ বেশি আর কোথাও এ সূযোগ সীমিত। তবে সুযোগ থাকলেই বা শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষের বাইরে নিয়ে গেলেই শিক্ষার্থীদের রসায়ন শিখন ত্বরান্বিত হবে তা নয়; শিক্ষার্থীদের রসায়ন শিখন নিশ্চিত করতে হলে শিক্ষককেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। আমরা এখন আলোচনা করব কোনো কোনো ক্ষেত্রে রসায়ন শিখনের ভালো সুযোগ রয়েছে।

রাসায়নিক শিল্প কারখানা : শিল্প মানেই উৎপাদনের ক্ষেত্র। রাসায়নিক শিল্প কারখানায় আমাদের ব্যবহার উপযোগী রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন করা হয়। রসায়ন শিক্ষাক্রমেও এরকম রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত আছে। কাঁচামাল পরিষ্কার করা, প্রক্রিয়াকরণ ও কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য প্রস্তুতকরণ (যেখানে মূল রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘটিত করে দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়), উৎপাদিত দ্রব্য মানসম্মত করা, সংরক্ষণ এবং সরবরাহের উপযোগীকরণ সবই শিল্পের কাজ। আমাদের দেশে লোহা, ইস্পাত, কাচ, ঔষধ প্রস্তুত শিল্প, কাপড় ডায়িং, সার কারখানা, কাগজ তৈরি শিল্প, সিমেন্ট শিল্প, চিনি শিল্প, প্লাস্টিক, সাবান প্রস্তুত শিল্প, কসমেটিক কারখানা ইত্যাদি রাসায়নিক শিল্প কারখানা রয়েছে। একটু খোঁজ নিলে দেখা যাবে আপনার জেলায় এরকম কোনো না কোনো

শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। শিক্ষার্থীরা এই **শিল্প কারখানা পরিদর্শনের** অভিজ্ঞতা থেকেই রসায়নের অনেক ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। রাসায়নিক শিল্প কারখানা পরিদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী কেবল রাসায়নিক পন্য বা দ্রব্য উৎপাদন সম্পর্কেই জ্ঞান অর্জন করে না বরং রাসায়নিক শিল্প আমাদের পরিবেশকে দূষিত করে কিনা তা-ও বুঝতে পারবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান : রসায়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণার জন্যও বাংলাদেশে কিছু গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আবার বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে রসায়নের গবেষণা ল্যাবরেটরি রয়েছে। গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ (Bangladesh Council for Scientific and Industrial Research)। এ প্রতিষ্ঠানে রসায়নের প্রয়োগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা হয়ে থাকে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও জয়পুরহাটে এর শাখা রয়েছে যেখানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাভ্রমণে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া বাংলাদেশে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় কলেজেও রসায়ন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগে রসায়নের প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীদের এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়েও রসায়ন শিখতে তাদের সহায়তা করা যেতে পারে।

রসায়নের বিষয়বস্তুর মধ্যে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে এমন কয়েকটি উদাহরণ :

সারণি ৯.২ : রসায়ন শিখনের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান

শিল্প কারখানা/ প্রতিষ্ঠান	অধ্যায়ের নাম	বিষয়বস্তু
বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ	পদার্থের গঠন	তেজস্ক্রিয় আইসোটাপ ও তাদের ব্যবহার, খাদ্যে রাসায়নিকের ব্যবহার, খাদ্য ও পুষ্টি, বিভিন্ন ফল প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন	শক্তির ব্যবহার	পারমাণবিক শক্তি
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাবরেটরি	এসিড -ক্ষার সমতা	লবণ, এসিড , ক্ষার
জড়বস্তু কেন্দ্রিক শিল্প (লোহা, ইস্পাত, কাঁচ শিল্প, প্লাস্টিক শিল্প, সাবান, সার)	খনিজ সম্পদ-ধাতু ও অধাতু	ধাতু নিষ্কাশন, ধাতু বিশুদ্ধকরণ, সাবান প্রস্তুতকরণ, রাসায়নিক সার
	খনিজ সম্পদ- জীবাশ্ম	পলিমারকরণ

বিজ্ঞান জাদুঘর : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের সামাজিক, নৈতিক, বৌদ্ধিক ও শারিরীক বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থা করার জন্য এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে। রসায়ন বিজ্ঞানকে শিক্ষার্থীদের সামনে প্রাণবন্ত করতে এবং অন্তঃর্দৃষ্টি তৈরিতে বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন কার্যকর ভূমিকা রাখে। বিজ্ঞান জাদুঘর পরিদর্শন ফিল্ড ট্রিপের অংশ। জাদুঘর পরিদর্শনের ব্যবস্থাপনা ফিল্ড ট্রিপ ব্যবস্থাপনার অর্ন্তগত। ফিল্ড ট্রিপের অংশে ব্যবস্থাপনার বিষয়টি উল্লেখ আছে বিধায় এখানে তার পুনরাবৃত্তি করা হলো না।

জাদুঘর বলতে বোঝায় যেখানে প্রাচীন জিনিসপত্র সংরক্ষণ করে রাখা হয়। কিন্তু বিজ্ঞান জাদুঘরের রূপরেখা এর চেয়ে আলাদা। এখানে সাধারণত বিজ্ঞান বিষয়ক জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়, বিজ্ঞানের ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়। একই সাথে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি বিষয়ক কিছু কাজ হাতে কলমে করার সুযোগ থাকে। শ্রেণিকক্ষে রসায়ন শিক্ষার পরিপূরক হিসাবে এটি কাজ করতে পারে । জনসাধারণকে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তোলার জন্য এবং বিজ্ঞানকে জনপ্রিয় করার জন্য বিজ্ঞান জাদুঘর বিজ্ঞানের সাথে সম্পৃক্ত নানা ধরনের বিজ্ঞান শিক্ষামূলক কর্মসূচি হাতে নেয়। নবীন ও সৌখিন বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবনমূলক কাজে উৎসাহ ও সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। দেশের বিজ্ঞান ক্লাবগুলোকে সাহায্য, সহযোগিতা ও উৎসাহ দান এবং তাদের পরস্পরের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ও জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানমালায় অংশগ্রহণের সুযোগ দিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলনকে জোরদার করে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারের উদ্দেশ্যে প্রথম 'বিজ্ঞান কেন্দ্র আন্দোলন'

শুরু হয়। বর্তমানে বিজ্ঞান কেন্দ্র ও বিজ্ঞান জাদুঘরসমূহ সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। আমাদের দেশে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর শেরে বাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকায় অবস্থিত।

চিত্র ৯.৩: জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বিজ্ঞান জাদুঘরে সংরক্ষিত আকরিক ক্যালসাইট (Calcite)

চিত্র ৯.৪: জাপানের টোকিওতে অবস্থিত বিজ্ঞান জাদুঘরে সংরক্ষিত স্যাফায়ার যা আসলে এক ধরনের অ্যালুমিনা বা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড

ওপরের চিত্রে যেমনটি দেখা যাচ্ছে, বিজ্ঞান জাদুঘরে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবান আকরিক সংরক্ষিত থাকে। সাধারণত দেখা যায়, জাদুঘরে এসব নমুনার সাথে আকরিকটি কোথায় পাওয়া যায়, এর ব্যবহারিক মূল্য কী, এর রাসায়নিক গঠন কী ইত্যাদি তথ্য দেওয়া থাকে। তথ্য দেওয়া না থাকলেও জাদুঘরের গাইড কিংবা শিক্ষক এসব তথ্য জানতে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করতে পারেন। জাদুঘর এভাবে শিক্ষার্থীদের রসায়নের জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি বিকাশে সহায়তা করতে পারে। বিজ্ঞান জাদুঘরগুলিতে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয় এবং ইভেন্টের মধ্যে তুলনা করতে পারে, মিল-অমিল খুঁজে বের করতে পারে, আন্তঃসম্পর্ক তৈরি করতে পারে। এতে শিক্ষার্থীরা উচ্চতর সমালোচনামূলক দক্ষতা অর্জন করে যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। শিখনকে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব তৈরি করে।

জাদুঘর পরিদর্শন শিক্ষার্থীদের মনে নানা প্রশ্ন তৈরি করে যা কৌতূহলের দরজার খুলে দেয়। কিছু প্রশ্নের উত্তর আছে, কিছু প্রশ্নের উত্তর নাই, কিছু প্রশ্ন তাকে নতুন চিন্তায় উৎসাহিত করে, কিছু প্রশ্ন তার মধ্যে আগ্রহ জাগায়। শিক্ষার্থীদের সকল ধরনের প্রশ্নকে উৎসাহিত করা উচিত। তাদের প্রশ্নের উত্তর, যুক্তি, তাঁদের বিশ্বাসগুলো শোনা প্রয়োজন। এতে তাদের চিন্তার দুয়ার খুলবে।

বিজ্ঞান মেলা ও প্রদর্শনী

প্রত্যেক বিদ্যালয়ে বৎসরে অন্তত একবার বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা দরকার। সম্ভব হলে কাছাকাছি কয়েকটি বিদ্যালয় একত্রে সহযোগিতার মাধ্যমে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে তা আরও আকর্ষণীয় হয়।

সরকারি আয়োজন : প্রথমে উপজেলা, পর্যায়ক্রমে জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে এই বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। যার একাজে ভূমিকা পালন করে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যাদুঘর, শেরে বাংলা নগর, আগার গাঁও, ঢাকা।

মেলার উদ্দেশ্য : বিজ্ঞান মেলার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ :

ক) বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বিষয়ক অভিজ্ঞতা অর্জন করে তার বহিঃপ্রকাশ করা

খ) সকল ছাত্রকে বিজ্ঞানের প্রতি অনুপ্রাণিত করা।

গ) শ্রেণির কাজ ছাড়াও অন্যান্য নানাবিধ যন্ত্রপাতি, মডেল ইত্যাদি তৈরি করতে এবং নতুন জিনিস আবিষ্কার করতে উৎসাহিত করা।

ঘ) বিজ্ঞান বিষয়ক শখ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করা।

ঙ) বিদ্যালয়ের সংগে সমাজের যোগাযোগ স্থাপন করা এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিদের নিকট বিজ্ঞানের বিষয়কে পৌঁছে দেওয়া।

চ) বৈজ্ঞানিক প্রতিভার অনুসন্ধানে সহায়তা করা।

গণমাধ্যম ও রসায়ন শিখন

রসায়ন শিখনে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একজন শিক্ষার্থী এখন খুব সহজেই দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক ম্যাগাজিন ইত্যাদি যেমন পড়ার সুযোগ পায় আবার টেলিভিশনে বিভিন্ন বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ পায়। দৈনিক পত্রিকাগুলোতে অন্তত সপ্তাহে একদিন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক বিশেষ পাতা থাকে যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা রসায়নের বিভিন্ন বিষয় শিখতে পারে। একইভাবে বিজ্ঞান সাময়িকী বা বিজ্ঞান বিষয়ক ম্যাগাজিন থেকে শিক্ষার্থীরা রসায়ন শিখতে পারে।

তবে বর্তমান সময়ে রসায়ন শেখার খুব ভালো একটি সুযোগ হলো টেলিভিশন। টেলিভিশনে বিজ্ঞানবিষয়ক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। কোনো কোনো চ্যানেল তো শুধু বিজ্ঞান বিষয়ক অনুষ্ঠানই প্রচার করে থাকে। এসব অনুষ্ঠানগুলোতে বিভিন্ন শিল্প কারখানায় কীভাবে পণ্য উৎপাদিত হয় তা সচিত্র প্রতিবেদন দেখানো হয়। আবার হয়ত কোনো পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয় যাতে রাসায়নিক দ্রব্য কীভাবে পরিবেশ ও আমাদের জীবনকে প্রভাবিত করে সেসব বিষয়গুলো দেখানো হয়। শিক্ষক এসব অনুষ্ঠানের খোঁজ রাখতে পারেন এবং শিক্ষার্থীদের তা দেখতে বলতে পারেন। অনুষ্ঠান দেখার পর অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করে শিক্ষার্থীদের শিখনে সহায়তা করতে পারেন।

৯.২ শিক্ষামূলক ভ্রমণ বা শিক্ষা সফর, শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

শ্রেণিকক্ষের বাইরে একটা বিস্তীর্ণ পরিবেশ রয়েছে। সীমাবদ্ধ শ্রেণিকক্ষ এবং বিস্তীর্ণ পরিবেশ এই দুটির মধ্যে উপযুক্ত সংযোগ সাধনের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পারে। ভ্রমণ দু'ধরনের হতে পারে (১) নিকটবর্তী (Field Trip) (২) দূরবর্তী (Excursion)। এরূপ দু'ধরনের ভ্রমণের দ্বারা শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং শিক্ষা তার কাছে চিত্তাকর্ষক, সঠিক ও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। রসায়ন বিষয় শেখার জন্য এরূপ সফর সাধারণত কোনো শিল্প কারখানা বা বা প্রতিষ্ঠান বা বিশেষ কোনো পরিবেশে হয়ে থাকে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা

SMILES (School-Museum Integrated Learning Experiences for Students) হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় গবেষণালব্ধ একটি রূপরেখা। এই রূপরেখাটি পরীক্ষা করে শিক্ষকেরা এটিকে ব্যবহার করছেন। এই রূপরেখায় মিউজিয়াম বলতে ঘরের ভেতরে বা বাইরের যে কোনো স্থান বোঝানো হয়েছে। হতে পারে এটি একটি জাদুঘর, হতে পারে কোনো উদ্যান, হতে পারে কোনো কৃষিক্ষেত, হতে পারে কোনো কারখানা। এ ধরনের কোনো স্থান ভ্রমণকে আমরা আমাদের দেশে সাধারণত শিক্ষাসফর বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে থাকি।

একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণকে ফলপ্রসূ করতে হলে ভ্রমণস্থানে কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করাই যথেষ্ট নয়। বরং ভ্রমণের পূর্বে, ভ্রমণের সময়ে এবং ভ্রমনের পরে শিখন-শেখানোর মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র থাকাটা জরুরি। অর্থাৎ শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিখন-শেখানোর সাথে শ্রেণিকক্ষের শিখনকে সমন্বিত করতে হবে। শিক্ষামূলক ভ্রমণ ফলপ্রসূ হতে সাহায্য করে যখন শিক্ষার্থীরা–

- উক্তস্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সম্পর্কে জানতে পারবে।
- শিখনে তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকে।
- কী শিখবে, কোথায় শিখবে, কেমন করে শিখবে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পছন্দ করার সুযোগ থাকে।
- ছোট ছোট দলে কাজ করার ব্যবস্থা থাকে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরে কোনো স্থানের শিখন পরিবেশ শিক্ষকের জন্য নিঃসন্দেহে চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য শিক্ষককে আগে থেকেই ভালো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। নিচের সার্থক ব্যবস্থাপনা কৌশলগুলো শিক্ষক হিসেবে আপনি অনুসরণ করতে পারেন।

- ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে নিয়ে ভ্রমণ পরিকল্পনা করতে হবে।
- অভিভাকদের জানাতে হবে এবং ইচ্ছুক অভিভাবকদের সাহায্যকারী হিসেবে রাখতে হবে।
- শিক্ষক আগে থেকেই ভ্রমণ স্থান পরিদর্শন করে সকল বিষয় সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- নিরাপত্তা, ভ্রমণ ব্যবস্থা এবং খাওয়ার বিষয়ে আগে থেকেই পরিকল্পনা থাকতে হবে।

SMILES রূপরেখাটি তিনটি ধাপে সংগঠিত করা হয়। ধাপ তিনটি হলো ভ্রমণের পূর্বে বিদ্যালয়ে কাজ, ভ্রমণকালীন সময়ে কাজ ও ভ্রমণের পরে বিদ্যালয়ে কাজ। নিচে এই তিনটি ধাপ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

ভ্রমণের পূর্বে বিদ্যালয়ে কাজ

অনুসন্ধানের বিষয় ঠিক করা : শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে একটি বিষয় তুলে ধরবেন যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানের সুনির্দিষ্ট বিষয় ঠিক করবে। শিক্ষার্থীরা বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করবে, মাইন্ড ম্যাপিং করবে। শিক্ষার্থীরা প্রশ্নগুলো লিখে রাখবে। যেমন– কোনো একটি কারখানা ভ্রমণ করার চিন্তা করলে এমন প্রশ্ন আসতে পারে যে, "কী প্রকারের দ্রব্য উৎপন্ন হয় ঐ কারখানায়?"। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাথমিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু করতে পারে পাঠাগারে গিয়ে বা ইন্টারনেট সার্চ করে যার মাধ্যমে তাদের মনে নতুন অনুসন্ধান প্রশ্ন জন্ম নিতে পারে। শিক্ষার্থীদের মনে জন্ম নেওয়া প্রশ্ন তাদের শিক্ষাভ্রমণে শিখনকে গাইড করে। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নগুলো আলোচনা করে তাদের মধ্যে কয়েকটি বাছাই করে অনুসন্ধানের জন্য নির্বাচিত করতে হবে। অনুসন্ধানের জন্য নির্ধারিত প্রশ্ন শিক্ষাভ্রমণের শিখন উদ্দেশ্য হিসেবে কাজ করে এবং শিক্ষাভ্রমণকে সঠিকভাবে পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে। একইসাথে এগুলো অভিভাবকদের বুঝতে সহায়তা করে যে, শিক্ষাভ্রমণটি কতটি প্রয়োজনীয়।

শিক্ষাভ্রমণের স্থান নির্বাচন : স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মতামত গ্রহণ করা দরকার। হয়তো কয়েকজন শিক্ষার্থী সাবান তৈরির একটি কারখানা দেখতে চাইতে পারে। আবার কয়েকজন হয়তো সিমেন্ট তৈরির কারখানায় যেতে চাইতে পারে। শিক্ষার্থীদের মতামতের ভিত্তিতে স্থান নির্বাচন করলে শিক্ষার্থীরা এই ভ্রমণকে নিজের মনে করে তা সফল করার জন্য চেষ্টা করবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঐ স্থান পরিদর্শনে কতটা শিখনফল অর্জন হবে তা বিবেচনা করতে হবে। বিবেচনা করতে হবে ঐ স্থান ভ্রমণ বাস্তবায়ন বাস্তবতার নিরীখে কতটা সম্ভব। আমরা অবশ্য আগের পাঠেই দেখেছি রসায়ন শিখনের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ধরনের স্থানে আমরা শিক্ষামূলক ভ্রমণে যেতে পারি।

শিক্ষকের করণীয় : শিক্ষককে স্থানটির সাথে আগেই পরিচিত হওয়া ভালো। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীদের স্থানটিতে নেওয়ার পূর্বে সেই স্থানে যেতে হবে এবং সেই স্থানের যাবতীয় তথ্য আনতে হবে। সেই অভিজ্ঞতার আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের উক্ত স্থান সম্পর্কে পূর্ব-ধারণা দিতে হবে। ঐ স্থানে যাওয়া না গেলে অন্য উপায়ে স্থানটি সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা নেওয়া দরকার। শিক্ষাভ্রমণে যাওয়ার পূর্বেই একটা নির্দেশনা পত্র তৈরি করে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রদান করতে হবে এবং প্রদত্ত নির্দেশনাপত্র ভালো করে পড়ে দেখার জন্য বলতে হবে। শিক্ষার্থীরা কোন নির্দেশনা ঠিকমতো না বুঝলে তাদের বুঝিয়ে দিতে হবে।

শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে পরিকল্পনা : শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শ্রেণিকক্ষে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন :

- কখন যাত্রা শুরু হবে এবং কখন ফিরে আসা হবে।
- সাথে কী কী নিতে হবে।
- শিক্ষা সফর এর স্থানে কার সাথে সাক্ষাত করতে হবে।
- কারা কারা উক্ত স্থানে যাবে।

আরও পরিকল্পনা করতে হবে উক্ত স্থানের কোথায় কোথায় যেতে হবে। এটা নির্ধারণ করার দরকার আছে কী? এটি এজন্য দরকার যে, শিক্ষার্থীদের উপযোগী দর্শনীয় বস্তু বা বিষয়গুলো চিহ্নিত করা, কারণ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিক্ষাভ্রমণটি শেষ করতে হবে এবং সবগুলো শিখনফল অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।

এ ছাড়া আরও একটা পরিকল্পনার দরকার রয়েছে। একটা পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে যেখানে বলা থাকবে যে কীভাবে পর্যবেক্ষণ, ফলাফল এবং তথ্য রেকর্ড করতে হবে। পরবর্তীতে এই রেকর্ড এর ওপর ভিত্তি করে একটি রির্পোট তৈরি করতে হবে উপস্থাপনের জন্য। উপস্থাপন কীভাবে করা যায় যেমন পোস্টারের মাধ্যমে না মৌখিকভাবে, সেটিও আগে পরিকল্পনা করে নেওয়া ভালো।

শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য তথ্যপত্র : শিক্ষাভ্রমণের সবকিছু নির্ধারণ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের এবং অভিভাবকদের একটা করে তথ্যপত্র দেওয়া যেতে পারে যার মধ্যে থাকবে শিখন উদ্দেশ্য, স্থানের নাম এবং কার্যসূচি। তথ্যপত্রে আরও থাকা দরকার উক্ত স্থানে যাওয়ার ম্যাপ, টয়লেটের অবস্থান এবং অনান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেমন, সাক্ষাতের বা অপেক্ষার স্থান। যদি কেউ হারিয়ে যায় তাহলে সে ঐ অপেক্ষার স্থানে অপেক্ষা করতে পারে। তথ্যপত্র ছাত্র ছাত্রীদের এবং অভিভাবকদের একটা স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার ধারণা দিবে শিক্ষাভ্রমণের উদ্দেশ্য এবং কর্মধারা সম্পর্কে। নিচে একটা ফরম এর নমুনা দেওয়া হলো যেটিকে প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমার্জন করে যে কোনো শিক্ষাভ্রমনের জন্য তথ্যপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি তৈরি করলে শিক্ষাভ্রমণ অনেক গোছানো ও ফলপ্রসূ হবে এবং অহেতুক ঝামেলা থেকে মুক্ত থাকা যাবে।

শিক্ষাভ্রমণের তথ্যপত্রের কাঠামো

- শিক্ষা সফরের স্থানের নাম -
- যাত্রার তারিখ -
- কী শিখতে যাচ্ছি -
- বিদ্যালয় ত্যাগের সময়-
- সম্ভাব্য পৌঁছানোর সময়-
- দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা-
- ভ্রমণ স্থান ত্যাগের সময়-
- কী পরিধান করতে হবে-
- দলসমূহের গঠন (দলনেতা ও সদস্যবৃন্দ)-
- দলের সদস্যরা কী পর্যবেক্ষণ করবে -
- সাক্ষাৎ বা অপেক্ষার জন্য নির্ধারিত স্থান -
- পরিদর্শন এলাকার ম্যাপ-

দলগঠন এবং দলের নেতা নির্বাচন : প্রতি দলে আটজনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী না থাকাই উচিত। দলের নেতা হিসেবে কাকে নেওয়া উচিত? অবশ্যই একজন শিক্ষক দলের নেতা হিসেবে কাজ করবেন। তবে ক্ষেত্র বিশেষে উৎসাহী অভিভাবককেও দলনেতা হিসাবে মনোনীত করা যেতে পারে এবং দলের ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে হবে যে, কে তাদের দল নেতা এবং উক্ত দলে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে। দল এবং দলের নেতাদের সাথে বসে করণীয়সমূহ ভ্রমণের আগেই ব্যাখ্যা করতে হবে। দলনেতাদের বলতে হবে যে তাদের কাজ হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে থাকা যাতে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়, তবে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিতে হবে। দলনেতা শুধু গাইড হিসেবে কাজ করবেন।

ভ্রমণকালীন শিখন-শেখানো কার্যক্রম

দলনেতাকে সকল সময়ের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে থাকতে হবে এবং পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তাদের সহায়তা করতে হবে। সম্ভব হলে সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে অথবা ক্ষেত্রবিশেষে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্ন লিখে রাখতে বলতে হবে পরে শ্রেণিকক্ষে আলোচনা করার জন্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে যেন ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। তবে দলনেতারা দলকে শিখন কার্যক্রমে ফলপ্রসূ অংশগ্রহণের জন্য একটা নির্দেশনা দিতে পারেন। নির্দেশনা হতে পারে কতকগুলো প্রশ্নের মাধ্যমে, যেমন -

- এটা কী?
- এটির কি প্রাণ আছে?
- এটি কি নড়াচড়া করতে পারে?
- তুমি কেন এটিকে আকর্ষণীয় মনে করছ?
- তুমি এই বস্তুটিকে কেন এমনটা বলছ?
- এই বস্তুটির ব্যবহার কী হতে পারে?
- কার জন্য এই বস্তুটি ব্যবহার উপযোগী?
- আমরা এটা আর কোথায় পেতে পারি?

এ ধরনের প্রশ্নগুলোর মাধ্যমে দলনেতা দলের মাঝে শিখনের জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করতে পারেন এবং শিখনকে গাইডও করতে পারেন।

শিক্ষক শিক্ষা-ভ্রমণে থাকা ছাত্র-ছাত্রীদের আর কী নির্দেশনা দিতে পারেন? নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে শিক্ষার্থীরা যা দেখছে তা অঙ্কন করার জন্য। অঙ্ককন করলে কী সুবিধা হবে? পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট যদি অঙ্কনের মাধ্যমে দিতে হয় তা হলে যে কোনো বস্তুকে ভালো করে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। ফলে উক্ত বস্তু সম্পর্কে সঠিক ছবি তাদের মনে গেঁথে যাবে। শিক্ষাভ্রমণে শিখনফল অনুযায়ী বিভিন্ন উপাদানের বা বস্তুর নমুনা সংগ্রহ করার জন্য বলা যেতে পারে।

শিক্ষাভ্রমণের সময়কালীন শিক্ষার্থীদের মনে কোনো প্রশ্নের উদ্রেক হলে তা তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষককে করার জন্য বলা যেতে পারে অথবা খাতায় লিখে রাখতে বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দেওয়া যেতে পারে যে, দলে আলোচনা করে প্রশ্নটির উত্তর খুঁজতে বা বিষয়টি সম্পর্কে একটা ধারণা পাওয়ার চেষ্টা করতে। শিক্ষার্থীদের আরো বলা যেতে পারে, পর্যবেক্ষণ করা উপাদান বা দ্রব্য সম্পর্কে নিজস্ব ধারণা নোট করতে।

রেকর্ডিং : পর্যবেক্ষণ করার সময় শিক্ষার্থীরা তাদের শিখন কার্যক্রম এর রেকর্ড করবে রেকর্ড নিম্নরূপে করা যেতে পারে।

- ছবি তুলে এবং ভিডিও করে
- টেপ রেকর্ডারের মাধ্যমে
- তথ্য এবং অভিজ্ঞতা খাতায় লিখে
- অংকনের মাধ্যমে
- নমুনা সংগ্রহ করে

বিদ্যালয়ে ফিরে কাজ

শিক্ষাভ্রমণে পরিকল্পিত তথ্য ও নমুনা সংগ্রহ এবং রেকর্ড করে পরবর্তীতে বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আলোচনার মাধ্যেমে শিখন-শেখানো কার্যক্রমকে ফলপ্রসূ করতে হবে। আর এজন্য শিক্ষাভ্রমণের অর্জিত অভিজ্ঞতাকে শিখনফলের আলোকে বিশ্লেষণ করতে হবে। আলোচনা ও বিশ্লেষণের পর শিক্ষার্থীদের কাজ হলো শিক্ষাভ্রমণের রিপোর্ট উপস্থাপন। শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে প্রকাশ করতে পারে। লিখিত রিপোর্ট তৈরি, দেওয়ালিকায় রিপোর্ট ও চিত্র প্রদর্শন কিংবা আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি সহজলভ্য হলে তার মাধ্যমে প্রদর্শন করতে পারে।

শ্রেণিকক্ষের বাইরের শিক্ষা হচ্ছে হাতে কলমে বা সরাসরি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার বিষয়। এ ধরনের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে প্রকৃতির এবং বিভিন্ন শিক্ষা উপদানের তথা বাস্তব বস্তুর কাছাকাছি যাওয়া যায়। ফলে বিজ্ঞান পাঠ আকর্ষণীয়, চিত্তাকর্ষক, আনন্দময় এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ঘটে তা হলো, ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে শিখতে পারে। নিজ হাতে তথা পঞ্চইন্দ্রিয় ব্যবহার করে, পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা করে বিজ্ঞানের জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে। এ ধরনের শিখনে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় থাকে, শিক্ষক থাকেন সাহায্যকারী হিসেবে। এখানে কৃত্রিমতার সুযোগ নেই, শিখন হয়ে থাকে খাঁটি।

প্রশ্নমালা

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। বাংলাদেশে কোন কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রসায়নের প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা হয়?

২। শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিক্ষা বলতে কী বোঝেন?

৩। আমাদের দেশে রসায়ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করুন।

২। আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে শ্রেণিকক্ষের বাইরে রসায়ন শিখন-শেখানোর ক্ষেত্রসমূহ উদাহরণসহ উপস্থাপন করুন।

৩। রাসায়নিক শিল্প প্রতিষ্ঠানে একটি শিক্ষামূলক ভ্রমণ পরিচালনার জন্য শিক্ষক ভ্রমণের পূর্বে, ভ্রমণকালীন এবং ভ্রমণের পরে কী কী করবেন তা বর্ণনা করুন।

ইউনিট ১০ : জৈব রসায়ন পরিচিতি

জৈব রসায়ন হলো রসায়নবিদ্যার একটি শাখা। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যে সব জিনিস ব্যবহার করি এবং খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করি তার অধিকাংশই জৈব রসায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট। জৈব রসায়ন বলতে জৈব যৌগের রসায়নকেই বুঝায়। জীব থেকে জৈব শব্দের উৎপত্তি। জীব বলতে আমরা জীবজগত তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীকেই বুঝি। জীবজগত থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত যৌগগুলোকে প্রাথমিকভাবে জৈব যৌগ বলে অভিহিত করা হতো। অধুনা **কার্বনঘটিত যে কোনো যৌগকে জৈব যৌগ** বলা হয়। অবশ্য প্রায় সকল যৌগে কার্বনের সাথে হাইড্রোজেন সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন প্রকারের জৈব যৌগ রয়েছে যেমন অ্যালকেন, অ্যালকোহল, ইথার, অ্যামিন, জৈব এসিড প্রভৃতি। এগুলো হলো একেকটি সমগোত্রীয় শ্রেণি। এদের অণুতে বিদ্যমান বিশেষ মৌল বা মূলক যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি নিয়ন্ত্রণ করে । এ মৌল বা মূলককে **'কার্যকরী মূলক'** বলে। এ অধ্যায়ে আমরা এ সকল জৈব যৌগের প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার জানতে পারবো। এ অধ্যায়ে জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন শ্রেণির যৌগের বৈশিষ্ট্যসূচক বিক্রিয়া ও তাদের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। এগুলো হলো :

১০.১ জৈব যৌগ, জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ ও কার্যকরীমূলক পরিচিতি

১০.২ হাইড্রোকার্বন- শ্রেণিবিভাগ, প্রস্তুতি, ধর্ম ও এদের ব্যবহার

১০.৩ পেট্রোলিয়াম ও উপাদানসমূহ এবং এদের ব্যবহার, প্রাকৃতিক গ্যাস এবং এর যথাযথ ব্যবহার

১০.৪ অ্যালকোহল

১০.৫ কার্বনিল ও কাবক্সিলিক যৌগ

১০.৬ অ্যারোমেটিক যৌগের প্রাথমিক ধারণা

১০.১ জৈব যৌগ, জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ ও কার্যকরী মূলক পরিচিতি

জৈব যৌগ (Organic Compounds) : জীব শব্দটি থেকে জৈব শব্দের উৎপত্তি। জীবজগত (উদ্ভিদ ও প্রাণী) হতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত যৌগগুলোকে প্রাথমিকভাবে জৈব যৌগ বলে অভিহিত করা হয়। এ সংজ্ঞাটি **বার্জিলিয়াস (Berzelius,** 1808) কর্তৃক প্রদত্ত। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, জৈব যৌগে কার্বন থাকতেই হবে। এ কারণে অধুনা জৈব যৌগ বলতে কার্বনঘটিত সব যৌগকে বুঝানো হয়। কিন্তু জৈব যৌগের এ সংজ্ঞাটিও ত্রুটিমুক্ত নয়। কারণ সব কার্বন ঘটিত যৌগ জৈব যৌগ নয়। যেমন– CO_2, CS_2, CO, HCN ইত্যাদি। এরা অজৈব যৌগ।

জৈব যৌগ গঠনে হাইড্রোজেনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগকে হাইড্রোকার্বন বলা হয়। প্রায় সব জৈব যৌগকে হাইড্রোকার্বনের জাতক (derivatives) হিসেবে ধরা যায়। সুতরাং **জৈব যৌগের আধুনিকতম সংজ্ঞা** হবে নিম্নরূপ :

হাইড্রোকার্বন ও তাদের জাতককে জৈব যৌগ বলা হয়।

এ পর্যন্ত আবিস্কৃত জৈব যৌগের সংখ্যা 80 (আশি) লক্ষেরও অধিক। অর্থাৎ কার্বন এমন একটি মৌল যা বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন রকমের মৌলের সাথে যুক্ত হয়ে অসংখ্য যৌগ গঠনে সক্ষম ।

জৈব যৌগের উৎস (Sources of organic compounds) : জৈব যৌগের প্রধান উৎস হলো উদ্ভিদ, প্রাণী, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। অবশ্য বর্তমানে অধিকাংশ জৈব যৌগই সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুত করা হয়।

জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Organic Compounds)

বৈশিষ্ট্য অনুসারে জৈব যৌগসমূহকে প্রধানত দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় :

(১) অ্যালিফেটিক যৌগ (aliphatic compounds) ও

(২) অ্যারোমেটিক যৌগ (aromatic compounds)।

১। অ্যালিফেটিক যৌগ : অ্যালিফেটিক শব্দটি গ্রিক শব্দ অ্যালিফার (Aleipher) অর্থাৎ চর্বি জাতীয় (fatty) শব্দ হতে উদ্ভূত। চর্বিজাত বলে যদিও এ শ্রেণির যৌগের উৎসের কথা বলা হয়েছে, তবুও এখন তা আর প্রযোজ্য নয়। কারণ অ্যালিফেটিক শ্রেণিভুক্ত অধিকাংশ যৌগই চর্বিজাত নয়। বস্তুত, মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বন ও সম্পৃক্ত চাক্রিক হাইড্রোকার্বন এবং তাদের জাতককে **অ্যালিফেটিক যৌগ** বলে। যেমন

CH_3-CH_3
ইথেন

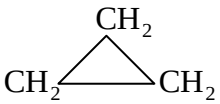
সাইক্লোপ্রোপেন

CH_3CH_2-OH
ইথানল

গঠনের ওপর ভিত্তি করে অ্যালিফেটিক যৌগসমূহকে পুনরায় দুই ভাগে ভাগ করা যায় :

(ক) মুক্ত শিকল অ্যালিফেটিক যৌগ এবং

(খ) বদ্ধ শিকল বা চাক্রিক অ্যালিফেটিক যৌগ

(ক) মুক্ত শিকল অ্যালিফেটিক যৌগ : যে সকল অ্যালিফেটিক যৌগের অণুতে কার্বন পরমাণুসমূহ পর পর যুক্ত হয়ে একটি শিকল গঠন করে, কিন্তু শিকলের দুই প্রান্ত পরস্পর যুক্ত হয় না তাদের **মুক্ত শিকল অ্যালিফেটিক** যৌগ বলে। যেমন, বিউটেন $CH_3CH_2CH_2CH_3$। মুক্ত শিকল যৌগসমূহের কার্বনে শিকলের বন্ধন প্রকৃতি অনুসারে দুই ধরনের হয়ে থাকে। যেমন :

(১) সম্পৃক্ত জৈব যৌগ ও

(২) অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ।

১। সম্পৃক্ত জৈব যৌগ : যে সব জৈব যৌগের কার্বন শিকলের কার্বন পরমাণুগুলো কেবল একক সিগমা বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে, তাদেরকে **সম্পৃক্ত জৈব যৌগ** বলে। যেমন, বিউটেন $(CH_3CH_2CH_2CH_3)$।

২। অসম্পৃক্ত জৈব যৌগ : যে সব জৈব যৌগের কার্বন শিকলে অন্তত দুটি কার্বন পরমাণু দ্বি বা ত্রি বন্ধন দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে, তাদেরকে **অসম্পৃক্ত যৌগ** বলা হয়। যেমন, ইথিন, ইথাইন ইত্যাদি।

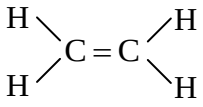

$H-C\equiv C-H$

(খ) বদ্ধ শিকল বা চাক্রিক অ্যালিফেটিক যৌগ : যে সব অ্যালিফেটিক জৈব যৌগের অণুতে কার্বন শিকলের দুই প্রান্তের কার্বন নিজেদের মধ্যে সরাসরি যুক্ত হয়ে কার্বন চক্র বা বলয় গঠন করে সে সব অ্যালিফেটিক যৌগকে **বদ্ধ শিকল অ্যালিফেটিক যৌগ** বলে। এরা **অ্যালিসাইক্লিক যৌগ নামেও** পরিচিত। অ্যালিসাইক্লিক যৌগ সুষমচাক্রিক ও বিষমচাক্রিক প্রকৃতির হয়।। যেমন–

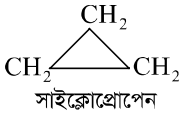
সাইক্লোপ্রোপেন

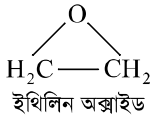
ইথিলিন অক্সাইড

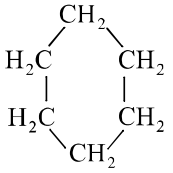
সাইক্লোহেক্সেন

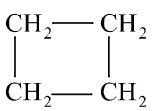
সাইক্লোবিউটেন

এলিসাইক্লিক যৌগও সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত প্রকৃতির হয়।

২। অ্যারোমেটিক যৌগ : যে সব জৈব যৌগের সুমিষ্ট গন্ধ বা অ্যারোমা (aroma) আছে তাদের প্রাথমিকভাবে অ্যারোমেটিক যৌগ বলা হতো। কিন্তু শ্রেণিবিভাগের ভিত্তি হিসেবে এরূপ ভৌত বৈশিষ্ট্য এখন আর প্রযোজ্য নয়। তীব্র কটু গন্ধবিশিষ্ট জৈব যৌগও রয়েছে। সুতরাং বেনজিন, বেনজিন-জাতক ও এক বা একাধিক বেনজিন বলয় যুক্ত যৌগ বা বেনজিনের ধর্ম সদৃশ যে কোনো চাক্রিক যৌগকে **অ্যারোমেটিক যৌগ** বলে। যেমন- বেনজিন, ফেনল, ন্যাফ্থালিন ইত্যাদি।

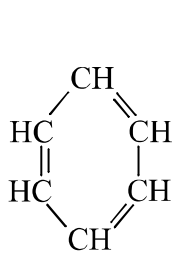
বেনজিন

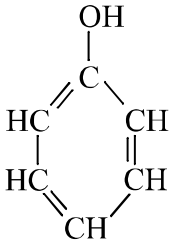
ফেনল

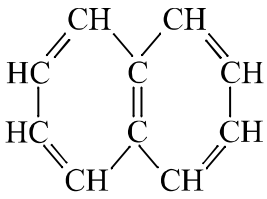
ন্যাফ্থালিন

অ্যারোমেটিক যৌগ আবার দুই প্রকার। যেমন :

(ক) কার্বোসাইক্লিক (carbocyclic) বা সুষম চাক্রিক অ্যারোমেটিক যৌগ ও

(খ) হিটারোসাইক্লিক (heterocyclic) বা বিষম চাক্রিক অ্যারোমেটিক যৌগ।

(ক) কার্বোসাইক্লিক বা সুষমচাক্রিক অ্যারোমেটিক যৌগ : যে সকল অ্যারোমেটিক যৌগের কাঠামোর বলয়টি শুধু মাত্র কার্বন পরমাণু দ্বারা গঠিত, তাদেরকে **কার্বোসাইক্লিক যৌগ** বলে। এ সকল যৌগের কাঠামোতে সাধারণত ছয় কার্বন বিশিষ্ট বেনজিন বলয় উপস্থিত থাকে। যেমন বেনজিন, টলুইন, ফেনল ইত্যাদি। (অ্যারোমেটিক যৌগের উদাহরণ দেখুন)।

(খ) হিটারোসাইক্লিক বা বিষমচাক্রিক অ্যারোমেটিক যৌগ : যে সকল অ্যারোমেটিক যৌগের বলয়-কাঠামোতে কার্বন ছাড়াও ভিন্ন মৌলের পরমাণু বা হিটারো পরমাণু যেমন, O, N, S প্রভৃতির এক বা একাধিক পরমাণু যুক্ত থাকে তাদের **হিটারোসাইক্লিক যৌগ** বলে। যেমন :

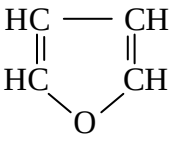
ফিউরান

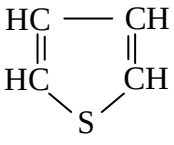
থায়োফিন

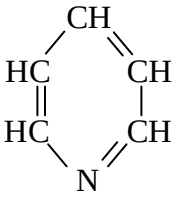
পিরিডিন

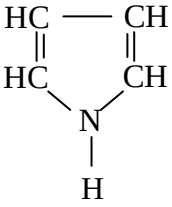
পাইরোল

এক নজরে জৈব যৌগের শ্রেণি বিভাগ নিচে দেখানো হলো :

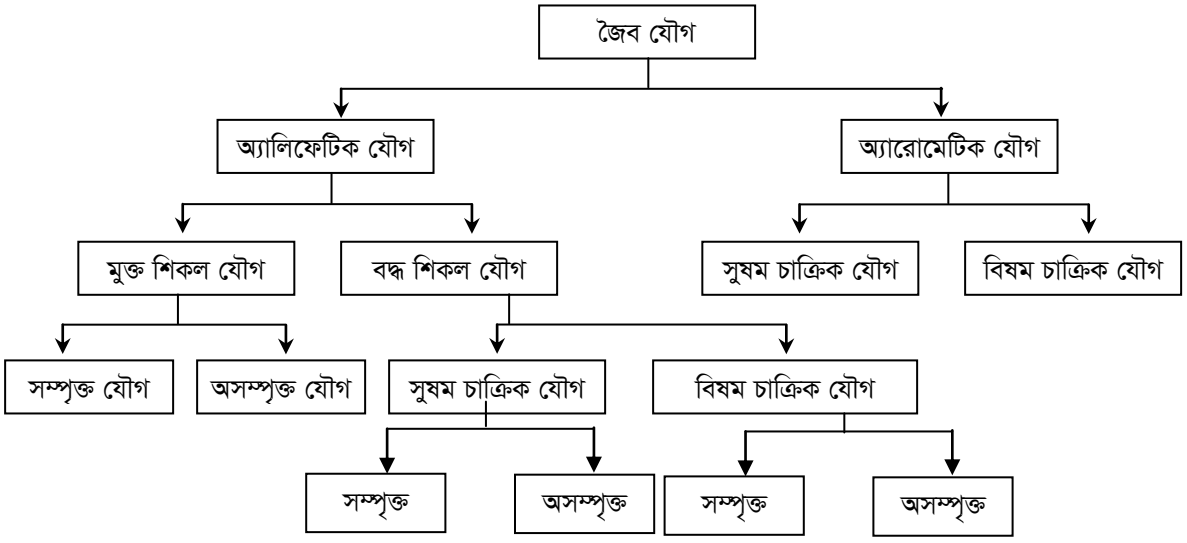

সমগোত্রীয় শ্রেণি (Homologous Series)

বর্তমানে জৈব যৌগের সংখ্যা আশি লক্ষের অধিক। জৈব যৌগ অধ্যয়নের সুবিধার্থে জৈব যৌগসমূহকে তাদের ধর্মের সাদৃশ্যের ভিত্তিতে কতকগুলো শ্রেণি বা গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি গোত্রের একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন– প্রতিটি অ্যালকেন একটি গোত্র, তেমনি কার্বক্সিলিক এসিড আরেকটি গোত্র। অ্যালকেনের সাথে কার্বক্সিলিক এসিডের পার্থক্য অনেক। কিন্তু অ্যালকেন গোত্রের সদস্য যেমন– মিথেন (CH_4) ও ইথেনের (CH_3-CH_3) ধর্মে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই। তাই বলা যায়, **একই প্রকার মৌল সমন্বয়ে গঠিত সমধর্মী জৈব যৌগসমূহকে তাদের ক্রমবর্ধমান আণবিক ভর অর্থাৎ তাদের অণুস্থিত কার্বন পরমাণুর সংখ্যার ক্রম বৃদ্ধি অনুসারে পর পর সাজিয়ে যে সারি পাওয়া যায় তাতে যদি পাশাপাশি দুটি যৌগের মধ্যে একটি মিথিলিন $(-CH_2-)$ মূলকের পার্থক্য থাকে এবং যৌগগুলোকে একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়, তাহলে ঐ সারিকে ঐ যৌগসমূহের সমগোত্রীয় শ্রেণি বলে**। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির প্রত্যেক সদস্য যৌগকে এক একটি **সমগোত্রক** বা **হোমোলগ** (homologue) বলে।

উদাহরণ : অ্যালকেন একটি সমগোত্রীয় শ্রেণি। অ্যালকেনের সাধারণ সংকেত হলো, $\mathbf{C_nH_{2n+2}}$। এক্ষেত্রে $n = 1, 2, 3, 4, ...$ ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা ধরলে অ্যালকেন শ্রেণির সকল সদস্যের সংকেত নির্ণয় করা যায়। যেমন –

$n = 1$ হলে যৌগটির সংকেত হয় CH_4 (মিথেন)

$n = 2$ হলে যৌগটির সংকেত হয় C_2H_6 (ইথেন)

উপরের উদাহরণে স্পষ্ট যে, পাশাপাশি দুই যৌগের আণবিক সংকেত পার্থক্য মাত্র একটি মিথিলিন $-CH_2-$ মূলকের। সুতরাং অ্যালকেন একটি সমগোত্রীয় শ্রেণি। মিথেন, ইথেন, প্রোপেন ইত্যাদি হলো অ্যালকেন সমগোত্রীয় শ্রেণির এক একটি সমগোত্রক।

সারণি ১০.১ : সমগোত্রীয় শ্রেণির নাম, সাধারণ সংকেত ও উদাহরণ

সমগোত্রীয় শ্রেণির নাম	সাধারণ সংকেত	উদাহরণ
অ্যালকেন	C_nH_{2n+2}	CH_4 (মিথেন), CH_3CH_3 (ইথেন)
অ্যালকিন	C_nH_{2n}	C_2H_4 (ইথিন), C_3H_6 (প্রোপিন)
অ্যালকোহল	$C_nH_{2n+1}OH$	CH_3CH_2OH (ইথানল), $CH_3CH_2CH_2OH$ (প্রোপানল)
অ্যালডিহাইড	$C_nH_{2n+1}CHO$	CH_3CHO (ইথানাল), CH_3CH_2CHO (প্রোপানাল)
কিটোন	$C_nH_{2n}O(n=3)$	CH_3COCH_3 (প্রোপানোন); $CH_3COCH_2CH_3$ (বিউটানোন)
কার্বক্সিলিক এসিড	$C_nH_{2n+1}COOH$	CH_3COOH (ইথানয়িক এসিড) CH_3CH_2COOH (প্রোপানয়িক এসিড)

প্রত্যেক সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগসমূহের মধ্যে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকে। যথা-

১। এদের একটি সাধারণ সংকেত দ্বারা প্রকাশ করা যায়।

২। এদের একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক থাকে। যেমন– অ্যালকোহলের কার্যকরী মূলক হলো $-OH$।

৩। পাশাপাশি দুই সমগোত্রকের মধ্যে মিথিলিন মূলক $(-CH_2-)$-এর পার্থক্য থাকে।

৪। এদের একই সাধারণ পদ্ধতির সাহায্যে প্রস্তুত করা যায়।

৫। একই সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগসমূহের একই কার্যকরী মূলক থাকায় এদের রাসায়নিক ধর্মে সাদৃশ্য থাকে। কিন্তু আণবিক ভর বৃদ্ধির সঙ্গে ভৌত ধর্ম যেমন, গলনাংক, স্ফুটনাংক, ঘনত্ব প্রভৃতির নিয়মিত ক্রমানুসারে পরিবর্তন ঘটে। যেমন মিথানল (CH_3OH) এর স্ফুটনাংক 65^oC, ইথানল (C_2H_5OH) এর স্ফুটনাংক 78.3^oC।

শিক্ষার্থীর কাজ : (১) আইসোপ্রোপানল ও ২-বিউটিন্যালে এর সমগোত্রীয় শ্রেণি এক নয়–ব্যাখ্যা কর।
(২) দেখাও যে, মিথানয়িক ও ইথানয়িক এসিড একই সমগোত্রীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত।
(৩) ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথারের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম ভিন্ন হয়–ব্যাখ্যা কর।

কার্যকরী মূলক (Functional Groups)

কোনো সমগোত্রীয় শ্রেণির সকল সদস্য একই রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে। পক্ষান্তরে, ভিন্ন ভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগসমূহ ভিন্ন ভিন্ন রাসায়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে। যেমন, অ্যালকোহল ও কার্বক্সিলিক এসিড উভয়ই ভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির। সুতরাং অ্যালকোহল ও কার্বক্সিলিক এসিডের রাসায়নিক ধর্মাবলির মধ্যে যথেষ্ট বৈসাদৃশ্য আছে। এর কারণ হলো প্রত্যেক সমগোত্রীয় শ্রেণির সদস্যসমূহের অণুতে নির্দিষ্ট পরমাণু বা পরমাণুগোষ্ঠী উপস্থিত থাকে, যা ঐ গোত্রের সকল সদস্যের জন্য একই রাসায়নিক ধর্মাবলি প্রদর্শন করে এবং অন্য সমগোত্রীয় শ্রেণির সদস্যসমূহের ধর্ম থেকে ভিন্নতা প্রকাশ করে। কোনো সমগোত্রীয় শ্রেণির ধর্ম নিয়ন্ত্রণকারী এরূপ পরমাণু গোষ্ঠী বা মূলকই কার্যকরী মূলক নামে অভিহিত। অর্থাৎ **কোনো জৈব যৌগের অণুতে বিদ্যমান কোনো পরমাণু বা পরমাণু গোষ্ঠী (মূলক) ঐ যৌগের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম নির্ধারণ করে তাকে কার্যকরী মূলক বলে**।

উদাহরণ : মিথাইল অ্যালকোহল (CH_3OH) ও ইথাইল অ্যালকোহল (CH_3CH_2OH)। এই উভয় যৌগের ধর্ম প্রধানত তাদের অণুস্থিত $-OH$ মূলকের ওপর নির্ভরশীল। তাই অ্যালকোহলসমূহের কার্যকরী মূলক হলো অ্যালকোহলিক মূলক $(-OH)$, অ্যালডিহাইডসমূহের কার্যকরী মূলক হলো অ্যালডিহাইড মূলক $(-CHO)$; জৈব এসিডসমূহের কার্যকরী মূলক হলো কার্বক্সিল মূলক $(-COOH)$। বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির কার্যকরী মূলকের নাম, সংকেত ও গাঠনিক সংকেত নিচের সারণিতে দেখানো হলো।

সারণি ১০.২ : বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণির কার্যকরী মূলক

সমগোত্রীয় শ্রেণি	সমগোত্রীয় শ্রেণির সাধারণ সংকেত	কার্যকরী মূলকের সংকেত	কার্যকরী মূলকের গাঠনিক সংকেত	কার্যকরী মূলকের নাম
১। অ্যালকেন	RCH_2-CH_2R বা C_nH_{2n+2}	$-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-$	$-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}-$	কার্বন-কার্বন একক সিগমা (σ) বন্ধন
২। অ্যালকিন	$RCH=CHR$ বা C_nH_{2n}	$-C=C-$	$-C=C-$	কার্বন-কার্বন দ্বি বন্ধন
৩। অ্যালকাইন	$RC\equiv CR$ বা C_nH_{2n-2}	$-C\equiv C-$	$-C\equiv C-$	কার্বন-কার্বন ত্রি বন্ধন
৪। অ্যালকাইল হ্যালাইড	$R-X$	$-X$	$-Cl,-Br,-I$	হ্যালাইড মূলক
৫। অ্যালকোহল	$R-OH$	$-OH$	$-O-H$	হাইড্রক্সিল মূলক বা অ্যালকোহলিক মূলক
* প্রাইমারি অ্যালকোহল	$R-CH_2OH$	$-CH_2OH$	$-\overset{H}{\underset{H}{\overset{\vert}{\underset{\vert}{C}}}}-O-H$	1^o - অ্যালকোহলিক মূলক
* সেকেন্ডারি অ্যালকোহল	R_2CHOH	$-\overset{\vert}{C}HOH$	$-\overset{H}{\overset{\vert}{C}}-O-H$	2^o -অ্যালকোহলিক মূলক
* টারসিয়ারি অ্যালকোহল	R_3C-OH	$-\overset{\vert}{C}-OH$	$-\overset{\vert}{C}-O-H$	3^o - অ্যালকোহলিক মূলক
৬. অ্যালডিহাইড	$R-CHO$	$-CHO$	$-\overset{O}{\overset{\Vert}{C}}-H$	অ্যালডিহাইড মূলক

৭. কিটোন	$R-CO-R$	$-CO-$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-$	কার্বনিল মূলক বা কিটোনিক মূলক
৮. কার্বক্সিলিক এসিড	$R-COOH$	$-COOH$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-H$	কার্বক্সিল মূলক
৯. ইথার	RCH_2OCH_2R	$\equiv C-O-C\equiv$	$-\overset{\mid}{\underset{\mid}{C}}-O-\overset{\mid}{\underset{\mid}{C}}-$	ইথার মূলক
১০. অ্যালকাইল অ্যামিন	$R-NH_2$	$-NH_2$	$-\overset{\overset{\displaystyle H}{\mid}}{N}-H$	অ্যামিনো মূলক
১১. এসিড অ্যামাইড	$R-CONH_2$	$-CONH_2$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-\overset{\overset{\displaystyle H}{\mid}}{N}-H$	অ্যামাইড মূলক
১২. এসিড ক্লোরাইড	$R-COCl$	$-COCl$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-Cl$	এসিড ক্লোরাইড মূলক
১৩. এস্টার	$R-CO-OR$	$-CO-OR$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-R$	এস্টার মূলক
১৪. এসিড অ্যানহাইড্রাইড	$(RCO)_2O$	$(-CO)_2O$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-$	অ্যান্হাইড্রাইড মূলক
১৫. অ্যালকাইল সায়ানাইড	$R-CN$	$-CN$	$-C\equiv N$	সায়ানাইড মূলক
১৬. নাইট্রো যৌগ	$R-NO_2$	$-NO_2$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{N}\rightarrow O$	নাইট্রো মূলক
১৭. সালফোনিক এসিড	$Ar.SO_3H$	$-SO_3H$	$-\overset{\overset{\displaystyle O}{\uparrow}}{\underset{\underset{\displaystyle O}{\downarrow}}{S}}-O-H$	সালফোনিক এসিড মূলক
১৮. ফেনল	$Ar.-OH$	$=\underset{\mid}{C}-OH$	$=\underset{\mid}{C}-OH$	ফেনলিক মূলক

শিক্ষার্থীর কাজ : কার্যকরী মূলকের ভিত্তিতে জৈব যৌগের সমগোত্রীয় শ্রেণি চিহ্নিতকরণ :

CH_4	$CH_2=CH_2$	$CH\equiv CH$	CH_3COCH_3	CH_3OH
CH_3CHO	CH_3NH_2	CH_3CONH_2	C_2H_5COOH	$C_2H_5O-CH_3$
CH_3CONHR $CH_3\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}OCH_2CH_3$	$CH_3-CO-NH-CO-CH_3$ $CH_3CH_2COOCH_3$		$\overset{\overset{\displaystyle R}{\mid}}{\underset{\underset{\displaystyle R}{\mid}}{N}}-R$	$C_6H_5NO_2$ CH_3COCl

আপনারা উপরিউক্ত যৌগগুলো কার্যকরী মূলকসহ সমগোত্রীয় শ্রেণি উল্লেখ করুন।

১০.২ হাইড্রোকার্বনসমূহ- এদের শ্রেণিবিভাগ, প্রস্তুতি, ধর্ম ও ব্যবহার

জৈব যৌগের প্রথম পরিচিত যৌগশ্রেণি হলো হাইড্রোকার্বন। হাইড্রোকার্বনসমূহ মূলত কার্বন ও হাইড্রোজেন নিয়ে গঠিত। আমাদের রান্নার কাজে ব্যবহৃত গ্যাস হলো **মিথেন** যা একটি হাইড্রোকার্বন। এদেরকে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত এ দুই শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। আবার বহুল পরিচিত **পলিথিন** একটি পলিমার-এটি ইথিলিন দ্বারা গঠিত। ইথিলিন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। গ্যাসের সিলিন্ডার ব্যবহার করে ধাতুর টুকরা জোড়া লাগানোর পদ্ধতিটি আমাদের কাছে কমবেশি পরিচিত একটি ঘটনা। যে গ্যাসটি এ কাজে ব্যবহৃত হয় তা হলো **'অক্সি-এসিটিলিন'** শিখা। এখানে এসিটিলিন হলো একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। এদের সমগোত্রীয় শ্রেণি হলো যথাক্রমে অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইন। এ অংশে এ তিনটি সমগোত্রীয় শ্রেণির সরলতম যৌগগুলোর বিভিন্ন প্রকার প্রস্তুতি, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম আলোচিত হলো।

অ্যালকেন (Alkanes)

অ্যালকেন একটি সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। যে সকল হাইড্রোকার্বন অণুতে কেবল কার্বন-কার্বন একক সমাযোজী বন্ধন অর্থাৎ সিগমা বন্ধন বিদ্যমান থাকে তাদের **সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন (**saturated hydrocarbons**)** বলে। IUPAC পদ্ধতিতে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের নাম অ্যালকেন। যেমন, মিথেন (CH_4), ইথেন (CH_3-CH_3), প্রোপেন $(CH_3-CH_2-CH_3)$। এদের সাধারণ সংকেত হলো C_nH_{2n+2} $(n = 1, 2, 3$ ইত্যাদি হলো কার্বন-সংখ্যা)

সাধারণভাবে অ্যালকেন **প্যারাফিন** (paraffins) নামে পরিচিত। গ্রীক Parum ও affinis শব্দ সমন্বয়ে paraffin শব্দটি গঠিত। Parum অর্থ স্বল্প এবং affinis অর্থ আসক্তি। সুতরাং paraffin অর্থ স্বল্প আসক্তির যৌগ। দৃঢ় সিগমা বন্ধন দ্বারা গঠিত অ্যালকেন সহজে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না বলে এদের এ নামকরণ করা হয়েছে।

অ্যালকেনসমূহের প্রধান উৎস হলো পেট্রোলিয়াম তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাসে 96–98% মিথেন বিদ্যমান। অন্যান্য উৎসের মধ্যে মূলত মার্শ গ্যাস ও কোল গ্যাস থেকে মিথেন পাওয়া যায়। জলাভূমি (marshy land) হতে মিথেন পাওয়া যায় তাই তাকে **মার্শ গ্যাস** বলা হয়। অ্যালকেন পরিবারের প্রথম সদস্য হলো মিথেন। C_1–C_4 বিশিষ্ট অ্যালকেনসমূহ সাধারণ তাপমাত্রায় ও চাপে গ্যাসীয়। C_5–C_{15} পর্যন্ত অ্যালকেনসমূহ তরল। C_{16} এবং এর ওপরের অ্যালকেনগুলো মোম জাতীয় কঠিন পদার্থ। এদেরকে **প্যারাফিন মোম** বলা হয়।

অ্যালকেনসমূহের আণবিক ভর বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের স্ফুটনাংক ও গলনাংক বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে শাখাহীন অ্যালকেনের চেয়ে শাখাযুক্ত অ্যালকেনের স্ফুটনাংক হ্রাস পায়। যেমন–

$CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$ n-পেন্টেন, স্ফুটনাংক 36^oC

iso-পেন্টেন, স্ফুটনাংক 28^oC

neo-পেন্টেন, স্ফুটনাংক (9.5^oC)

অ্যালকেনসমূহ অপোলার। অণুতে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ নেই। এরা পোলার দ্রাবক যেমন পানিতে অদ্রবণীয়। অ্যালকেনের ঘনত্ব পানির ঘনত্বের চেয়ে কম। ফলে পেট্রোল, কেরোসিন প্রভৃতি পানিতে ভাসে।

অ্যালকেনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালী (General methods of preparation of alkanes)

১। অ্যালকিন হতে : অ্যালকিনের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হাইড্রোজেন মিশ্রিত করে সূক্ষ্ম নিকেল প্রভাবকের ওপর $200–300^oC$ তাপমাত্রায় প্রবাহিত করলে অ্যালকেন পাওয়া যায়। যেমন– ইথিনের সাথে হাইড্রোজেনের গ্যাসের বিক্রিয়ায় ইথেন পাওয়া যায়।

$$H_2C=CH_2 + H_2 \xrightarrow[200–300^oC]{Ni} H_3C-CH_3$$

ইথিন ইথেন

২। অ্যালকাইন হতে : অ্যালকাইনের সাথে প্রয়োজনীয় পরিমাণ হাইড্রোজেন মিশ্রিত করে সূক্ষ্ম নিকেল প্রভাবকের ওপর $200-300^oC$ তাপমাত্রায় প্রবাহিত করলে অ্যালকেন পাওয়া যায়। এ বিক্রিয়াটি ইথিনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ার মতো তবে এখানে দ্বিগুণ পরিমাণ হাইড্রোজেন প্রয়োজন হয়। এখানে প্রোপাইনের সাথে হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় প্রোপেন উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{প্রোপাইন}}{CH \equiv C - CH_3} + 2H_2 \xrightarrow[200\text{-}300^oC]{Ni} \underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3 - CH_2 - CH_3}$$

উপরিউক্ত দু'টি বিক্রিয়ায় কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন এবং কার্বন-কার্বন ত্রি-বন্ধনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় বলে এই ধরনের বিক্রিয়াকে **হাইড্রোজেনেশন** (hydrogenation) বিক্রিয়া বলে। অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন হতে সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন প্রস্তুতির বিক্রিয়াকে **'সংযোজন বা যুত বিক্রিয়া'** বলে। এখানে নিকেল প্রভাবকের পরিবর্তে প্যালাডিয়াম (Pd) বা প্লাটিনাম (Pt) ব্যবহার করা যায়। কিন্তু এগুলো নিকেলের চেয়ে অধিক মূল্যবান।

৩। অ্যালকাইল হ্যালাইড হতে : অ্যালকাইল হ্যালাইড (R-X) হতে অ্যালকেন তিনটি উপায়ে তৈরি করা যায়।

(i) বিজারণ দ্বারা : অ্যালকাইল হ্যালাইডকে অ্যালকোহল মাধ্যমে

- জিংক ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড (Zn + HCl)

  $Zn + HCl \quad ZnCl_2 \longrightarrow + 2[H]$, অথবা

- সোডিয়াম ও অ্যালকোহল (Na + ROH)

  $C_2H_5OH + Na \longrightarrow C_2H_5ONa + [H]$, অথবা

- প্লাটিনাম প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন ব্যবহার করে অ্যালকেন তৈরি করা যায়। হাইড্রোজেনের সংযোগ হয় বলে একে **বিজারণ বিক্রিয়া** বলে।

$$RX + 2[H] \longrightarrow R - H + HX$$

উদাহরণ :

$$\underset{\text{মিথাইল ক্লোরাইড}}{CH_3Cl} + 2[H] \longrightarrow \underset{\text{মিথেন}}{CH_4} + HCl$$

(ii) উর্টজ বিক্রিয়া দ্বারা (By Wurtz reaction) : শুষ্ক ইথারের দ্রবণে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে সোডিয়াম ধাতুর বিক্রিয়ার ফলে অ্যালকেন প্রস্তুত হয়। এ পদ্ধতিতে উচ্চতর অ্যালকেন উৎপাদন করা যায়। বিক্রিয়ক অণুতে যতটি কার্বন পরমাণু থাকে উৎপাদ অণুতে দ্বিগুণ সংখ্যক কার্বন সৃষ্টি হয়।

$$\underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{2\,RX} + 2Na \xrightarrow[\text{ইথার}]{\text{শুষ্ক}} \underset{\text{উচ্চতর অ্যালকেন}}{R - R} + 2NaX$$

$$2CH_3I + 2Na \xrightarrow[\text{ইথার}]{\text{শুষ্ক}} CH_3 - CH_3 + 2NaI$$

উদাহরণস্বরূপ অ্যালকাইল হ্যালাইডের যথা আয়োডোমিথেনের (CH_3I) একটি অণুতে একটি কার্বন পরমাণু আছে । এর দুইটি ভিন্ন অণু উর্টজ বিক্রিয়ার মাধ্যমে যে উৎপাদ, ইথেন ($CH_3\,CH_3$) গঠন করে তাতে দুটি কার্বন পরমাণু থাকে। এটি উর্টজ বিক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য।

যদি ভিন্ন অ্যালকাইল হ্যালাইডের দুইটি অণু এই বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে তবে একাধিক উচ্চতর অ্যালকেনের মিশ্রণ উৎপন্ন হয়। আয়োডোমিথেন ও আয়োডোইথেনের মিশ্রণ নিয়ে উর্টজ বিক্রিয়া করলে অ্যালকেনের ইথেন, প্রোপেন এবং বিউটেন প্রস্তুত হয়।

$$3CH_3I + 3CH_3CH_2I + Na \xrightarrow[\text{ইথার}]{\text{শুষ্ক}} CH_3 - CH_3 + CH_3CH_2CH_3 + CH_3CH_2CH_2CH_3 + 6NaI$$

৪। গ্রিগনার্ড বিকারক (Grignard reagent) থেকে : মিথাইল আয়োডাইডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম ধাতু নিয়ে শুষ্ক ইথার দ্রবণে 6-8 ঘণ্টা রিফ্লাক্স করলে মিথাইলম্যাগনেসিয়ামআয়োডাইড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{মিথাইল আয়োডাইড}}{CH_3I} + Mg \xrightarrow{\text{শুষ্ক ইথার}} \underset{\text{মিথাইলম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড}}{CH_3MgI}$$

পানি ও গ্রিগনার্ড বিকারকের বিক্রিয়া থেকে অ্যালকেন পাওয়া যায় । গ্রিগনার্ড বিকারকের ঋণাত্মক অ্যালকাইল অংশ পানির ধনাত্মক হাইড্রোজেন অংশের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন করে।

$$\overline{R} - \overset{+}{M}gX + \overset{+}{H} - OH \longrightarrow R - H + Mg(OH)X$$

উদাহরণ : $\overline{C}H_3\overset{+}{M}gI + \overset{+}{H} - OH \longrightarrow CH_4 + Mg(OH)I$

৫। কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ থেকে

কার্বক্সিলিক এসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম (কঠিন CaO এবং কঠিন NaOH এর মিশ্রণ) সহযোগে উত্তপ্ত করলে অ্যালকেন পাওয়া যায়। পরীক্ষাগারে এ পদ্ধতিতে অ্যালকেন প্রস্তুত করা যায়।

$$R - \underset{\text{সোডিয়াম কার্বক্সিলেট}}{\boxed{COONa + NaO}}H \xrightarrow{CaO} \underset{\text{অ্যালকেন}}{R - H} + Na_2CO_3(s)$$

উদাহরণ ঃ সোডিয়াম ইথানয়েটকে সোডালাইমসহ উত্তপ্ত করলে মিথেন তৈরি হয়।

$$CH_3COONa(s) + NaOH(s) \xrightarrow{CaO(s)} CH_4(g) + Na_2CO_3$$

এখানে লক্ষণীয় যে, কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ থেকে যে অ্যালকেন পাওয়া যায় তার মধ্যে এসিডে কার্বন সংখ্যার চেয়ে একটি কার্বন কম থাকে। এই বিক্রিয়াকে ডিকার্বক্সিলেশন (decarboxylation) বিক্রিয়া বলে। তাপের প্রভাবে কোনো জৈব এসিড থেকে CO_2-এর অপসারণকে **ডিকার্বক্সিলেশন** বলে। সোডালাইমের মধ্যে NaOH-ই মূলত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। NaOH একটি পানিগ্রাসী পদার্থ। CaO থাকার জন্য NaOH পানি শোষণ করে তরলে পরিণত হয় না। NaOH অপেক্ষা সোডালাইম কম কাঁচ ক্ষয়কারী এবং এটি সচ্ছিদ্র হওয়ায় সোডালাইমের ছিদ্র দিয়ে উৎপন্ন গ্যাস সহজে নির্গত হতে পারে। এজন্য সোডালাইম ব্যবহার করা হয়।

অ্যালকেনের ভৌত ধর্ম (Physical properties)

একটি সমগোত্রীয় শ্রেণির সদস্যসমূহের মধ্যে তাদের ভৌত ধর্মে একটি ক্রম পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ হলো যৌগসমূহের মধ্যে $-CH_2-$ পার্থক্য থাকায় পর পর অবস্থিত সদস্যদ্বয়ের ধর্মে ধারাবাহিকতা দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ মিথেন হতে বিউটেন পর্যন্ত কক্ষ তাপমাত্রায় ভৌত অবস্থা গ্যাসীয়, কিন্তু এর পরের যৌগগুলো তরল হয়।

	অ্যালকেন	সংকেত	স্ফুটনাংক (°C)
কক্ষ তাপমাত্রায় গ্যাস	মিথেন	CH_4	-164
	ইথেন	C_2H_6	-89
	প্রপেন	C_3H_8	-42
কক্ষ তাপমাত্রায় তরল	বিউটেন	C_4H_{10}	-0.5
	পেন্টেন	C_5H_{12}	36
	হেক্সেন	C_6H_{14}	69
	হেপ্টেন	C_7H_{16}	98
	অক্টেন	C_8H_{18}	125

যৌগগুলোর আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে যৌগের স্ফুটনাংক ক্রমশ আনুপাতিক হারে বাড়ে। আণবিক ভর বৃদ্ধি পেলে অস্থায়ী ডাইপোল মোমেন্ট বৃদ্ধি পায়। ফলে অণুসমূহের মধ্যে ভ্যানডার ওয়ালস আকর্ষণ বল বৃদ্ধি পায়। তাই ভর বৃদ্ধি অর্থাৎ কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এ আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় বলে অ্যালকেনের স্ফুটনাংক আণবিক ভরের সাথে বৃদ্ধি পায়। যৌগের অন্যান্য ভৌত ধর্ম যেমন ঘনত্ব এবং সান্দ্রতা অ্যালকেনের আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে তাদের স্ফুটনাংকের অনুরূপ পরিবর্তিত হয়।

অ্যালকেনের রাসায়নিক ধর্ম : (Chemical Properties)

অ্যালকেনের রাসায়নিক ধর্ম অন্যান্য সমগোত্রীয় শ্রেণির ধর্মের মতোই সদৃশ হয়। একটি সমগোত্রীয় শ্রেণির যৌগসমূহের ধর্ম অণুতে বিদ্যমান 'কার্যকরী মূলকের' ওপর নির্ভরশীল। নিচে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ.....

(ক) প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution reaction)

(খ) তাপীয় বিক্রিয়া বা পাইরোলাইসিস (Thermal reaction or Pyrolysis)

(গ) জারণ বিক্রিয়া (Oxidation Reaction)

দহন বিক্রিয়া আনতে হবে

(ক) প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া : যে সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় রাসায়নিক যৌগে অবস্থিত কোনো পরমাণু বা মূলক অন্য কোনো পরমাণু বা মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, তাদের **প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া** বলে। যেমন–

$$CH_3-OH + HCl \longrightarrow CH_3-Cl + H_2O$$

নিম্নে অ্যালকেনের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াসমূহ আলোচনা করা হলো :

১। হ্যালোজেনেশন : আলোর উপস্থিতিতে হ্যালোজেন পরমাণু (ক্লোরিন, ব্রোমিন) অ্যালকেনের এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে অ্যালকেনের হ্যালোজেন যৌগ এবং হ্যালোজেনিক এসিড উৎপন্ন করে। এরূপ বিক্রিয়াকে **হ্যালোজেনেশন** বলে। যেমন–

মিথেনের সাথে ক্লোরিনের এরূপ বিক্রিয়া ঘটে। এ প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া অন্ধকারে ধীরে ধীরে কিন্তু সূর্যালোকে অতি দ্রুত সংঘটিত হয়। ক্লোরিন বিক্ষিপ্ত সূর্যালোকে মিথেনের সাথে বিক্রিয়া করে একটির পর একটি হাইড্রোজেন পরমাণুকে প্রতিস্থাপিত করে।

২।

$$\underset{\text{মিথেন}}{CH_4} \xrightarrow[-HCl]{Cl_2(\text{বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক})} \underset{\text{মিথাইল ক্লোরাইড}}{CH_3Cl} \xrightarrow[-HCl]{Cl_2(\text{বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক})} \underset{\text{মিথিলিন ক্লোরাইড}}{CH_2Cl_2} \xrightarrow[-HCl]{Cl_2(\text{বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক})} \underset{\text{ক্লোরোফর্ম}}{CHCl_3}$$

$$\underset{\text{কার্বন টেট্রাক্লোরাইড}}{CCl_4} \xleftarrow[-HCl]{Cl_2(\text{বিক্ষিপ্ত সূর্যালোক})} CHCl_3$$

৩। সালফোনেশন : $400^\circ C$ তাপমাত্রায় অ্যালকেন এবং ধূমায়মান সালফিউরিক এসিড কে উত্তপ্ত করলে, $-SO_3H$ মূলক দ্বারা অ্যালকেনের H-পরমাণু প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকেন সালফোনিক এসিড গঠন করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকেন}}{RH} + H_2SO_4 \xrightarrow{400^\circ C} \underset{\substack{\text{অ্যালকেন}\\ \text{সালফোনিক এসিড}}}{RSO_3H} + H_2O$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{মিথেন}}{2CH_4} + H_2SO_4 \xrightarrow{400^\circ C} \underset{\substack{\text{মিথেন}\\ \text{সালফোনিক এসিড}}}{2CH_3SO_3H} + H_2O$$

(খ) তাপীয় বিক্রিয়া বা পাইরোলাইসিস : বাতাস কিংবা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে $500^\circ C - 600^\circ C$ তাপমাত্রায় উচ্চতর অ্যালকেন অর্থাৎ বেশি সংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট অ্যালকেন ভেঙে ক্ষুদ্রতর অ্যালকিনে অর্থাৎ কম সংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট অ্যালকিনে পরিণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে তাপীয় বিয়োজন (Craking) বলে। যেমন–

$$\underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3CH_2CH_3} \xrightarrow{500^\circ C} \underset{\text{প্রোপিন}}{CH_3CH=CH_2} + \underset{\text{ইথিলিন}}{CH_2=CH_2} + \underset{\text{মিথেন}}{CH_4} + H_2$$

(গ) জারণ বিক্রিয়া : পর্যাপ্ত বায়ু বা অক্সিজেনে অ্যালকেন দগ্ধ হয়ে CO_2 ও পানি উৎপন্ন করে। যেমন–

$$CH_4 + 2O_2 \longrightarrow CO_2 + 2H_2O + 213\,kcal/mol$$

$$2CH_3CH_3 + 7O_2 \longrightarrow 4CO_2 + 6H_2O + 368\,kcal/mol$$

আবার, কম বায়ু বা অক্সিজেনের মধ্যে অ্যালকেনকে দহন করলে কার্বন ও কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। যেমন–

$$2CH_4 + 3O_2 \longrightarrow 2CO + 4H_2O$$

অ্যালকিন (Alkenes)

যে সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে পাশাপাশি অন্তত দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পর কার্বন কার্বন দ্বি-বন্ধন $(C=C)$ দ্বারা যুক্ত তাদেরকে **অ্যালকিন (Alkenes) বা অলিফিন (Olifin) বলে**। অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত $\mathbf{C_nH_{2n}}$। অ্যালকিনসমূহ যে সকল দ্বি-বন্ধনের দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে ইথিলীনীয় বন্ধন (Ethylenic bond) বা অলিফিনিক বন্ধন (Olifinic bond) বলে। যেমন ইথিন বা বা ইথিলিন $(H_2C=CH_2)$, প্রাপিন বা প্রোপিলিন $(CH_3-CH=CH_2)$ প্রভৃতি অ্যালকিন। অ্যালকিনের প্রধান উৎস পেট্রোলিয়াম। তাছাড়া উপযুক্ত পরিবেশে পাইরোলাইসিস দ্বারা অ্যালকেন থেকে অ্যালকিন পাওয়া যায়। যেমন–

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকেন}}{C_nH_{2n+2}} \xrightarrow{\text{পাইরোলাইসিস}} \underset{\text{অ্যালকিন}}{C_nH_{2n}}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথেন}}{CH_3CH_3} \xrightarrow{\text{পাইরোলাইসিস}} \underset{\text{ইথিন বা ইথিলিন}}{H_2C=CH_2} + H_2$$

অ্যালকিনের প্রস্তুতি (Preparation of Alkenes)

১। অ্যালকোহলের ডিহাইড্রেশন বা নিরুদন দ্বারা

(ক) অ্যালকোহলকে গাঢ় H_2SO_4 বা গাঢ় H_3PO_4-এর সাথে $170^\circ C-185^\circ C$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে অ্যালকোহল থেকে এক অণু পানি অপসারিত হয় এবং অ্যালকিন উৎপন্ন হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকোহল}}{RCH_2-OH} \xrightarrow[\text{গাঢ় } H_2SO_4]{160\text{-}170^\circ C} \underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CH_2} + H_2O$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2-OH} \xrightarrow[\text{গাঢ় } H_2SO_4]{160\text{-}170^\circ C} \underset{\text{ইথিলিন}}{H_2C=CH_2} + H_2O$$

$$\underset{\text{প্রোপানল}}{CH_3CH_2CH_2-OH} \xrightarrow[\text{গাঢ় } H_2SO_4]{160\text{-}170^\circ C} \underset{\text{প্রোপিলিন}}{CH_3CH=CH_2} + H_2O$$

২। অ্যালকাইল হ্যালাইডের ডিহাইড্রোহ্যালোজিনেশন দ্বারা ঃ ইথানলীয় KOH বা NaOH দ্রবণের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইড মিশ্রিত করে মিশ্রণকে উত্তপ্ত করলে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। যেমন–

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{RCH_2CH_2-X} \xrightarrow[KOH,]{\text{ইথানলীয়}} \underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CH_2} + KX + H_2O$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{প্রোপাইল ব্রোমাইড}}{CH_3CH_2CH_2-Br} \xrightarrow[KOH,]{\text{ইথানলীয়}} \underset{\text{প্রোপিন}}{CH_3CH=CH_2} + KBr + H_2O$$

৩। ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডের ডিহ্যালোজিনেশন দ্বারা ঃ ভিসিনাল ডাইহ্যালাইডকে Zn-চূর্ণের সাথে উত্তপ্ত করলে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়। যেমন–

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড}}{R-\overset{X}{\overset{|}{C}}H-\overset{X}{\overset{|}{C}}H_2} \xrightarrow[Zn-CH_3OH]{\Delta} \underset{\text{অ্যালকিন}}{R-CH=CH_2} + ZnX_2$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{1,2-ডাইব্রোমোইথেন}}{H_2\overset{Br}{\overset{|}{C}}-\overset{Br}{\overset{|}{C}}H_2} \xrightarrow[Zn-CH_3OH]{\Delta} \underset{\text{ইথিলিন}}{H_2C=CH_2} + ZnBr_2$$

কোনো যৌগের অণুতে পাশাপাশি দুটি কার্বন পরমাণুর সাথে একটি করে হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত থাকলে তাকে **ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড** বলে।

অ্যালকিনের ভৌত ধর্ম (Physical Properties of Alkenes) : কম আণবিক ভরের অ্যালকিনগুলো অর্থাৎ ইথিন বা ইথিলিন ($CH_2=CH_2$), প্রোপিলিন ($CH_3-CH=CH_2$), বিউটিলিন ($CH_3-CH_2-CH=CH_2$) ও পেন্টিলিন $CH_3-CH_2-CH_2-CH=CH_2$ এই চারটি সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে। 5 হতে 18 কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকিনসমূহ (C_5-C_{18}) তরল এবং কার্বন সংখ্যা 18 হতে পরবর্তী অ্যালকিনসমূহ কঠিন। অ্যালকিনগুলোর মধ্যে শুধু ইথিন সামান্য গন্ধবিশিষ্ট, তাছাড়া সকল অ্যালকিন গন্ধহীন। অ্যালকিনসমূহ পানিতে সামান্য দ্রবণীয় কিন্তু ইথার, অ্যালকোহল প্রভৃতি জৈব দ্রাবকে পূর্ণমাত্রায় দ্রবণীয়। অ্যালকিনসমূহের আণবিক ভর ও কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ভৌত অবস্থা গ্যাস→তরল→কঠিন, এই ক্রম অনুসারে হয়ে থাকে। আবার আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যালকিনসমূহের গলনাংক, স্ফুটনাংক, আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় ।

অ্যালকিনের রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties of Alkenes) : আমরা জানি যে, অ্যালকিন অণুতে কার্বন কার্বন দ্বি-বন্ধন উপস্থিত এবং এদের একটি $\sigma-$বন্ধন এবং অপরটি π বন্ধন। অ্যালকিনের $C=C$ বন্ধনে π বন্ধন থাকার কারণে এটি $C-C$ ও $C-H$ বন্ধন হতে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল। তাই অ্যালকিনের অধিকাংশ রাসায়নিক বিক্রিয়া $C=C$ বন্ধনের ওপর যথেষ্ট নির্ভরশীল। অ্যালকিনসমূহ নিম্নরূপ তিন ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে :

১। সংযোজন বিক্রিয়া (Addition reaction)

২। জারণ বিক্রিয়া (Oxidation reaction)

৩। পলিমারকরণ বিক্রিয়া (Polymerisation reaction)।

১। সংযোজন বিক্রিয়া (Addition reaction) : অ্যালকিন প্রধানত বৈশিষ্ট্যগতভাবে ইলেকট্রনাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দেখায়।

(ক) হাইড্রোজেন সংযোজন বা হাইড্রোজিনেশন : 200-300°C তাপমাত্রায় প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম অথবা নিকেল প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যালকিনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে যুত যৌগ (অর্থাৎ সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন) গঠন করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CH_2} + H_2 \xrightarrow[\text{বা Ni, 200-300°C}]{\text{Pt বা Pd বা র‍্যানি নিকেল (সাধারণ তাপমাত্রা)}} \underset{\text{অ্যালকেন}}{RCH_2CH_3}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{প্রোপিন}}{CH_2CH=CH_2} + H_2 \xrightarrow[\text{বা Ni, 200-300°C}]{\text{Pt বা Pd বা র‍্যানি নিকেল (সাধারণ তাপমাত্রা)}} \underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3CH_2CH_3}$$

(খ) হ্যালোজেন সংযোজন বা হ্যালোজিনেশন : নিষ্ক্রিয় দ্রাবক যেমন কার্বন টেট্রাক্লোইডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন অতি সহজে হ্যালোজেনের সাথে যুক্ত হয়ে অ্যালকাইল হ্যালাইড গঠন করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CH_2} + X_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{ডাইহ্যালাইড}}{R-\overset{X}{\overset{|}{C}}H-\overset{X}{\overset{|}{C}}H_2}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{প্রোপিন}}{CH_3CH=CH_2} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-ডাইব্রোমোপ্রোপেন}}{CH_3-\overset{Br}{\overset{|}{C}}H-\overset{Br}{\overset{|}{C}}H_2}$$

এই বিক্রিয়ায় হ্যালোজেনসমূহের ক্রিয়াশীলতার ক্রম **ক্লোরিন > ফ্লোরিন > ব্রোমিন > আয়োডিন**। সাধারণত আয়োডিন অ্যালকিনের সাথে খুব একটা বিক্রিয়া করে না। উপরিউক্ত বিক্রিয়াটির দ্বারা জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয়।

গ) হ্যালোজেন এ্যাসিড (HX) সংযোজন : হ্যালোজেন এ্যাসিড যেমন HCl, HBr , HI এর সাথে অ্যালকিন বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি দুই ধরনের অ্যালকিনের (প্রতিসম এবং অপ্রতিসম অ্যালকিন) বেলায় প্রযোজ্য।

যদি প্রতিসম অ্যালকিন হয়, তবে অ্যালকিনটি হ্যালোজেন অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে একটি মাত্র অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে। এ নিয়মকে **মার্কভনিকভ নিয়ম** বলে। যেমন–

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকিন (প্রতিসম অ্যালকিন}}{RCH=CHR} + HX \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{RCH_2\overset{X}{\overset{|}{C}}HR}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথিলিন}}{H_2C=CH_2} + HBr \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল ব্রোমাইড}}{CH_3CH_2-Br}$$

আর যদি অপ্রতিসম অ্যালকিন হয়, তবে অ্যালকিনটি হ্যালো অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়া করে একাধিক অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{2- ব্রোমোপ্রোপেন}}{CH_3\overset{Br}{\overset{|}{C}}HCH_3} \xleftarrow{HBr} \underset{\substack{\text{প্রোপিন}\\ \text{(অপ্রতিসম অ্যালকিন)}}}{CH_3CH=CH_2} \xrightarrow{HBr} \underset{\text{1- ব্রোমোপ্রোপেন}}{CH_3CH_2CH_2-Br}$$

(ঘ) H_2SO_4 সংযোজন : অ্যালকিনসমূহ শীতল ও গাঢ় H_2SO_4 দ্বারা শোষিত হয়ে অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট নামক অজৈব এস্টার যৌগ উৎপন্ন করে যা পরবর্তীতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে অ্যালকোহলে পরিণত হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CHR} + \underset{(H_2SO_4)}{H-OSO_3H} \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট}}{RCH_2\overset{OSO_3H}{\overset{|}{C}}HR} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{অ্যালকোহল}}{RCH_2\overset{OH}{\overset{|}{C}}HR}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\substack{\text{ইথিলিন}\\ \text{(প্রতিসম অ্যালকিন)}}}{H_2C=CH_2} + \underset{(H_2SO_4)}{H-OSO_3H} \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট}}{CH_3\overset{OSO_3H}{\overset{|}{C}}H_2-OSO_3H} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{CH_3CH_2OH}$$

আগের উদাহরণটিতে হাইড্রোজেন সালফেট রিপিট হয়েছে। যাচাই করা দরকার...

২। জারণ বিক্রিয়া (Oxidation reaction)

শীতল ও নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় $KMnO_4$-এর লঘু দ্রবণ একটি মৃদু জারক।

$$KMnO_4 + KOH \longrightarrow K_2MnO_4 + H_2O + [O]$$

অ্যালকিনগুলো বেশ সক্রিয় তাই মৃদু জারক (ক্ষারীয় $KMnO_4$) দ্বারা অতিসহজেই জারিত হয়ে বর্ণহীন ডাইহাইড্রিক অ্যালকোহল সৃষ্টি করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকিন}}{RCH=CHR} + H_2O + [O] \xrightarrow{\text{শীতল ও লঘু ক্ষারীয় } KMnO_4} \underset{\text{ভিসিনাল ডাইঅল}}{RCH(OH)-CH(OH)R}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথিলিন}}{H_2C=CH_2} + H_2O + [O] \xrightarrow{\text{শীতল ও লঘু ক্ষারীয় } KMnO_4} \underset{\text{ইথিলিন গ্লাইকল}}{H_2C(OH)-CH_2(OH)}$$

এই বিক্রিয়াটি দ্বারাও জৈব যৌগের অসম্পৃক্ততা পরীক্ষা করা হয়। এটি বেয়ার টেস্ট হিসেবে পরিচিত।

(গ) ওজোনের সাথে বিক্রিয়া বা ওজোনীকরণ (Ozonolysis) : অ্যালকিনের সঙ্গে ওজোনের বিক্রিয়ায় ওজোনাইড গঠন, ওজোনাইডের বিয়োজন এবং তার ফলে উৎপন্ন অ্যালডিহাইড বা কিটোনের বা উভয়ের সনাক্তকরণ- এ সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াকে **ওজোনোলাইসিস বা ওজোনীকরণ** বলে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

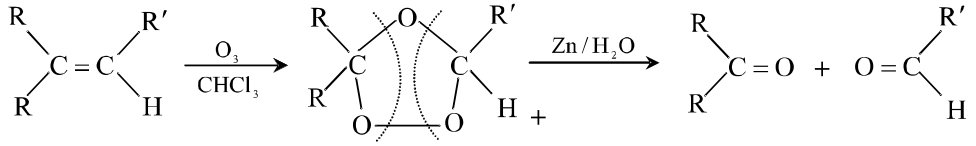

অ্যালকিন ওজোনাইড কার্বোনিল যৌগ

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

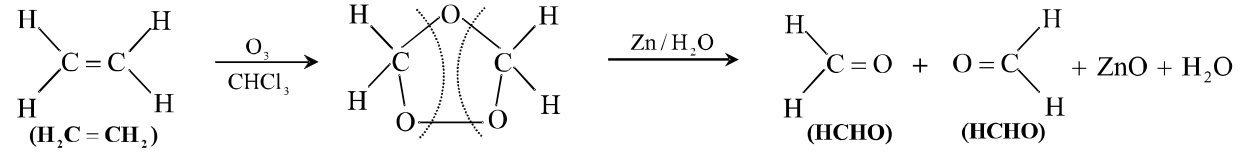

ইথিলিন ওজোনাইড ফরমালডিহাইড

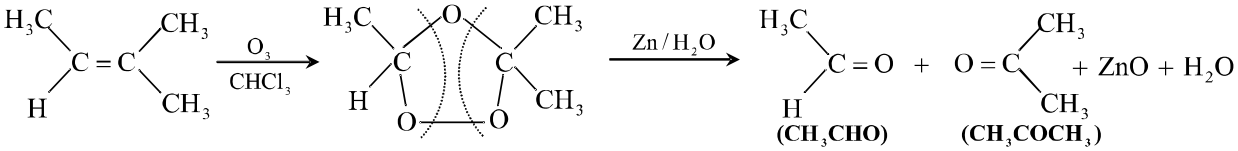

2-মিথাইলবিউটিন-2 ওজোনাইড অ্যাসিটালডিহাইড অ্যাসিটোন

৩। পলিমারকরণ বিক্রিয়া (Polymerization reaction) : উপযুক্ত প্রভাবকের উপস্থিতিতে (যথাযথ আলো, তাপ ও অধিক চাপে) অ্যালকিনের বহুসংখ্যক অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহদাকার বা জটিল অণু গঠন করে। যেমন ইথিনের বহুসংখ্যক অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিথিন উৎপন্ন করে। যেমন–

$$n(H_2C=CH_2) \quad + \quad O_2 \quad \xrightarrow{200^\circ C,\ 2000 atm} \quad [-CH_2-CH_2-]_n$$

পলিথিনকে ইথিলিনের **পলিমার** বলে।

অ্যালকাইন (Alkynes)

যে সকল অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনে অন্তত পাশাপাশি দুটি কার্বন পরমাণু পরস্পর কার্বন কার্বন ত্রি-বন্ধন $(C\equiv C)$ দ্বারা (দুটি π বন্ধন এবং একটি σ বন্ধন) যুক্ত, তাদেরকে **অ্যালকাইন (Alkyne) বলে**। অ্যালকাইনের সাধারণ সংকেত $\mathbf{C_nH_{2n-2}}$। অ্যালকাইনসমূহ যে ত্রি-বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে তাকে **এসিটিলীনিক বন্ধন (Acetylenic bond) বলে**।

যেমন- ইথাইন বা এসিটিলিন $(CH\equiv CH)$, প্রোপাইন $(CH_3-C\equiv CH)$ ইত্যাদি। যে সকল অ্যালকাইনের এসিটিলীনিক বন্ধনটি কার্বন-কার্বন শিকলের এক প্রান্তে অবস্থান করে, তাদের **প্রান্তিক অ্যালকাইন বলে**। যেমন- বিউটাইন-1 $(CH_3-CH_2-C\equiv CH)$, পেন্টাইন-1 $(CH_3-CH_2-CH_2-C\equiv CH)$ প্রভৃতি।

১। ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে

কক্ষ তাপমাত্রায় ক্যালসিয়াম কার্বাইডের (CaC_2) সাথে পানির বিক্রিয়া দ্বারা ইথাইন উৎপন্ন করা হয়।

$$Ca\langle \begin{matrix} C \\ ||| \\ C \end{matrix} + H_2O \longrightarrow H-C\equiv C-H + Ca(OH)_2$$

২। প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে

প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে ইথাইন উৎপন্ন করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হচ্ছে মিথেন। নিয়ন্ত্রিত উচ্চ তাপমাত্রায় মিথেন গ্যাসকে আংশিক জারিত করলে ইথাইন পাওয়া যায়।

$$6CH_4 + O_2 \xrightarrow{1500^oC} 2CH \equiv CH + 2CO_2 + 10H_2$$

এই বিক্রিয়ায় বিস্ফোরণের সাথে কার্বন এবং হাইড্রোজেন উৎপন্ন হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। তাই উৎপন্ন গ্যাসকে উচ্চ চাপে প্রোপানোনের মধ্যে সংগ্রহ করা হয়।

৩। ভিসিনাল ডাইহ্যালোঅ্যালকেন হতে : ভিসিনাল (সন্নিহিত) ডাইহ্যালোঅ্যালকেনের সঙ্গে অথবা জেমিনাল ডাইহ্যালাইডের সাথে অ্যালকোহলীয় KOH যোগ করে উত্তপ্ত করলে অ্যালকাইন উৎপন্ন হয়।

$$R-\underset{X}{\overset{H}{C}}-\underset{H}{\overset{X}{C}}-R + 2KOH(alc) \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইন}}{R-C\equiv C-R} + 2H_2O + 2KX$$

উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{2,2–ডাইক্লোরো বিউটেন (ভিসিনাল)}}{CH_3-\underset{Cl}{\overset{H}{C}}-\underset{H}{\overset{Cl}{C}}-CH_3} + 2KOH(alc) \longrightarrow \underset{\text{বিউটাইন-2}}{CH_3-C\equiv C-CH_3} + 2KCl + 2H_2O$$

যখন পাশাপাশি দু'টি কার্বনে হ্যালোজেন পরমাণুদ্বয় যুক্ত থাকে তখন তাকে **ভিসিনাল ডাইহ্যালাইড** বলে।

অ্যালকাইনের ভৌত ধর্ম (Physical Properties of Alkyne) : স্বল্প আণবিক ওজনবিশিষ্ট অ্যালকাইনগুলো যেমন- ইথাইন ($CH\equiv CH$), প্রোপাইন ($CH_3-C\equiv CH$) এবং বিউটাইন-2 ($CH_3-C\equiv C-CH_3$) এই তিনটি কক্ষ তাপমাত্রায় গ্যাসীয়। 4 হতে 11 কার্বন বিশিষ্ট অ্যালকাইনসমূহ (C_4-C_{11}) তরল এবং 12 হতে পরবর্তী অ্যালকাইনসমূহ কঠিন। অ্যালকাইনসমূহের সকলেই বর্ণহীন। শুধুমাত্র ইথাইন দুর্গন্ধবিশিষ্ট। তাছাড়া সকল অ্যালকাইন গন্ধহীন। অ্যালকাইনসমূহ পানিতে সামান্য দ্রাব্য কিন্তু জৈব দ্রাবকে অত্যন্ত দ্রবণীয়।

উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধ ইথাইন মিষ্টি গন্ধবিশিষ্ট এবং তরল ইথাইন বিস্ফোরক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। অ্যালকিনের মতো অ্যালকাইনসমূহের আণবিক ওজন ও কার্বন সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের ভৌত অবস্থা গ্যাস $\rightarrow$ তরল $\rightarrow$ কঠিন, এই ক্রমানুসারে হয়ে থাকে। আবার আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে আলকাইনসমূহের গলনাংক, স্ফুটনাংক, ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

অ্যালকাইনের রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties of Alkyne) : অ্যালকাইন অণুতে কার্বন কার্বন ত্রি-বন্ধন বিদ্যমান এবং এদের দুটি π বন্ধন এবং একটি σ বন্ধন। এরা অ্যালকিনের চেয়েও বেশি শক্তিশালী। অ্যালকাইনে চারটি π ইলেকট্রন অর্থাৎ দুটি π বন্ধন থাকার কারণে অতি সহজেই চার-চারটি একযোজী মূলক বা পরমাণুর সাথে যুক্ত হয়ে শক্তিশালী সম্পৃক্ত যৌগ সৃষ্টি করে।

$$\underset{\text{অসম্পৃক্ত}}{[-C\equiv C-]} \longrightarrow \underset{\text{অসম্পৃক্ত}}{[-\underset{|}{C}=\underset{|}{C}-]} \longrightarrow \underset{\text{সম্পৃক্ত}}{[-\underset{|}{\overset{|}{C}}-\underset{|}{\overset{|}{C}}-]}$$

সুতরাং অ্যালকাইনের প্রায় রাসায়নিক বিক্রিয়া $C \equiv C$ বন্ধনীর উপর নির্ভরশীল। অ্যালকাইনসমূহ নিম্নরূপ পাঁচ ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। যেমন–

১। যুত বা সংযোজন বিক্রিয়া (Addition reaction)

২। জারণ বিক্রিয়া (Oxidation reaction)

৩। দহন বিক্রিয়া (Combustion reaction)

৪। প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Substitution reaction)

৫। পলিমারকরণ বিক্রিয়া (Polymerization)

১। যুত সংযোজন বিক্রিয়া : অ্যালকিনের মতো অ্যালকাইনের বৈশিষ্ট্যমূলক বিক্রিয়া হলো সংযোজন বিক্রিয়া। কেননা অ্যালকাইনগুলো অসংখ্য বিকারকের সাথে সংযোজন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। যেমন–

(ক) হাইড্রোজেন সংযোজন বা হাইড্রোজিনেশন : উপযুক্ত চাপ এবং তাপমাত্রায়, Ni বা Pt বা Pd প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যালকাইনের সাথে হাইড্রোজেন দুইধাপে বিক্রিয়া করে। প্রথম ধাপে এক অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যালকিন এবং পরবর্তী ধাপে আরেক অণু হাইড্রোজেন যুক্ত হয়ে অ্যালকেন উৎপন্ন হয়।

উদাহরণ হলো :

$$\underset{\text{প্রোপাইন}}{CH \equiv C - CH_3} + H_2 \xrightarrow[200\text{–}300^0C]{Ni} \underset{\text{প্রোপেন}}{CH_3 - CH_3 - CH_3}$$

(খ) হ্যালোজেন সংযোজন বা হ্যালোজিনেশন : নিষ্ক্রিয় দ্রাবকে অ্যালকাইনের সাথে হ্যালোজেন বিক্রিয়া করে প্রথমে 1,2–ডাইহ্যালো অ্যালকিন এবং পরে 1,1,2,2–টেট্রাহ্যালো অ্যালকেন উৎপন্ন করে। যেমন

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকাইন}}{R - C \equiv CH} + X_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-ডাইহ্যালো অ্যালকিন}}{R - CX = CHX} + X_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,1,2,2-টেট্রাহ্যালোঅ্যালকেন}}{R - CX_2 - CX_2 - H}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{অ্যাসিটিলিন}}{CH \equiv CH} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-ডাইক্লোরোইথিন}}{HC(Br) = CH(Br)} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,1,2,2-টেট্রাক্লোরোইথেন (ওয়েস্টন)}}{H - CBr_2 - CBr_2 - H}$$

$$\underset{\text{প্রোপাইন}}{CH_3C \equiv CH} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,2-ইব্রোমোপ্রোপিন}}{CH_3C(Br) = CH(Br)} + Br_2 \xrightarrow{CCl_4} \underset{\text{1,1,2,2-টেট্রাব্রোমোপ্রোপেন}}{CH_3CBr_2 - CBr_2 - H}$$

(গ) হ্যালোজেন এসিড সংযোজন : মারকিউরিক লবণের উপস্থিতিতে হ্যালোজেন এসিড (HX) অ্যালকাইনের সাথে দুধাপে বিক্রিয়া করে। প্রথম ধাপে অ্যালকিনাইল হ্যালাইড ও পরে অ্যালকাইল হ্যালাইড উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়াটি মার্কনিকভ সূত্রানুযায়ী সংগঠিত হয়ে থাকে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$R-C\equiv CH + HX \longrightarrow R-\overset{X}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{C}}-H \xrightarrow{HX} R-\underset{\underset{X}{|}}{\overset{\overset{X}{|}}{C}}-CH_3$$

অ্যালকাইন — অ্যালকিনাইল হ্যালাইড — জেমিনাল ডাইহ্যালোঅ্যালকেন

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$CH_3C\equiv CH + HBr \longrightarrow CH_3\overset{Br}{\overset{|}{C}}=\overset{H}{\overset{|}{C}}-H \xrightarrow{HBr} CH_3-\underset{\underset{Br}{|}}{\overset{\overset{Br}{|}}{C}}-CH_3$$

প্রোপাইন — 2-ব্রোমোপ্রোপিন — 2,2-ডাইব্রোমোপ্রোপেন

(ঙ) পানি সংযোজন বা হাইড্রেশন : $60°C$ তাপমাত্রায় মারকিউরিক লবণ যেমন–$1\%\ HgSO_4$ ও $20\%\ H_2SO_4$ এর উপস্থিতিতে অ্যালকাইন পানির সাথে বিক্রিয়া করে প্রথমে ক্ষণস্থায়ী ইনল এবং পরবর্তীতে অ্যালডিহাইড বা কিটোন উৎপন্ন করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$R-C\equiv C-R' + H_2O \xrightarrow[20\%\ H_2SO_4]{1\%\ HgSO_4} RCH=\underset{\underset{OH}{|}}{C}R' \rightleftharpoons RCH_2-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-R'$$

অ্যালকাইন — ইনল ফর্ম — কিটোন

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$H-C\equiv C-H + H_2O \xrightarrow[20\%\ H_2SO_4]{1\%\ HgSO_4} CH_2=\underset{\underset{OH}{|}}{C}H \rightleftharpoons CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-H$$

অ্যাসিটিলিন — ভিনাইল অ্যালকোহল — অ্যাসিটালডিহাইড

$$CH_3-C\equiv CH + H_2O \xrightarrow[20\%\ H_2SO_4]{1\%\ HgSO_4} CH_3\underset{\underset{OH}{|}}{C}=CH_2 \rightleftharpoons CH_3-\underset{\underset{O}{\|}}{C}-CH_3$$

প্রোপাইন — 1-প্রোপিন-2-অল — অ্যাসিটোন

(চ) হাইড্রোজেন সায়ানাইড সংযোজন : $Ba(CN)_2$ এর উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন সায়ানাইড অ্যালকাইনের সাথে বিক্রিয়া করে সায়ানাইড যৌগ উৎপন্ন করে। যেমন :

$$HC\equiv CH + HCN \xrightarrow{CuCl_2-HCl} CH_2=CH-CN$$

অ্যাসিটিলিন — ভিনাইল অ্যাসিটিলিন

অ্যালকাইনের সনাক্তকারী বিক্রিয়া : যেহেতু অ্যালকাইন একটি অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। সুতরাং ব্রোমিন দ্রবণ পরীক্ষা ও বেয়ার পরীক্ষার সাহায্যে অসম্পৃক্তার পরীক্ষা করার পর নিচের পরীক্ষাগুলো করলে অ্যালকাইনের উপস্থিতি নিশ্চিত করা যায়।

(১) ইথাইন ও অ্যালকাইন-1 এর সঙ্গে ধাতব সোডিয়ামের বিক্রিয়ায় হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয়। **(ইথাইনের অম্লধর্মের পরীক্ষা)**

$$H-C\equiv C-H + Na \longrightarrow Na-C\equiv C-Na + H_2$$

সোডিয়াম ইথাইনাইড

(২) ইথাইন ও অ্যালকাইন-1 এর সাথে অ্যামোনিয়া যুক্ত কিউপ্রাস ক্লোরাইড বা সিলভার নাইট্রেটের বিক্রিয়া করে যথাক্রমে কপার ইথাইনাইড এর লাল অধঃক্ষেপ এবং সিলভার ইথাইনাইড এর সাদা অধঃক্ষেপ উৎপন্ন হয়।

$$H-C\equiv C-H + 2Cu\ (NH_3)_2Cl \longrightarrow Cu-C\equiv C-Cu + 2NH_4Cl + 2NH_3$$

কপার ইথাইনাইড (লাল অধঃক্ষেপ)

$$H-C\equiv C-H + 2Ag(NH_3)_2\ NO_3 \longrightarrow Ag-C\equiv C-Ag + 2NH_4NO_3 + 2NH_3$$

সিলভার ইথাইনাইড (সাদা অধঃক্ষেপ)

১০.৩ পেট্রোলিয়াম ও এর উপাদানসমূহ এবং এদের ব্যবহার

বহু লক্ষ বছর ধরে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের দ্বারা একটি জৈব পদার্থের মিশ্রণ 'পেট্রোলিয়াম" উৎপন্ন হয়েছে যা পৃথিবী পৃষ্ঠের নিচে শিলা স্তরের মধ্যে অজ্ঞাত পরিমাণে মজুদ আছে। পেট্রোলিয়াম আবিষ্কারের পর তা উত্তোলন করে মানুষ তার হাজার প্রয়োজনে বিভিন্ন জ্বালানিরূপে পেট্রোলিয়ামকে ব্যবহার করে চলেছে। যেহেতু এটি হাজার রকমের যৌগ নিয়ে গঠিত সেহেতু এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে যে, আমাদের পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে এ সকল যৌগ ব্যবহৃত হয় এবং তা প্রদানে পেট্রোলিয়াম সক্ষম। বিভিন্ন প্রকারের প্রক্রিয়াকরণ পদ্ধতি অনুসরণ করে হরেক রকমের ফুয়েল উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এ পদ্ধতিকে **রিফাইনিং (refining)** বলে। পেট্রোলিয়ামকে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে নানা ধরনের রাসায়নিক পদার্থে পরিণত করা যায়। এদের **পেট্রোকেমিক্যাল** বলে। এখানে অবিশুদ্ধ পেট্রোলিয়াম হতে কীরূপে ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি পাওয়া যায় তা আলোচিত হলো।

(ক) পেট্রোলিয়ামের সংজ্ঞা : ল্যাটিন ভাষায় পেট্রোলিয়ামের অর্থ **"পাথুরে তৈল"** (ল্যাটিন Petra অর্থ "পাথুরে" এবং Oleum অর্থ তৈল)। পেট্রোলিয়াম ভূ-পৃষ্ঠের গভীরে প্রাকৃতিক অবস্থায় অবস্থান করে। এটি দাহ্য এবং অতি সান্দ্র তরল। এতে প্যারাফিন, সাইক্লোঅ্যালকেন, অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন, সালফার যৌগ যেমন– হাইড্রোজেন সালফাইড নাইট্রোজেন যৌগ যেমন– পিরিডিন, কুইনোলিন প্রভৃতি থাকে।

তবে অনেকে ধারণা করেন পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি উদ্ভিদজগত থেকে, আবার কেউ কেউ মনে করে পেট্রোলিয়ামের উৎপত্তি প্রাণি ও উদ্ভিদজগত উভয়েই। ভূ-পৃষ্ঠে প্রবলচাপে এবং ভূ-পৃষ্ঠে প্রচণ্ড উত্তাপের সংস্পর্শে এবং বিভিন্ন জীবাণু ক্রিয়ায় এরা এক প্রকার আঠালো তেলে পরিণত হয়ে মাটির নিচে সঞ্চিত থাকে। এই আঠালো তেলকেই বলা হয় **পেট্রোলিয়াম**।

(খ) পেট্রোলিয়ামের উৎস : মাটির তলায় পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল সৃষ্টির সম্ভাব্য তত্ত্ব হলো- সামুদ্রিক জৈব পদার্থের বায়ুর অনুপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়াজনিত বিয়োজন। খনিজ তেলের সঙ্গে সর্বত্র লবণ পানি পাওয়ার জন্য সামুদ্রিক জীব মূলত তিমি এবং সীল মাছের তেল এবং চর্বি পেট্রোলিয়ামের মূল উৎস হিসাবে পরিগণিত। অপর তত্ত্বানুযায়ী পেট্রোলিয়ামকে যে-কোন জৈব পদার্থের **অনুঘটকীয় বিয়োজন** (catalytic decomposition) উদ্ভূত পদার্থ বলা হয়।

(গ) পেট্রোলিয়ামের সংযুক্তি : পেট্রোলিয়াম স্বল্প পরিমাণ নাইট্রোজেন, অক্সিজেন এবং সালফারবিশিষ্ট রৈখিক বা শাখায়িত বা বৃত্তাকার প্যারাফিন এবং অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের একটি জটিল মিশ্রণ। পেট্রোলিয়ামের বিশ্লেষণের ফলাফল নিম্নরূপ-

$$\begin{aligned} C &= 83-87\%; \\ H &= 11-14\%; \\ O, N, S, &= 0-4\% \end{aligned}$$

বৃত্তাকার প্যারাফিনকে পেট্রোলিয়াম শিল্পে ন্যাফথালিন বলে। বস্তুত পেট্রোলিয়ামকে হাজার হাজার জৈব যৌগের উৎস বলা যেতে পারে। সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম থেকে ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়ায় এমনকি খাদ্যবস্তু প্রোটিন সংশ্লেষণের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে পেট্রোলিয়াম দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যথা :

১। প্রাকৃতিক গ্যাস এবং

২। অপরিশুদ্ধ তেল।

এ অপরিশুদ্ধ তেলকে ক্রমবর্ধমান স্ফুটনাঙ্ক অনুযায়ী আংশিক (Fractional distillation) পাতন এবং পরিশোধন সাপেক্ষে বিভিন্ন পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ পাওয়া যায়।

পেট্রোলিয়ামের উত্তোলন ও বিশোধন (Purification of petroleum)

১। পেট্রোলিয়ামের উত্তোলন : মাটির তলায় সঞ্চিত তেলের নিম্নে বালু স্তর পর্যন্ত গহবর খনন করে একটি লৌহ নল চালনা করা হয়। এ নলের মাধ্যমে নাইট্রোগ্লিসারিন গুলি ছুঁড়ে তল দেশে গর্ত খুঁড়ে যন্ত্রচালিত পাম্পের সাহায্যে তেল মাটির উপরিভাগে উত্তোলিত হয়। অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম বর্ণহীন থেকে ঘন কালো বর্ণের হতে পারে। এর সান্দ্রতাও বিভিন্ন হতে পারে।

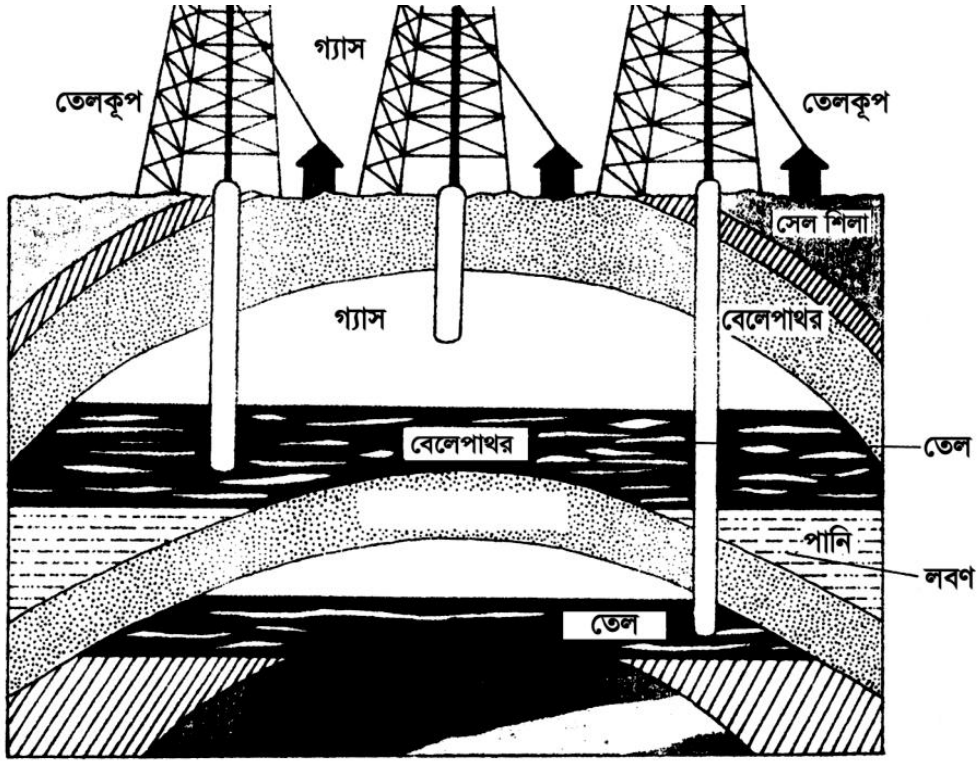

চিত্র ১০.১ : ভূ-গর্ভে খনিজ তৈল ও গ্যাসের অবস্থান|

২। পেট্রোলিয়ামের বিশোধন : প্রথমে বালি, মাটি ও পানিসমেত অপরিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামকে স্টিম কুন্ডলীবিশিষ্ট নিম্নাংশ কোনাকার লৌহপাত্রে প্রবেশ করিয়ে উত্তপ্ত করা হয়। ফলে ইমালসন ভেঙে দু'টি তলে বিভক্ত হয় এবং গ্যাস একটি পাইপ লাইনের মাধ্যমে নির্গত হয়। গ্যাসের একটি অংশ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং অপর অংশ তরলায়িত করা হয়। দু'টি তলের উপরিতল থেকে তেল পাওয়া যায় যা আংশিক পাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যবহার যোগ্য পণ্য উৎপাদন করে। প্রয়োজনে ভাঙনসহ পাতন প্রক্রিয়া সংঘটিত করা হয়। ফলে পেট্রোল উৎপন্ন হয়। নিম্ন স্ফুটনাঙ্কবিশিষ্ট হাইড্রোকার্বনগুলোকে বাদ দিলে অপরিশুদ্ধ তেলের পাতন উদ্ভূত মূল চারটি অংশ পাওয়া যায়।

১। পেট্রোল (গ্যাসোলিন);

২। কেরোসিন (প্যারাফিন তেল);

৩। গ্যাস অয়েল (ভারী তেল);

৪। পিচ্ছিলকারী তেল।

অবশেষকে আংশিক পাতন করলে বায়ু শূন্য পাতন করলে হালকা, মধ্যম ও ভারী পিচ্ছিলকারী তেল, প্যারাফিন মোম এবং অ্যাসফাল্ট বিটুমেন পাওয়া যায়। চারটি মূল অংশকে পুনরায় অংশিক পাতন প্রক্রিয়ায় প্রয়োজনে বিভক্ত করা হয় এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী অংশায়িত করা হয়। যেমন–

সারণি ১০.৩ : পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনের ফলে প্রাপ্ত ব্যবহার উপযোগী বিভিন্ন পদার্থসমূহ।

পাতিত অংশের নাম	পাতন তাপমাত্রা স্ফুটনাংক (0° C)	C-পরমাণুর সংখ্যা	প্রয়োগ
১। প্রাকৃতিক গ্যাস	20° C	$C_4 - C_5$	জ্বালানি গ্যাস হিসাবে
২। গ্যাসোলিন বা পেট্রোল	$30 - 200^\circ$ C	$C_5 - C_{11}$	দ্রাবক
ক) পেট্রোলিয়াম ইথার	$30 - 70^\circ C$	$C_5 - C_6$	দ্রাবক হিসাবে এবং গরম শোষক ধৌত করার জন্য।
খ) বেনজাইন	$70 - 90^\circ$ C	$C_6 - C_7$	দ্রাবক হিসবে
গ) লিগ্রোইন	$80 - 120^\circ$ C	$C_6 - C_8$	
৩। কেরোসিন	$200 - 300^\circ$ C	$C_{11} - C_{16}$	জ্বালানি হিসাবে (স্টোভ এবং জেট ইঞ্জিনে)
৪। ডিজেল	$300 - 400^\circ$ C	$C_{13} - C_{18}$	জ্বালানি হিসাবে
৫। অবশেষ তরল	400° C এর উপরে	$>C_{16}$	পিচ্ছিলকারী পদার্থ হিসেবে
ক) লুব্রিকেটিং তেল	ঐ	$C_{16} - C_{20}$	প্রসাধন প্রস্তুতিতে
খ) ভ্যাসেলিন	ঐ	$C_{18} - C_{22}$	মোমবাতি তৈরিতে
গ) প্যারাফিন তেল	ঐ	$C_{20} - C_{30}$	তেলজাত পদার্থের (নিটিং,কাটিং অয়েল) প্রস্তুতিতে ভিত্তি অয়েল হিসেবে
৬। অবশেষ : বিটুমেন	400° C এর উপরে	$C_{30} - C_{40}$	রাস্তা তৈরিতে এবং রঞ্জক পদার্থ তৈরিতে

প্রাকৃতিক গ্যাস ও এর যথাযথ ব্যবহার (Natural gas and its uses)

জ্বালানি (Fuels) : সভ্যতার প্রথম সোপান হলো মানুষের আগুন জ্বালতে শেখা। এ আগুন মানুষকে প্রথমে দেয় অন্ধকারে আলো– সেই আলো হয়ে ওঠে জ্ঞানের আলো। তাতেই মানুষের পথচলা, সভ্যতার অগ্রগতি। এ আগুন হলো শক্তির প্রতীক এবং উৎস হলো জ্বালানি। আজ তৃতীয় সহস্রাব্দের সূচনায় জনবিস্ফোরণের যুগে মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে চাই বিপুল শক্তি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি হিমসিম খাচ্ছে এই শক্তির সংস্থান করতে । তার সঙ্গে আছে পরিবেশ দূষণের সমস্যা।

তাপ শক্তি পাওয়া যায় এমন যে কোনো ধরনের উৎসকে জ্বালানি হিসেবে ধরা যায়। জ্বালানি হলো এক ধরনের রাসায়নিক যৌগ যা এমন ধরনের শক্তি উৎপন্ন করে এই শক্তি ব্যবহার করে তাপ ক্ষমতো অর্জন করা যায়। যে সকল রাসায়নিক পদার্থ কর্তৃক উৎপন্ন শক্তি যা উৎপন্ন করে।

যে সকল পদার্থ থেকে নিয়ন্ত্রিত রাসায়নিক বিক্রিয়া বা নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া দ্বারা প্রচুর পরিমাণে তাপশক্তি উৎপাদিত হয় তাদের **জ্বালানি (Fuels)** বলে। তাপশক্তির উৎস হলো জ্বালানি।

দহনকালে উৎপন্ন লেড অক্সাইড ইঞ্জিনের ক্ষতি করে- তবে ইথিলিন ব্রোমাইড মেশানো থাকলে লেড অক্সাইড উদ্বায়ী লেড ব্রোমাইডে পরিণত হয় এবং নির্গমন পথ দিয়ে নির্গত গ্যাসের সঙ্গে বেরিয়ে যায় বলে ইঞ্জিনের ক্ষতির পরিমাণ কমে যায়।

প্রাকৃতিক গ্যাস (Natural gas) : ভূপৃষ্ঠ থেকে নিচে বিভিন্ন গভীরতায় শিলা স্তরের মধ্যে সঞ্চিত খনিজ পেট্রোলিয়াম তেলের উপরিভাগে অথবা পৃথকভাবে ভূগর্ভে উচ্চ চাপে বিভিন্ন গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বনের যে মিশ্রণ পাওয়া যায় তাকে **প্রাকৃতিক গ্যাস** বলে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বহু দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ দহনশীল প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে পরিচিত। প্রাকৃতিক গ্যাস হলো কম আণবিক ভরবিশিষ্ট সহজদাহ্য হাইড্রোকার্বন গ্যাস মিশ্রণ যা পেট্রোলিয়ামের সাথে বা পৃথকভাবে ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থান করে। ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে অবস্থানরত যে প্রাকৃতিক গ্যাসে শুধু মিথেন এবং ইথেন হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের **শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাস** বলে।

যে প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন, ইথেন ছাড়াও প্রোপেন, বিউটেন, পেন্টেন, হেক্সেন হাইড্রোকার্বন থাকে তাকে **সিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসও বলে**। সিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন 85%, ইথেন 10%, প্রোপেন 3%, বিউটেন 1% থাকে। এছাড়াও প্রাকৃতিক গ্যাসে আইসো-বিউটেন, আইসো পেন্টেন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

প্রাকৃতিক গ্যাসের সাধারণ উপাদানসমূহ : আমরা জানি, প্রাকৃতিক গ্যাস নিম্নরূপ দুই ধরনের হতে পারে- শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাস ও সিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস। নিচে উভয় ধরনের প্রাকৃতিক গ্যাসের সাধারণ উপাদানসমূহ দেওয়া হলো :

শুষ্ক প্রাকৃতিক গ্যাসের সাধারণ উপাদানসমূহ	
যৌগের নাম ও সংকেত	**শতকরা পরিমাণ**
১। মিথেন (CH_4)	$96\% - 99\%$
২। ইথেন $(CH_3 - CH_3)$	$0.1 - 2.7\%$
৩। প্রোপেন $(CH_3 - CH_2 - CH_3)$	$0.01 - 0.5\%$
৪। বিউটেন, পেন্টেন ইত্যাদি উচ্চতর হাইড্রোকার্বন	$0.1 - 1.5\%$
৫। নাইট্রোজেন (N_2)	$0.1 - 0.7\%$
সিক্ত প্রাকৃতিক গ্যাসের সাধারণ উপাদানসমূহ	
১। মিথেন (CH_4)	$96\% - 99.6\%$
২। ইথেন $(CH_3 - CH_3)$	$0.08 - 2.7\%$
৩। প্রোপেন $(CH_3 - CH_2 - CH_3)$	$0.01 - 0.5\%$
৪। বিউটেন, পেন্টেন ইত্যাদি উচ্চতর হাইড্রোকার্বন	$0.1 - 1.5\%$
৫। নাইট্রোজেন (N_2)	$0.02 - 0.7\%$
৬। কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	$0.04 - 0.8\%$
৭। হাইড্রোজেন সালফাইড (H_2S)	≈ 0.0
৮। জৈব সালফার	$0.08 - 0.3\%$

প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশোধন (Purification of natural gases) : উৎস হতে আহরিত প্রাকৃতিক গ্যাসে ভেজাল দ্রব্যরূপে পানি, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অন্যান্য সালফাইড বিদ্যমান থাকে। এরূপ ভেজাল দ্রব্যের উপস্থিতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস তীব্র গন্ধযুক্ত হয়ে থাকে এবং এমতাবস্থায় এরূপ প্রাকৃতিক গ্যাসকে সঞ্চালন বা প্রেরণ লাইনে ক্ষয় সৃষ্টি করে। তাছাড়া সালফারযুক্ত প্রাকৃতিক গ্যাস পোড়ালে সালফার ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয় যা এসিড বৃষ্টি সৃষ্টি করে। এ কারণেই প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিশোধন করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাসের বিশোধনের জন্য নিম্নরূপ প্রক্রিয়াগুলো অনুসৃত হয়।

(i) পানি অপসারণ পদ্ধতি : নিম্নরূপ চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে পানি অপসারণ করা হয়।

(ক) পেষণ পদ্ধতি (Compression process) : এ পদ্ধতিতে শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্পের ঘনীভবন ঘটিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে পানি অপসারণ করা হয়।

(খ) নিরুদন পদ্ধতি (Dehydration process) : বিভিন্ন নিরুদক পদার্থের সাহায্যে এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে পানি অপসারণ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসকে শুষ্ক অ্যালুমিনা বা সিলিকা জেল বা ঘন সালফিউরিক এসিড পূর্ণ শুষ্ককারক স্তম্ভে চালনা করলে প্রাকৃতিক গ্যাস পানিমুক্ত অর্থাৎ শুষ্ক হয়।

(গ) হিমায়ন পদ্ধতি (Refrigeration process) : এ পদ্ধতি হিমায়ন চক্রে সম্পন্ন হয়। হিমায়ন চক্রে হিমায়িত কয়েলের মধ্য দিয়ে অশোধিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে চালনা করলে গ্যাস পানিমুক্ত হয়।

(ঘ) পরিশোষণ পদ্ধতি (Adsorption process) : বিভিন্ন পরিশোষক পদার্থ দ্বারা এ পদ্ধতি সম্পন্ন করা হয়। এক্ষেত্রে সক্রিয়িত কার্বন, দানাদার কঠিন পদার্থ তরল জেল পরিশোষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

এ পদ্ধতিতে পরিশোষক পদার্থ পূর্ণ স্তম্ভের মধ্য দিয়ে অশোধিত প্রাকৃতিক গ্যাসকে চালনা করলে পানি শোষক পদার্থ দ্বারা অধিশোষিত হয় এবং প্রাকৃতিক গ্যাস পানিমুক্ত হয়।

(ii) হাইড্রোজেন সালফাইড ও অন্যান্য সালফাইড অপসারণ : নিম্নরূপ দুটি পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে হাইড্রোজেন সালফাইড ও অন্যান্য সালফাইড অপসারণ করা হয়।

১। শুষ্ক পদ্ধতি (Dry process) : এ পদ্ধতিতে এমন কয়েকটি স্তম্ভের সিরিজ ব্যবহার যেগুলো আয়রন অক্সাইড ভর্তি থাকে। এ স্তম্ভের সিরিজের মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসকে চালনা করলে গ্যাসস্থ হাইড্রোজেন সালফাইড আয়রন অক্সাইডের সাথে বিক্রিয়া করে আয়রন সালফাইড গঠন করে। যেমন:

$$F_2O_3.xH_2O + 3H_2S \longrightarrow Fe_2S_3 + (x+3)H_2O$$

অতঃপর এ আয়রন সালফাইড অক্সিজেন ও গ্যাসে বিদ্যমান পানির সাথে বিক্রিয়া করে আয়রন অক্সাইডে পরিণত হয়। যেমনঃ $2Fe_2S_3 + 3O_2 + x\ H_2O \longrightarrow 2Fe_2O_3.xH_2O + 6S$

এভাবেই শুষ্ক পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে হাইড্রোজেন সালফাইড দূর করা হয়।

২। সিক্ত বা আর্দ্র পদ্ধতি (Wet process) : নিম্নে সিক্ত বা আর্দ্র পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক গ্যাস হতে হাইড্রোজেন সালফাইড ও অন্যান্য সালফাইড অপসারণ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো –

(ক) অপুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া : এ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইড যোগ করলে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড হাইড্রোজেন সালফাইডের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন সালফাইড অপসারণ করে। যেমন–

$$2NaOH + 3H_2S \longrightarrow Na_2S + 2H_2O$$

(খ) অপুনরূদ্ধারী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বা সিবোর্ড পদ্ধতি : এ প্রক্রিয়ায় প্রথমে $3-3.5\%\ Na_2CO_3$ সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসকে চালনা করা হয়। ফলে সোডিয়াম কার্বনেট গ্যাসস্থিত হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বাইকার্বনেট উৎপন্ন করে এবং সে সাথে সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড অপসারিত হয়। যেমন–

$$Na_2CO_3 + H_2S \longrightarrow NaHCO_3 + NaHS$$
$$Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow 2NaHCO_3$$
$$Na_2CO_3 + HCN \longrightarrow NaHCO_3 + NaCN$$

অতঃপর $NaHS$ ও $NaHCO_3$ পরস্পর বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বনেট পুনঃউৎপাদিত হয়। এ বিক্রিয়া অ্যাকটিফায়ার কলামে সম্পন্ন করা হয়।

$$NaHS + NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2S$$

(গ) হাইড্রোজেন সালফাইড পুনরুদ্ধারী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বা নির্বাত কার্বনেশন পদ্ধতি : এ প্রক্রিয়াতে প্রথমে $3-3.5\%\,Na_2CO_3$ সোডিয়াম কার্বনেট দ্রবণের মধ্যে দিয়ে প্রাকৃতিক গ্যাসকে চালনা করা হয়। ফলে সোডিয়াম কার্বনেট গ্যাসস্থিত হাইড্রোজেন সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইডের সাথে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম বাইকার্বনেট উৎপন্ন করে এবং একই সাথে সালফাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং হাইড্রোজেন সায়ানাইড অপসারিত হয়।

$$Na_2CO_3 + H_2S \longrightarrow NaHCO_3 + NaHS$$
$$Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow 2NaHCO_3$$
$$Na_2CO_3 + HCN \longrightarrow NaHCO_3 + NaCN$$

অতঃপর $NaHS$ ও $NaHCO_3$ পরস্পর বিক্রিয়া করে সোডিয়াম কার্বনেট পুনঃউৎপাদিত হয়।

$$NaHS + NaHCO_3 \longrightarrow Na_2CO_3 + H_2S$$

এ বিক্রিয়া অ্যাকটিফায়ার মধ্য দিয়ে বায়ুশূন্য অবস্থায় পানি বাষ্পকে প্রবাহিত করে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস কলামের ওপর থেকে আলাদা করা হয়।

(ঘ) সালফার পুনরুদ্ধারী পুনরুৎপাদন প্রক্রিয়া বা থাইলক্স পদ্ধতি : এ পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া অনুসারে হাইড্রোজেন সালফাইড দূরীভূত হয়।

$$2H_2S + O_2 \longrightarrow 2S + 2H_2O$$
$$2H_2S + SO_2 \longrightarrow 3S + 2H_2O$$

প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (Applications of Natural gas) : কয়লার ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাসের মধ্যে শক্তি ''রাসায়নিক শক্তি'' রূপে সঞ্চিত থাকে। প্রাকৃতিক গ্যাসের দহনের ফলে এর রাসায়নিক শক্তি তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয় যা পরবর্তিতে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। কয়লার ন্যায় প্রাকৃতিক গ্যাসেরও তাপ শক্তি উৎপাদন ক্ষমতা আছে বলেই একে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

নিম্নে প্রাকৃতিক গ্যাসের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ দেখানো হলো :

১। নানা ধরনের শিল্পে যেমন– লৌহ, ইস্পাত শিল্প, সিমেন্ট শিল্প প্রভৃতিতে শক্তির উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

২। ঘর গরম রাখতে, রাস্তাঘাটের বাতি জ্বালাতে, গবেষণাগারে, রান্নার কাজে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

৩। তৈল শোধনাগারে জ্বালানি হিসেবে গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

৪। প্রাকৃতিক গ্যাসে বেশি তাপ উৎপন্ন করায় জ্বালানি হিসবে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের উৎস হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

১০.৪ অ্যালকোহল (Alcohols)

সাধারণত সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন হতে এক বা একাধিক হাইড্রোজেন পরমাণু এক বা একাধিক হাইড্রোক্সিল মূলক (–OH) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে যে যৌগ উৎপন্ন করে, তাদেরকে **অ্যালকোহল (Alcohol)** বলে। অথবা যে সকল অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বনের সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত কার্বন শিকলে এক বা একাধিক হাইড্রোক্সিল মূলক (–OH) সরাসরি যুক্ত থাকে, তাদের **অ্যালকোহল** বলে। যেমন– ইথানল (CH_3CH_2OH), বেনজাইল অ্যালকোহল ($C_6H_5CH_2OH$),

অ্যালকোহলের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Alcohols) : অ্যালকোহলের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ নিম্নের ছক আকারে দেখানো হলো :

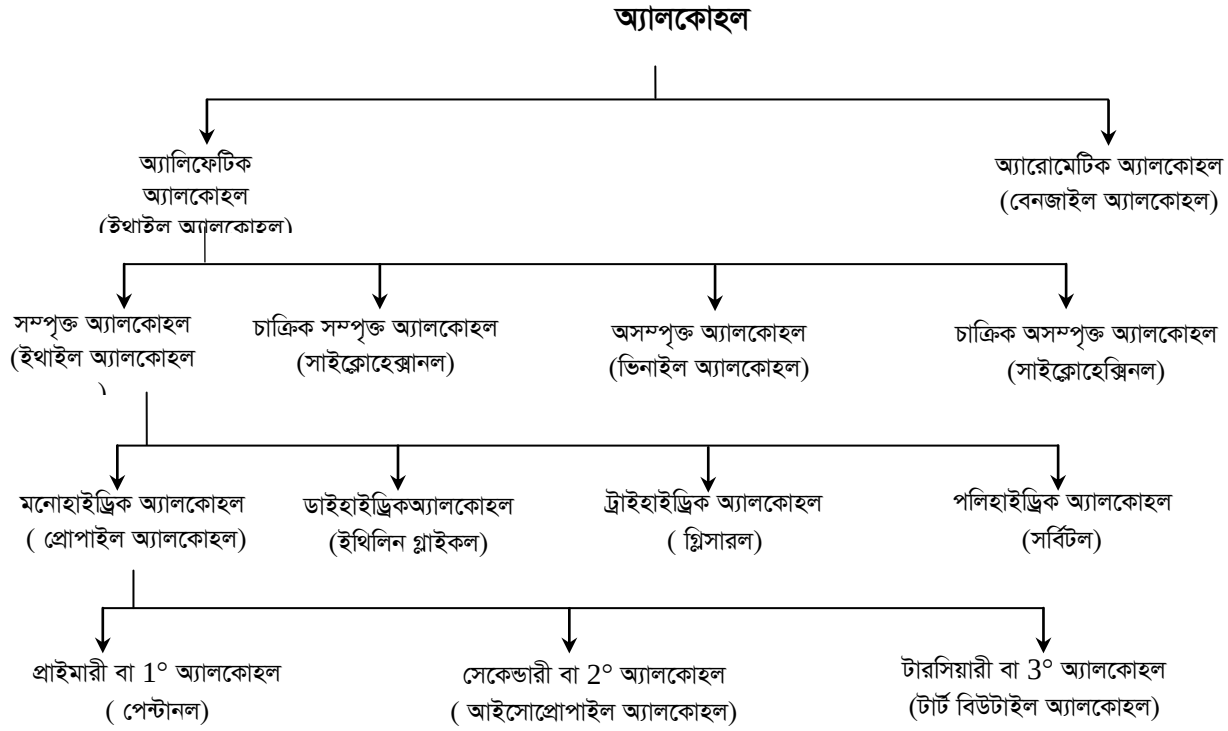

অ্যালকোহলের IUPAC নামকরণ (Nomenclature of Alcohols) : নিম্নে কয়েকটি অ্যালকোহলের IUPAC নামকরণ দেওয়া হলো –

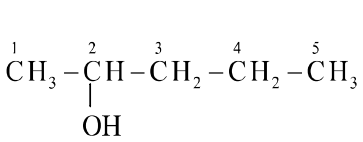
পেন্টানল-2

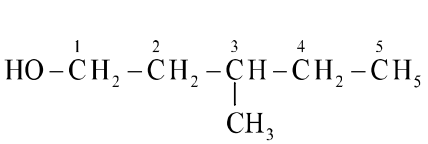
3-মিথাইলপেন্টানল-1

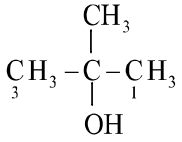
2-মিথাইল-2- প্রোপানল

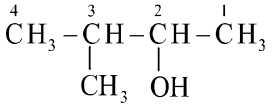
2-মিথাইলবিউটানল-2

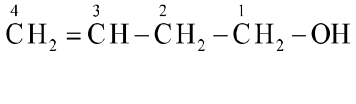
3-বিউটিন-1-অল

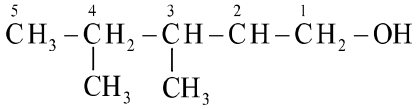
3,4-ডাইমথাইলপেন্টানল -1

অ্যালকোহলের প্রস্তুতি (Preparation of Alcohols)

১। অ্যালকাইল হ্যালাইড হতে : অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে NaOH বা KOH এর জলীয় দ্রবণ মিশিয়ে ফুটালে অ্যালকাইল হ্যালাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ ঘটে, ফলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{R-X} + KOH \xrightarrow{H_2O,\ \Delta} \underset{\text{অ্যালকোহল}}{R-OH} + KX$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথাইল আয়োডাইড}}{CH_3CH_2I} + KOH \xrightarrow{H_2O,\ \Delta} \underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH} + KI$$

$$\underset{\text{মিথাইল আয়োডাইড}}{CH_3I} + NaOH \xrightarrow{H_2O,\ \Delta} \underset{\text{মিথানল}}{CH_3OH} + NaI$$

এ বিক্রিয়ায় অ্যালকাইল হ্যালাইডের হাইড্রোজেন পরমাণু, হাইড্রোক্সিল গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। উল্লেখ্য যে, **এই বিক্রিয়ায় NaOH বা KOH এর জলীয় দ্রবণের পরিবর্তে NaOH বা KOH এর অ্যালকোহলীয় দ্রবণের দ্বারা বিক্রিয়া ঘটালে অ্যালকোহল উৎপন্ন না হয়ে অ্যালকিন উৎপন্ন হয়।**

২। অ্যালকিন হতে অ্যালকিনের সাথে সালফিউরিক এসিডের বিক্রিয়া দ্বারা : শীতল গাঢ় H_2SO_4 এর সাথে অ্যালকিনের বিক্রিয়ায় অ্যালকিন শোষিত হয়ে অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন পদার্থকে পানির সাথে ফুটালে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\substack{\text{অ্যালকিন}\\(\text{প্রতিসম})}}{RCH=CHR} + \underset{(H_2SO_4)}{H-OSO_3H} \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইল হাইড্রোজেন সালফেট}}{RCH_2CH(OSO_3H)R} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{অ্যালকোহল}}{RCH_2CH(OH)R}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\substack{\text{ইথিলিন}\\(\text{প্রতিসম অ্যালকিন})}}{H_2C=CH_2} + \underset{(H_2SO_4)}{H-OSO_3H} \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল হাইড্রোজেন সালফেট}}{CH_3CH_2(OSO_3H)} \xrightarrow{H_2O} \underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{CH_3CH_2OH}$$

৩। কার্বনিল যৌগ হতে : সোডিয়াম অ্যামালগাম ও পানি অথবা শুষ্ক ইথারে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড নামক বিজারকের সাহায্যে অ্যালডিহাইডের বিজারণ ঘটিয়ে সমসংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট প্রাইমারি অ্যালকোহল এবং কিটোনের বিজারণ ঘটিয়ে সমসংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট সেকেন্ডারি অ্যালকোহল প্রস্তুত করা হয়।

(ক) অ্যালডিহাইডের ক্ষেত্রে (প্রাইমারি অ্যালকোহল প্রস্তুতি)

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালডিহাইড}}{RCHO} + 2[H] \xrightarrow[EtOH/Na]{LiAlH_4 \text{ বা}} \underset{1^\circ \text{ অ্যালকোহল}}{RCH_2OH}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথান্যাল}}{CH_3CHO} + 2[H] \xrightarrow[EtOH/Na]{LiAlH_4 \text{ বা}} \underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH}$$

$$\underset{\text{প্রোপান্যাল}}{CH_3CH_2CHO} + 2[H] \xrightarrow[EtOH/Na]{LiAlH_4 \text{ বা}} \underset{\text{প্রোপানল}}{CH_3CH_2CH_2OH}$$

(খ) কিটোনের ক্ষেত্রে (সেকেন্ডারি অ্যালকোহল প্রস্তুতি)

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

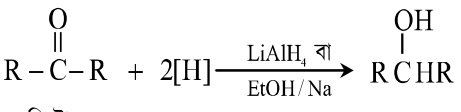

কিটোন

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

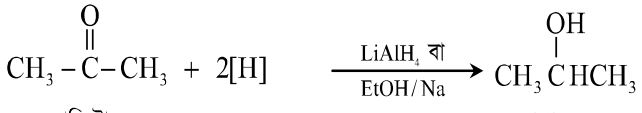

অ্যাসিটোন — প্রোপানল-2

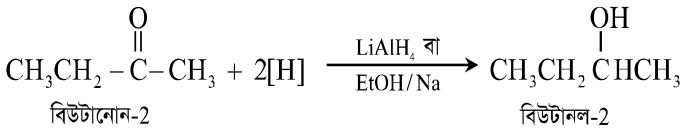

বিউটানোন-2 — বিউটানল-2

৪। কার্বোক্সিলিক এসিড হতে : শুষ্ক ইথারে লিথিয়াম অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রাইড নামক বিজারকের সাহায্যে কার্বক্সিলিক এসিডের বিজারণ ঘটালে প্রাইমারি অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

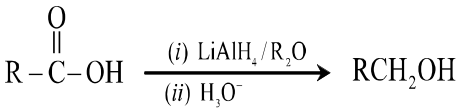

কিটোন

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

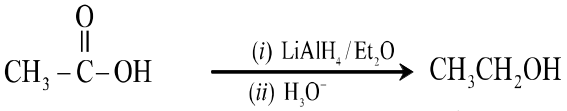

অ্যাসিটিক এসিড — ইথানল

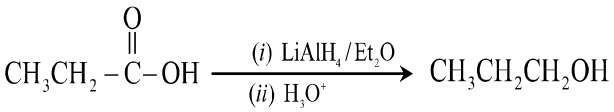

অ্যাসিটিক এসিড — প্রোপানল

অ্যালকোহলের ভৌত ধর্ম (Physical Properties of Alcohols) :

(ক) প্রকৃতি : অ্যালকোহল প্রশম পদার্থ কেননা এদের সংস্পর্শে লিটমাসের কোনোরূপ পরিবর্তন হয় না। কম আণবিক ওজন বিশিষ্ট অ্যালকোহলসমূহ (C_1–C_{10}) গন্ধযুক্ত তরল, পানির চেয়ে হালকা ও পানিতে দ্রাব্য এবং উচ্চ আণবিক ওজনবিশিষ্ট অ্যালকোহলসমূহ (C_{11}–....) গন্ধহীন কঠিন পদার্থ ও পানিতে অদ্রাব্য।

(খ) দ্রাব্যতা : অ্যালকোহলের $-OH$ গ্রুপ পোলার প্রকৃতির। $-OH$ গ্রুপের অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন পরমাণুর ইলেকট্রোনেগেটিভিটির পার্থক্য অনেক বেশি হওয়ায় অক্সিজেন পরমাণু আংশিক ঋণাত্মক চার্জ এবং হাইড্রোজেন পরমাণু আংশিক ধনাত্মক চার্জপ্রাপ্ত হওয়ায় $-OH$ গ্রুপ পোলার হয়ে থাকে। একই কারণে পানিও পোলার প্রকৃতির হয়ে থাকে। যেমন –

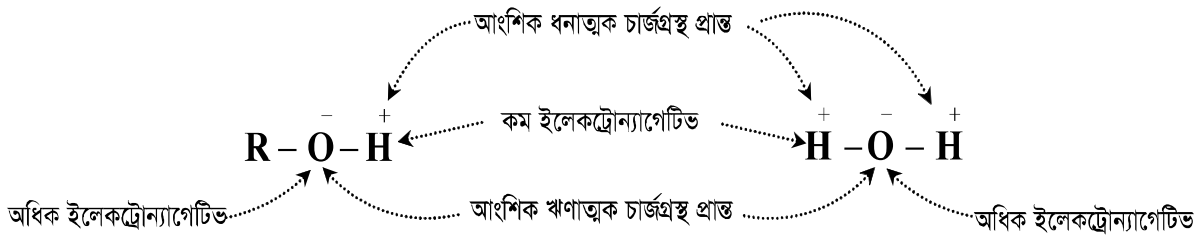

পোলার অ্যালকোহল — পোলার পানি

ফলে অ্যালকোহল অণুসমূহ পানির সাথে আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পানিতে যেকোন অনুপাতে দ্রবীভূত হয়। যেমন–

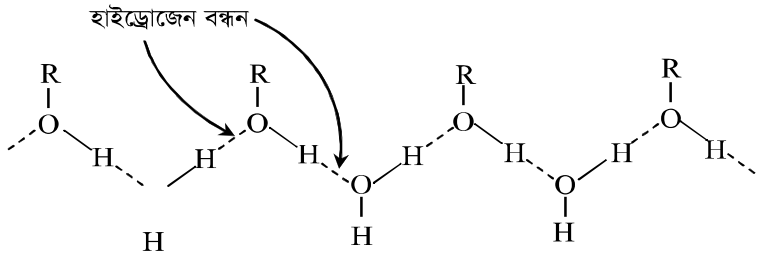

অ্যালকোহল ও পানির মধ্যে হাইড্রোজেন বন্ধন

হাইড্রোকার্বন শিকলের আকার দ্বারা অ্যালকোহলের দ্রবণীয়তা বেশ প্রভাবিত হয়। উচ্চতর অ্যালকোহল-এর ক্ষেত্রে অ্যালকাইল মূলকটি (অপোলার অংশ) আকারে অনেক বড় হলে পানির সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে না অর্থাৎ এরা পানি অদ্রাব্য। যেমন ডেকানল-1 ($CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2CH_2–OH$) পানি অদ্রাব্য কিন্তু ইথানল পানিতে যে কোনো অনুপাতে দ্রাব্য।

(গ) স্ফুটনাংক : অ্যালকোহল অণুতে বিদ্যমান $-OH$ গ্রুপ পোলার প্রকৃতির বলে অ্যালকোহলসমূহ আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত হয়ে বৃহৎ অণুগুচ্ছ রচনা করে । যেমন–

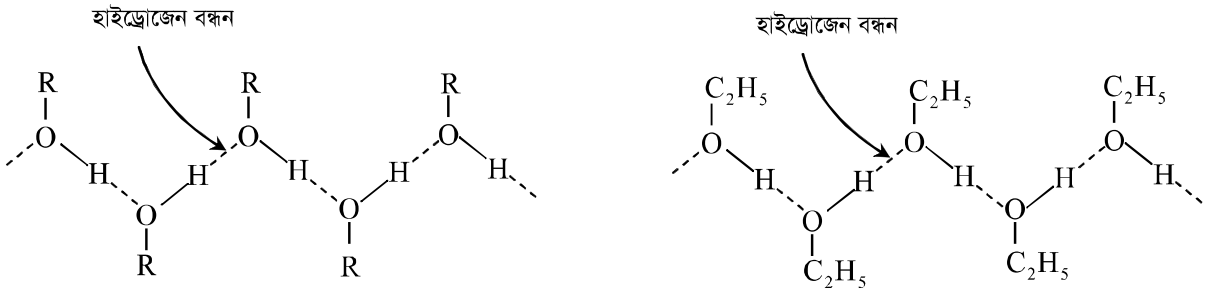

হাইড্রোজেন বন্ধন দ্বারা অ্যালকোহলের সংযোজিত অণুসমূহ

এভাবে সৃষ্ট বৃহৎ অণুগুচ্ছ হতে প্রত্যেকটি অ্যালকোহল অণুকে বিচ্ছিন্ন করতে অধিক তাপশক্তির প্রয়োজন হয়। একারণে অ্যালকোহলসমূহের স্ফুটনাংক অধিক হয়ে থাকে এবং ফলে এরা কম উদ্বায়ী হয়।

একই শ্রেণির অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে তাদের আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়। একই আণবিক সংকেতবিশিষ্ট আইসোমারিক অ্যালকোহলগুলোর ক্ষেত্রে তাদের স্ফুটনাংকের ক্রম নিম্নরূপ –

প্রাইমারি অ্যালকোহল > সেকেন্ডারি অ্যালকোহল > টারসিয়ারি অ্যালকোহল

সাধারণত আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে অ্যালকোহলসমূহের স্ফুটনাংক ও ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার মূল হাইড্রোকার্বনের চেয়ে উদ্ভূত অ্যালকোহলের স্ফুটনাংক ও ঘনত্ব বেশি হয়ে থাকে। যেমন :

সারণি ১০.৪ : আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে মূল হাইড্রোকার্বনের চেয়ে উদ্ভূত অ্যালকোহলের স্ফুটনাংক ও ঘনত্বের মানের পরিবর্তন।

অ্যালকোহল			অ্যালকেন		
নাম	**স্ফুটনাংক (°C)**	**ঘনত্ব (গ্রাম/মিলি)**	**নাম**	**স্ফুটনাংক (°C)**	**ঘনত্ব (গ্রাম/মিলি)**
মিথানল (CH_3OH)	64.5	0.792	মিথেন (CH_4)	–161.4	0.414
ইথানল (C_2H_5OH)	78.5	0.989	ইথেন (C_2H_6)	–88.3	0.546
প্রোপানল (C_3H_7OH)	97.8	0.804	প্রোপেন (C_3H_8)	–44.5	0.585
বিউটানল (C_4H_9OH)	117.0	0.810	n – বিউটেন (C_4H_{10})	–0.55	0.578

অ্যালকোহলের রাসায়নিক ধর্ম (Chemical Properties of Alcohols)

১। ধাতুর সাথে বিক্রিয়া : বিভিন্ন ইলেকট্রোপজেটিভ ধাতু যেমন- সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালশিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সাথে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় $-OH$ গ্রুপের হাইড্রোজেন পরমাণু উক্ত ধাতুগুলো দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। ফলে ধাতব অ্যালকক্সাইড ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। যেমন–

$$2ROH + 2M \longrightarrow RO^- M^+ + H_2\uparrow \ (M = Na, K, Mg, Ca)$$

২। গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে : গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায়, অ্যালকোহলের H পরমাণু অ্যালকাইল মূলক দ্বারা সরাসরি প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকেন তৈরি করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকোহল}}{R-OH} + \underset{\text{গ্রিগনার্ড বিকারক}}{2RMgX} \xrightarrow{-Mg(OR)X} \underset{\text{অ্যালকেন}}{R-H}$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH} + \underset{\text{মিথাইল ম্যাগনেসিয়াম আয়োডাইড}}{CH_3MgI} \xrightarrow{-Mg(OCH_2CH_3)I} \underset{\text{মিথেন}}{CH_4}$$

৩। কার্বক্সিলিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া : এস্টারিফিকেশন বা এস্টারিকরণ : খনিজ এসিডের (যেমন- HCl, H_2SO_4 ইত্যাদি) উপস্থিতিতে জৈব এসিডের সাথে অ্যালকোহলের বিক্রিয়ায় এস্টার ও পানি উৎপন্ন হয়।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + \underset{\text{অ্যালকোহল}}{R'OH} \xrightleftharpoons{\text{গাঢ় } H_2SO_4, \Delta} \underset{\text{এস্টার}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OR'} + H_2O$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{অ্যাসিটিক এসিড}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + \underset{\text{ইথানল}}{CH_3CH_2OH} \xrightleftharpoons{\text{গাঢ় } H_2SO_4, \Delta} \underset{\text{ইথাইল অ্যাসিটেট}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OCH_2CH_3} + H_2O$$

এস্টার গঠনের এই বিক্রিয়াকে **এস্টারিফিকেশন বা এস্টারকরণ** (Esterification) বলে।

৪। অ্যালকোহলের $C-OH$ বন্ধনের ভাঙ্গন বিক্রিয়া :

PX_5 বা PX_3 এর সাথে : অ্যালকোহল ফসফরাস পেন্টাহ্যালাইড বা ফসফরাস ট্রাইহ্যালাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইড ও HCl উৎপন্ন করে।

সাধারণ বিক্রিয়া ঃ

$$\underset{\text{অ্যালকোহল}}{ROH} + PX_3 \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{RX} + H_3PO_4$$

$$\underset{\text{অ্যালকোহল}}{ROH} + PX_5 \longrightarrow \underset{\text{অ্যালকাইল হ্যালাইড}}{RX} + POX_3 + HX$$

সুনির্দিষ্ট উদাহরণ ঃ

$$\underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{CH_3CH_2OH} + PCl_3 \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল ক্লোরাইড}}{CH_3CH_2Cl} + H_3PO_4$$

$$\underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{CH_3CH_2OH} + PCl_5 \longrightarrow \underset{\text{ইথাইল ক্লোরাইড}}{CH_3CH_2Cl} + POCl_3 + HCl$$

১০.৫ কার্বনিল ও কার্বক্সিলিক যৌগ

জৈব রসায়নে কার্বনিল মূলক $(>C=O)$ সকল কার্যকরী মূলকের মধ্যে সুপরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ মূলক। এটি একটি দ্বি-যোজী মূলক। এ দ্বি-যোজী কার্বনিল মূলকের যোজনীদ্বয়ের যে কোনো একটিতে হাইড্রোজেন এবং অপরটিতে একটি হাইড্রোজেন বা একটি অ্যালকাইল মূলক বা একটি ফিনাইল মূলক যুক্ত থেকে যে যৌগ গঠন করে, তাকে **অ্যালডিহাইড (Aldehyde)** বলে।

যেমন :

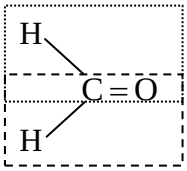

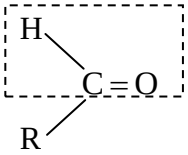

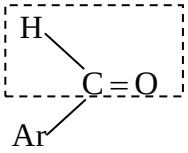

এখানে, $R=$ অ্যালকাইল মূলক

এবং $Ar=$ অ্যারাইল মূলক।

সুতরাং **অ্যালডিহাইডের সাধারণ সংকেত হলো** $R-CHO$ **বা** $Ar-CHO$ **এবং কার্যকরী মূলকের সংকেত** $-$**CHO**। $-$**CHO মূলককে অ্যালডিহাইড মূলক** বলে এবং এটি একটি একযোজী মূলক। এ মূলকটি সব সময় কার্বন শিকলের প্রান্তে অবস্থান করে থাকে। দ্বি-যোজী কার্বনিল মূলকবিশিষ্ট যৌগকে **কার্বনিল যৌগ (Carbonyl compound)** বলে অর্থাৎ **অ্যালডিহাইড ও কিটোন একত্রে কার্বনিল যৌগ নামে পরিচিত**।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালি (General Preparation of Aldehyde and Ketone)

১। অ্যালকোহলের জারণ দ্বারা : প্রাইমারি অ্যালকোহলকে (1^o অ্যালকোহল) গাঢ় H_2SO_4 মিশ্রিত $K_2Cr_2O_7$ দ্বারা উত্তপ্ত করে অ্যালডিহাইড প্রস্তুত করা হয়। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে কিটোন উৎপন্ন হয়।

$$K_2Cr_2O_7 + 4H_2SO_4 \longrightarrow K_2SO_4 + Cr_2(SO_4)_3 + 4H_2O + 3[O]$$

$$3R-CH_2OH + 3[O] \longrightarrow 3R-CHO + 3H_2O$$

উদাহরণ ঃ $CH_3CH_2OH + [O] \longrightarrow CH_3CHO + H_2O$

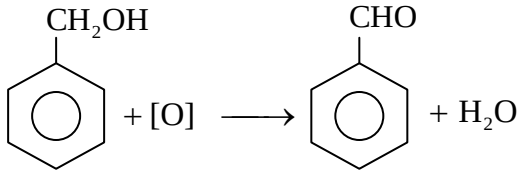

২। অ্যালকোহলের প্রভাবকীয় ডিহাইড্রোজেনেশন দ্বারা : প্রাইমারি অ্যালকোহলের বাষ্পকে কপার প্রভাবকের ওপর দিয়ে 300^oC তাপমাত্রায় প্রবাহিত করলে অ্যালকোহল থেকে এক অণু হাইড্রোজেন অপসারিত হয়ে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়। সেকেন্ডারি অ্যালকোহল থেকে কিটোন উৎপন্ন হয়।

$$CH_3CH_2OH \xrightarrow[300^oC]{Cu} \underset{\text{ইথানাল}}{CH_3CHO} + H_2$$

৩। **কার্বক্সিলিক এসিডের লবণের তাপ বিযোজন দ্বারা ঃ (i)** ক্যালসিয়াম মিথানয়েটকে উত্তপ্ত করলে মিথানাল উৎপন্ন হয়।

$$(HCOO)_2Ca \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{মিথানাল}}{H-CHO} + CaCO_3$$

(ii) দু'টি Ca লবণের মধ্যে একটি ফরমিক এসিডের হলে অ্যালডিহাইড উৎপন্ন হয়।

$$(HCOO)_2\ Ca + (CH_3COO)_2Ca \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{ইথানাল}}{2CH_3-CHO} + CaCO_3$$

(ii) মিথানয়িক এসিড ছাড়া অন্য যে কোনো কার্বক্সিলিক এসিডের ক্যালসিয়াম লবণকে উত্তপ্ত করলে কিটোন উৎপন্ন হয়। যেমন,

কিটোন

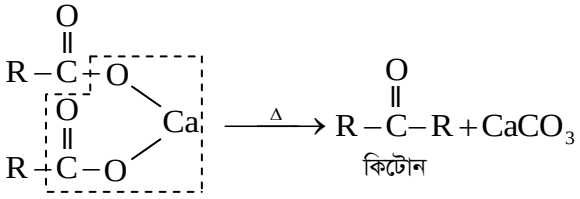

উদাহরণ

প্রোপানোন

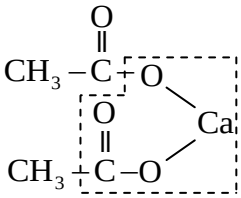

এই পদ্ধতিতে প্রতিসম কিটোন তৈরি করা যায়। কিন্তু দু'টি ভিন্ন এসিডের Ca-লবণের (ফরমিক এসিড ছাড়া) মিশ্রণ উত্তপ্ত করলে অপ্রতিসম কিটোন তৈরি হয়। যেমন,

$$(R-COO)_2\ Ca + (R'COO)_2\ Ca \longrightarrow \underset{\text{অপ্রতিসম কিটোন}}{2R-CO-R'} + CaCO_3$$

অ্যালডিহাইড ও কিটোন (Aldehydes and Ketones) এর ভৌত ধর্ম : অ্যালডিহাইড ও কিটোন কার্বন-অক্সিজেন দ্বি-বন্ধন অর্থাৎ কার্বনিল গ্রুপবিশিষ্ট যৌগ। এজন্য এদের **কার্বনিল যৌগ** বলা হয়।

$$>C=O \quad \text{(কার্বনিল গ্রুপ)}$$

কার্বনিল কার্বনের অবশিষ্ট যোজনীদ্বয়ের একটিতে হাইড্রোজেন পরমাণু থাকলে অ্যালডিহাইড যৌগ হয়।

অ্যালডিহাইড গ্রুপটি হলো $\overset{H}{>}C=O$ বা সংক্ষেপে $-CHO$; অন্য যোজনটি হাইড্রোজেন পরমাণু বা কোনো অ্যালকাইল/ফিনাইল গ্রুপ দ্বারা সংযুক্ত থাকে।

$$\underset{\text{অ্যালডিহাইড}}{R-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O} \qquad \underset{\text{ফরমালডিহাইড}}{R-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O} \qquad \underset{\text{অ্যাসিটালডিহাইড}}{CH_3-\overset{\overset{H}{|}}{C}=O}$$

অপরপক্ষে, কার্বনিল কার্বনের উভয় যোজনীদ্বয় অ্যালকাইল/ ফিনাইল গ্রুপ দ্বারা যুক্ত হলে কিটোন উৎপন্ন হয়।

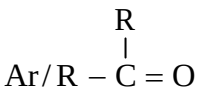

কিটোন (প্রতিসম)

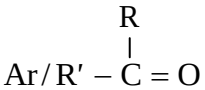

কিটোন (অপ্রতিসম)

একই ধরনের অ্যালকাইল গ্রুপ বা ফিনাইল গ্রুপ যুক্ত থাকলে প্রতিসম কিটোন আর ভিন্ন অ্যালকাইল বা ফিনাইল গ্রুপ যুক্ত থাকলে অপ্রতিসম কিটোন হয়।

ফরমালডিহাইড সাধারণ তাপমাত্রায় গ্যাস এবং অ্যাসিটালডিহাইড অতি উদ্বায়ী তরল (স্ফুটনাঙ্ক $(21^{o}C)$। $C_3 - C_{11}$ সদস্যগুলো তরল এবং পরবর্তী উচ্চতর অ্যালডিহাইডগুলো কঠিন। কিটোন C_3 থেকে C_{11} পর্যন্ত তরল এবং পরবর্তীগুলো কঠিন।

অ্যালডিহাইডের নিম্নতর সদস্যগুলো অস্বস্তিকর গন্ধযুক্ত। কিটোনসমূহ সাধারণত মনোরম গন্ধযুক্ত। উচ্চতর অ্যালডিহাইড $C_8 - C_{13}$ ও কিটোনসমূহের সুগন্ধের জন্য প্রসাধন শিল্পে সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের প্রথম কয়েকটি সদস্য পানিতে দ্রবণীয়, কিন্তু উচ্চতরগুলো অদ্রবণীয়। **30–40% ফরমালডিহাইডের (মিথানাল) জলীয় দ্রবণকে ফরমালিন** (formalin) বলে। ফরমালিন একটি কার্যকরী জীবাণুনাশক। পরীক্ষাগারে জীব বিজ্ঞানের নমুনা সংরক্ষণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালডিহাইড ও কিটোন পোলার যৌগ হওয়ায় অণুগুলোর মধ্যে আন্তঃআণবিক আকর্ষণ বিদ্যমান। ফলে এদের স্ফুটনাঙ্ক সম-আণবিক ওজনের অ্যালকেন অপেক্ষা অনেক বেশি।

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের রাসায়নিক ধর্ম কার্বনিল গ্রুপের $(C=O)$ ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। কার্বনের চেয়ে অক্সিজেনের তড়িৎ-ঋণাত্মকতা বেশি। তাই কার্বনিল গ্রুপে π -ইলেকট্রন মেঘের ঘনত্ব অক্সিজেনের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়।

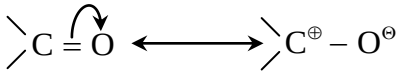

সুতরাং কার্বন আংশিক ধনাত্মক এবং অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক চার্জের অধিকারী হয়। প্রকৃতপক্ষে, কার্বন-অক্সিজেন বন্ধনটি খুবই পোলারায়িত (polarised) এবং কার্বনিল গ্রুপের কার্বন-পরমাণুটি ইলেকট্রন স্বল্প (electron deficient) আর অক্সিজেন পরমাণুটি ইলেকট্রন-সমৃদ্ধ (electron rich)।

কার্বনিল যৌগের বিক্রিয়াগুলিতে ইলেকট্রন স্বল্প কার্বনিল কার্বনকে ইলেকট্রন সমৃদ্ধ কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক (nucleophilic reagent) আক্রমণ করে সংযোজন বিক্রিয়া ঘটাবে। সুতরাং **কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়াই** হলো অ্যালডিহাইড ও কিটোনের বৈশিষ্ট্যসূচক বিক্রিয়া।

কার্বনিল যৌগের কেন্দ্রাকষী সংযোজন বিক্রিয়ায় (i) কার্বনিল কার্বনের ধনাত্মকতা (positivity) যত বাড়ে এবং (ii) কার্বন পরমাণুটির আশপাশে অন্যান্য বড় গ্রুপের ভিড় (crowding) না থাকলে বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি পায়। কারণ ভিড় থাকলে বিকারকের আক্রমণ পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়।

কিটোনের দুটো অ্যালকাইল গ্রুপ এবং অ্যালডিহাইডে একটা অ্যালকাইল গ্রুপ আছে। প্রত্যেকটি অ্যালকাইল গ্রুপই ইলেকট্রন প্রদানকারী (electron releasing) এবং সেগুলোর নিজস্ব আকার দিয়ে আক্রমণকারী বিকারকের গতিপথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এ কারণে কিটোন অ্যালডিহাইড থেকে কম সক্রিয়। ফরমালডিহাইডে কোনো অ্যালকাইল গ্রুপ নেই। তাই এটি সবচেয়ে বেশি সক্রিয়।

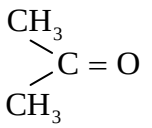

প্রোপানোন (কিটোন)

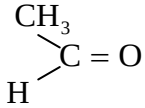

অ্যাসিটালডিহাইড

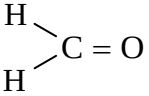

ফরমালডিহাইড

সক্রিয়তা বৃদ্ধি

কার্বনিল যৌগের রাসায়নিক বিক্রিয়া (Chemical Reactions of Carbonyl Comounds)

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের নিউক্লিওফিলিক সংযোজন বিক্রিয়া (Nucleophilic Addition Reactions of Aldehyde And Ketones)

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের কার্বনিল গ্রুপে চলমান π-ইলেকট্রন মেঘ অক্সিজেন পরমাণুর দিকে অধিকতর আকৃষ্ট থাকায় কার্বনিল কার্বনে ইলেকট্রন স্বল্পতা ও অক্সিজেন পরমাণুতে ইলেকট্রন সমৃদ্ধতা থাকে। কার্বনিল গ্রুপ সমতলীয় হওয়ার দরুন π-ইলেকট্রন মেঘ সমতলের লম্ব বরাবর অবস্থান করে। তাই কার্বনিল গ্রুপকে উভয় দিক (উপর ও নিচ) হতে কেন্দ্রাকর্ষী বিকারক আক্রমণ করে। এজন্যই অ্যালডিহাইড ও কিটোন তথা কার্বনিল যৌগ কেন্দ্রাকর্ষী সংযোজন বিক্রিয়া দেয়।

১। অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাথে হাইড্রোজেন সায়ানাইডের (HCN) সংযোজন : অ্যালডিহাইড ও কতিপয় কিটোন উভয় শ্রেণির যৌগের সাথে হাইড্রোজেন সায়ানাইড যুক্ত হয়ে যথাক্রমে **অ্যালডিহাইড বা কিটোন সায়ানোহাইড্রিন (α-সায়ানো অ্যালকোহল)** উৎপন্ন করে।

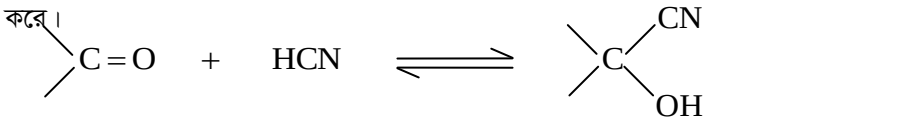

অ্যালডিহাইড বা কিটোন — অ্যালডিহাইড সায়ানোহাইড্রিন বা কিটোন সায়ানোহাইড্রিন

অ্যালডিহাইড যেমন– অ্যাসিটালডিহাইড ও কিটোন প্রোপানোন হাইড্রোজেন সায়ানাইডের সাথে বিক্রিয়া করে যথাক্রমে **অ্যাসিটালডিহাইড সায়ানোহাইড্রিন ও প্রোপানোন সায়ানোহাইড্রিন** উৎপন্ন করে।

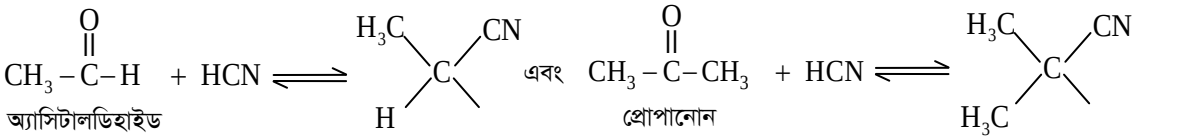

অ্যাসিটালডিহাইড — অ্যাসিটালডিহাইড

এবং প্রোপানোন — প্রোপানোন সায়ানোহাইড্রিন

২। অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাথে সোডিয়াম বাইসালফাইটের ($NaHSO_3$) সংযোজন :

অ্যালডিহাইড ও কিটোন উভয় শ্রেণির যৌগের সাথে সোডিয়াম বাইসালফাইটের ($NaHSO_3$) সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ বিক্রিয়া করে যথাক্রমে **অ্যালডিহাইড বাইসালফাইট যুত যৌগ বা কিটোন বাইসালফাইট যুত যৌগ** উৎপন্ন করে।

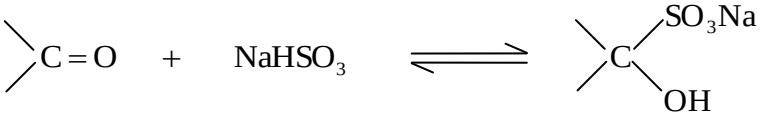

অ্যালডিহাইড বা কিটোন — অ্যালডিহাইড বাইসালফাইট বা কিটোন বাইসালফাইট যুত যৌগ

উৎপন্ন এ যুত যৌগ কেলাসাকার কঠিন পদার্থ এবং এ যৌগ কার্বন-সালফার বন্ধনবিশিষ্ট।

উদাহরণ : অ্যাসিটালডিহাইড ও অ্যাসিটোনের সাথে সোডিয়াম বাইসালফাইটের ($NaHSO_3$) সম্পৃক্ত জলীয় দ্রবণ বিক্রিয়া করে যথাক্রমে **অ্যাসিটালডিহাইড বাইসালফাইট ও অ্যাসিটোন বাইসালফাইট নামক যুত যৌগ** উৎপন্ন করে।

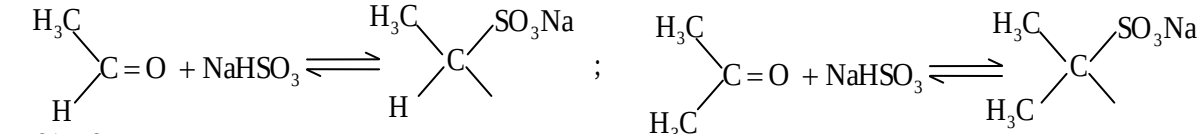

অ্যাসিটালডিহাইড — অ্যাসিটালডিহাইড সোডিয়াম

; অ্যাসিটোন — অ্যাসিটোন সোডিয়াম বাইসালফাইট

৩। অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সাথে গ্রিগনার্ড বিকারকের (RMgX) সংযোজন বিক্রিয়া : অ্যালডিহাইড ও কিটোন উভয় শ্রেণির যৌগের সাথে গ্রিগনার্ড বিকারক বিক্রিয়া করে **যুত যৌগ** গঠন করে। উৎপন্ন এ যুত যৌগকে লঘু এসিড বা পানি দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

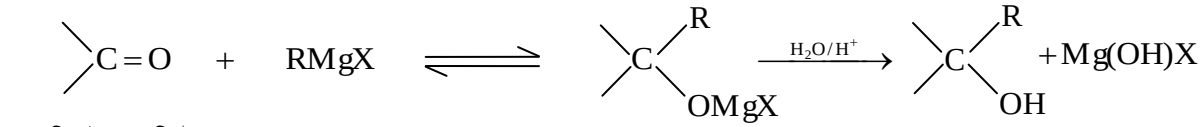

অ্যালডিহাইড বা কিটোন | যুত যৌগ | অ্যালকোহল

অ্যালডিহাইডগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র ফরমালডিহাইড গ্রিগনার্ড বিকারকের সাথে বিক্রিয়া করে **প্রাইমারি অ্যালকোহল** উৎপন্ন করে।

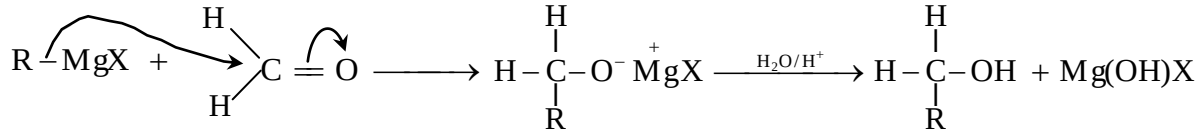

প্রাইমারী অ্যালকোহল

ফরমালডিহাইড ছাড়া অন্য যে কোনো অ্যালডিহাইডের সাথে গ্রিগনার্ড বিকারক বিক্রিয়া করে **সেকেন্ডারি অ্যালকোহল** উৎপন্ন করে।

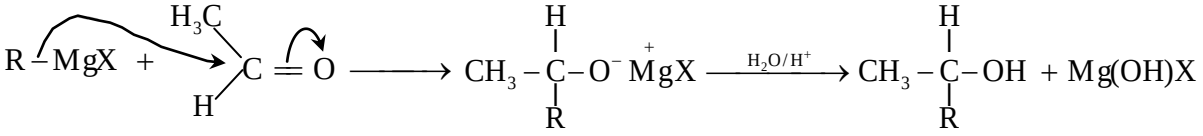

সেকেন্ডারি অ্যালকোহল

অন্যদিকে যে কোনো কিটোনের সাথে গ্রিগনার্ড বিকারকের বিক্রিয়ায় **টারসিয়ারি অ্যালকোহল** উৎপন্ন হয়। যেমন:

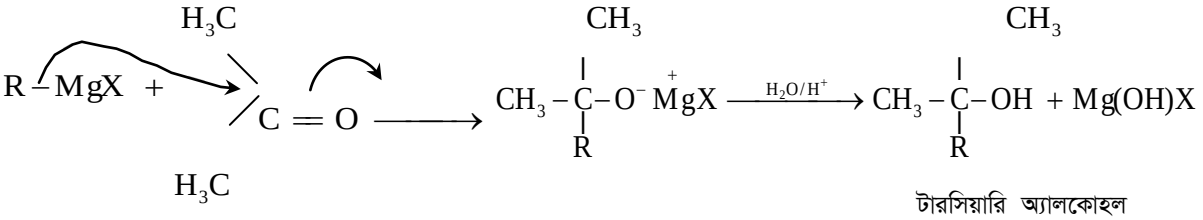

টারসিয়ারি অ্যালকোহল

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের সনাক্তকারী বিক্রিয়া

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের মধ্যে সাধারণ কার্বনিল গ্রুপ $(>C=O)$ বিদ্যমান। ফলে উভয় যৌগ 2, 4−ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাযোন ডেরিভেটিভ গঠন করে।

2, 4−DNPH পরীক্ষা : পরীক্ষাধীন যৌগের 2/3 ফোঁটা একটি পরীক্ষা নলে নিয়ে তার মধ্যে 2 mL অ্যালকোহল যোগ করে দ্রবীভূত করুন। এর মধ্যে 2–3 mL 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজিন দ্রবণ (2,4 DNPH দ্রবণ) যোগ করে ঝাঁকান। সঙ্গে সঙ্গে অধঃক্ষেপ না পড়লে 10 মিনিট অপেক্ষা করুন। এতেও অধঃক্ষেপ দেখা না দিলে মিশ্রণটি গরম করে কিছুক্ষণ রেখে দিন। দেখবেন, দানাদার অধঃক্ষেপ পড়েছে।

এই অধঃক্ষেপ 2,4-ডাইনাইট্রোফিনাইল হাইড্রাজোন ডেরিভেটিভের। হলুদ/কমলা অধঃক্ষেপ পাওয়া গেলে পরীক্ষাধীন যৌগ অ্যালডিহাইড বা কিটোন হবে।

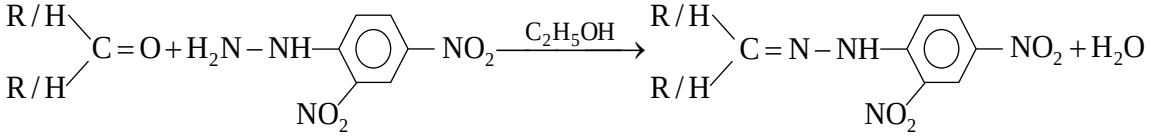

হলুদ বা কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ

অ্যালডিহাইড ও কিটোনের পার্থক্যসূচক পরীক্ষা (Test for identification of aldehydes & ketones)

(i) ফেহলিং দ্রবণ পরীক্ষা (Fehling solution test) : কেবল অ্যালডিহাইডগুলো ফেহলিং দ্রবণকে বিজারিত করে। কিটোন কোনোরূপ সাড়া দেয় না।

একটি পরীক্ষা নলে পরীক্ষাধীন যৌগের অ্যালকোহলীয় বা পানির দ্রবণে (0.05 g বা 2/3 ফোঁটা যৌগ $2-3$ mL পানি বা অ্যালকোহলে মিশ্রিত করুন) $2-3$mL ফেহলিং দ্রবণ যোগ করুন। মিশ্রণকে একটি পানিগাত্রে (waterbath) $2-3$ মিনিট ফুটান । লক্ষ করুন–

- হল্যুদ বা কমলা বর্ণের অধঃক্ষেপ পড়েছে – অ্যালডিহাইডের উপস্থিতি নিশ্চিত।
- পরীক্ষায় কোনো পরিবর্তন দেখা গেল না – কিটোন উপস্থিতি নিশ্চিত।
- তবে ২,৪ ড্রাইনাইট্রো ফিনাইল হাইড্রোজেন গঠন পরীক্ষা দিতে হবে।

$$CuSO_4 + NaOH \longrightarrow Na_2SO_4 + Cu(OH)_2$$

$$Cu(OH)_2 + NaKC_4H_4O_6 \longrightarrow Cu_2(C_4H_4O_6).\ Cu(OH)_2$$

$$CH_3CHO + Cu(OH)_2 + NaOH \longrightarrow CH_3COONa + Cu_2O\downarrow + H_2O$$

নীল বর্ণ — লাল অর্ধঃক্ষেপ

(ii) টলেন বিকারক পরীক্ষা (Tollen's reagent test) : একটি পরীক্ষা নলে 0.05 g বা 2/3 ফোঁটা পরীক্ষাধীন যৌগ $2-3$mL অ্যালকোহলে দ্রবীভূত করুন। এবার এতে $2-3$ mL টলেন বিকারক যোগ করুন। লক্ষ করুন, কোনো বিক্রিয়া হচ্ছে কি না। যদি বিক্রিয়া না দেখা যায় তবে একটি বিকারে রক্ষিত গরম পানিতে উত্তপ্ত করুন। লক্ষ করুন –

- পরীক্ষা নলের ভিতরের গায়ে উজ্জ্বল সিলভার দর্পণ হলে–অ্যালডিহাইড নিশ্চিত।
- ফলাফল নেতিবাচক হলে – কিটোন নিশ্চিত।
- তবে ২,৪ ডাই নাইট্রো ফিনাইল হাইড্রাজেন গঠন পরীক্ষা দিতে হবে।

$$AgNO_3 + NH_4OH \longrightarrow [Ag(NH_3)_2]OH + NH_4NO_3 + H_2O$$

$$CH_3 - CHO + [Ag(NH_3)_2]OH \longrightarrow CH_3COONH_4 + Ag\downarrow + NH_3 + H_2O$$

(দর্পণ)

কার্বক্সিলিক এসিড (Carboxylic Acids)

$-COOH$ গ্রুপকে কার্বক্সিল গ্রুপ বলা হয়। কার্বক্সিলিক মূলকবিশিষ্ট জৈব যৌগসমূহকে **কার্বোক্সিলিক এসিড** বলে। জলীয় দ্রবণে $-COOH$ গ্রুপসম্পন্ন যৌগ থেকে প্রোটন দান করে বলে এদের এসিড বলা হয়।

একটি কার্বনিল গ্রুপ $(>C=O)$ এবং একটি হাইড্রক্সিল গ্রুপের $(-OH)$ সমন্বয়ে একটি কার্বক্সিল গ্রুপ $(-COOH)$ গঠিত হয়। কার্বনিল carbonyl (কার্বনিল) এর 'carb' এবং hydroxyl (হাইড্রোক্সিল) এর 'oxyl' এই দুই পদাংশ সংযুক্ত হয়ে carboxyl (কার্বক্সিল) নামকরণ করা হয়েছে।

কার্বক্সিলিক এসিড এর সাধারণ সংকেত হলো R-COOH । এখানে, $R=$ অ্যালকাইল মূলক বা অ্যারাইল মূলক । অ্যালকাইল গ্রুপের সঙ্গে $-COOH$ গ্রুপ যুক্ত হয়ে অ্যালিফেটিক কার্বক্সিলিক এসিড (ইথানয়িক এসিড বা এসিডটক অ্যাসিড : CH_3-COOH) এবং অ্যারাইল গ্রুপের সঙ্গে $-COOH$ গ্রুপ যুক্ত হয়ে অ্যারোমেটিক কার্বক্সিলিক এসিড সৃষ্টি (বেনজয়িক এসিড C_6H_5-COOH) হয়।

কার্বক্সিলিক এসিডের প্রস্তুতি (Preparation of Carboxylic Acids)

(ক) অ্যালিফেটিক কার্বোক্সিলিক এসিড প্রস্তুতি : নিম্নে অ্যালিফেটিক কার্বোক্সিলিক এসিড প্রস্তুতির কয়েকটি সাধারণ পদ্ধতি আলোচনা করা হলো –

১। অ্যালকোহলের জারণ দ্বারা : পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক এসিড দ্বারা **প্রাইমারি অ্যালকোহল**কে জারিত করলে সংশ্লিষ্ট অ্যালকোহলের সমানসংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{প্রাইমারি অ্যালকোহল}}{R-CH_2OH} + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4} \underset{\text{অ্যালডিহাইড}}{R-CHO} \xrightarrow{[O]} \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-COOH}$$

যেমনঃ $$\underset{\text{ইথাইল অ্যালকোহল}}{CH_3-CH_2OH} + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7 + H_2SO_4} \underset{\text{অ্যাসিটালডিহাইড}}{CH_3-CHO} \xrightarrow{[O]} \underset{\text{অ্যাসিটিক এসিড}}{CH_3-COOH}$$

আবার সালফিউরিক এসিড যুক্ত পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট দ্বারা **প্রাইমারি অ্যালকোহল**কে জারিত করলে সংশ্লিষ্ট অ্যালকোহলের সমানসংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{প্রাইমারি অ্যালকোহল}}{R-CH_2CH_2OH} + [O] \xrightarrow{KMnO_4 + H_2SO_4} \underset{\text{অ্যালডিহাইড}}{RCH_2-CHO} \xrightarrow{[O]} \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{RCH_2-COOH}$$

যেমনঃ $$\underset{\text{প্রোপাইল অ্যালকোহল}}{CH_3CH_2CH_2OH} + [O] \xrightarrow{KMnO_4 + H_2SO_4} \underset{\text{প্রোপান্যালডিহাইড}}{CH_3CH_2CHO} \xrightarrow{[O]} \underset{\text{প্রোপানোয়িক এসিড}}{CH_3CH_2COOH}$$

২। গ্রিগনার্ড বিকারক হতে : গ্রিগনার্ড বিকারকের উপস্থিতিতে শুষ্ক ইথারীয় দ্রবণের মধ্য দিয়ে শীতল অবস্থায় কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস প্রবাহিত করলে যে যুত যৌগ উৎপন্ন হয়, তাকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{গ্রিগনার্ড বিকারক}}{C=O + R-MgX} \xrightarrow{\text{dry ether, } 0^\circ C} \underset{\text{যুত যৌগ}}{R-C-OMgX} \xrightarrow{H^+/H_2O} \underset{\text{কার্বক্সিলিক}}{R-C-OH} + Mg(OH)X$$

যেমন– $$\underset{\text{গ্রিগনার্ড বিকারক}}{C=O + CH_3-MgBr} \xrightarrow{\text{dry ether, } 0^\circ C} \underset{\text{যুত যৌগ}}{CH_3-C-OMgBr} \xrightarrow{H^+/H_2O} \underset{\text{অ্যাসিটিক এসিড}}{CH_3-C-OH} + Mg(OH)Br$$

৩। **অ্যালডিহাইডের জারণ দ্বারা :** তীব্র জারক দ্রব্য পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক এসিড দ্বারা **অ্যালডিহাইডকে** জারিত করলে সংশ্লিষ্ট অ্যালকোহলের সমান সংখ্যক কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$R-CHO + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7\ +\ H_2SO_4} R-COOH$$

অ্যালডিহাইড কার্বক্সিলিক এসিড

যেমন– $$CH_3-CHO + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7\ +\ H_2SO_4} CH_3-COOH$$

অ্যাসিটালডিহাইড এসিটিক এসিড

৪। **কিটোনের জারণ দ্বারা :** তীব্র জারক দ্রব্য পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক এসিড দ্বারা **কিটোনকে** জারিত করলে সংশ্লিষ্ট কিটোনের চেয়ে কম কার্বন পরমাণুবিশিষ্ট কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

$$R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-R' + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7+H_2SO_4} \underbrace{RCOOH + R'COOH}_{\text{কার্বক্সিলিক এসিডের মিশ্রণ}} + CO_2 + H_2O$$

কিটোন

$$CH_3CH_2-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-CH_2CH_3 + [O] \xrightarrow{K_2Cr_2O_7+H_2SO_4} \underbrace{CH_3CH_2COOH + CH_3COOH}_{} + CO_2 + H_2O$$

পেন্টান-3-ওন প্রোপানয়িক এসিড ও অ্যাসিটিক এসিডের মিশ্রণ

৫। **এস্টারের আর্দ্রবিশ্লেষণ দ্বারা :** খনিজ এসিডের উপস্থিতিতে এস্টারকে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে কার্বক্সিলিক এসিড ও অ্যালকোহল উৎপন্ন এসিড হয়।

$$R-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OR' + H_2O \xrightarrow{HCl\ or\ H_2SO_4} RCOOH + R'OH$$

এস্টার কার্বক্সিলিক এসিড অ্যালকোহল

যেমনঃ $$CH_3-\overset{\overset{\displaystyle O}{\|}}{C}-OCH_2CH_3 + H_2O \xrightarrow{HCl\ or\ H_2SO_4} CH_3COOH + CH_3CH_2OH$$

ইথাইল অ্যাসিটেট অ্যাসিটিক এসিড প্রোপানল

(খ) অ্যারোমেটিক কার্বোক্সিলিক এসিড প্রস্তুতি : হলো **১। অ্যালকাইল বেনজিনের জারণ দ্বারা :** অ্যালকাইল বেনজিনকে ক্ষারীয় পটাসিয়াম পারম্যাংগানেট দ্বারা জারিত করলে অ্যারোমেটিক কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

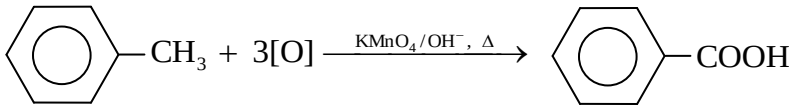

টলুইন বেনজোয়িক এসিড

২। **প্রাইমারি অ্যালকোহলের জারণ দ্বারা (বেনজাইল) :** পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট ও সালফিউরিক এসিড দ্বারা **প্রাইমারি অ্যালকোহল বেনজাইল অ্যালকোহল**কে জারিত করলে প্রথমে বেনজালডিহাইড ও পরে অ্যারোমেটিক কার্বক্সিলিক এসিড উৎপন্ন হয়।

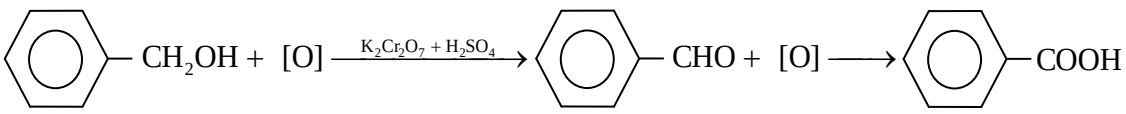

বেনজাইল অ্যালকোহল বেনজালডিহাই বেনজোয়িক এসিড

কার্বক্সিলিক এসিডের ধর্মাবলি (Properties of Carboxylic Acids)

(ক) অ্যালিফেটিক কার্বক্সিলিক এসিড সমূহের বর্ণ ও গন্ধ : কার্বক্সিলিক এসিডসমূহের প্রথম তিনটি সদস্য- মিথানয়িক এসিড , ইথানয়িক এসিড এবং প্রোপানয়িক এসিড প্রত্যেকে ঝাঁজালো গন্ধযুক্ত বর্ণহীন তরল। চতুর্থ সদস্য হতে নবম সদস্য যথা : বিউটানয়িক এসিড, পেন্টানয়িক এসিড, হেক্সানয়িক এসিড, হেপ্টানয়িক এসিড, অক্টানয়িক এসিড ও নোনানয়িক এসিডের প্রত্যেকে দুর্গন্ধযুক্ত তৈলাক্ত পদার্থ। দশম সদস্য হতে বাকি সকল কার্বক্সিলিক এসিড গন্ধহীন কঠিন পদার্থ।

(খ) অ্যালিফেটিক কার্বক্সিলিক এসিডসমূহের স্ফুটনাংক : কার্বক্সিলিক এসিডসমূহে $-OH$গ্রুপ থাকায় এরা পরস্পর আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে আট সদস্যবিশিষ্ট সাইক্লিক ডাইমার গঠন করে।

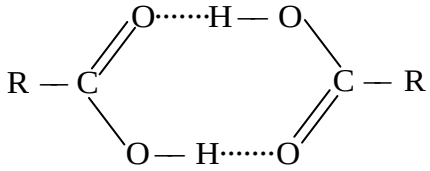

চিত্র-১০.২ঃ আন্তঃআাণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের মাধ্যমে কার্বক্সিলিক এসিডের ডাইমার গঠন।

কার্বক্সিলিক এসিডের এই ডাইমারের অন্তর্গত হাইড্রোজেন বন্ধনগুলো খুবই দৃঢ় প্রকৃতির। কারণ $-COOH$গ্রুপের $-OH$গ্রুপ ইলেকট্রনাকর্ষী $>C=O$গ্রুপের সংগে যুক্ত থাকে এবং কার্বক্সিলিক এসিডের প্রতি অণু দুটি হাইড্রোজেন বন্ধন গঠন করে। একারণে **কার্বক্সিলিক এসিডের স্ফুটনাংকের মান অনেক বেশি।**

কার্বক্সিলিক এসিডসমূহের আণবিক ভর বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের স্ফুটনাংকও বৃদ্ধি পায়।

$$HCOOH(100^\circ C) < CH_3COOH(118^\circ C) < CH_3CH_2COOH(141^\circ C) < CH_3CH_2CH_2COOH(162^\circ C)$$

কার্বক্সিলিক এসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া :

কার্বক্সিলিক এসিড সমূহের অম্লত্ব (Acidity of Carboxylic Acid) : কার্বক্সিলিক এসিড জলীয় দ্রবণে প্রোটন দান করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং কার্বক্সিলেট আয়ন তৈরি করে।

$$RCOOH \;+\; H_2O \rightleftharpoons RCOO^- \;+\; H_3\overset{+}{O}$$

সৃষ্ট এ কার্বক্সিলেট আয়ন রেজোন্যান্স দ্বারা সুস্থিত।

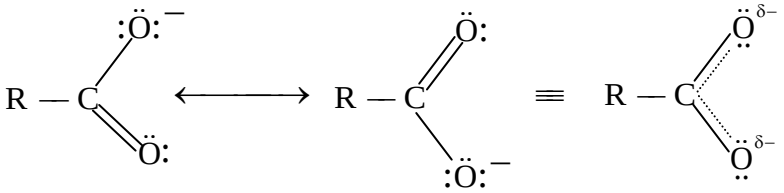

কার্বক্সিলেট আয়ন রেজোন্যান্স দ্বারা সুস্থিত বলে প্রোটন আয়নিত অবস্থায় পানিতে বিদ্যমান থাকে। যেহেতু কার্বক্সিলিক এসিড জলীয় দ্রবণে প্রোটন দান করে, সেহেতু এটি অম্লধর্মী।

কার্বক্সিলিক এসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়াসমূহ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো :

(ক) কার্বক্সিল গ্রুপের হাইড্রোজেন পরমাণুর প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (কার্বক্সিল মূলকের পরীক্ষা) : কার্বক্সিলিক এসিড জলীয় দ্রবণে প্রোটন দান করে হাইড্রোনিয়াম আয়ন এবং কার্বক্সিলেট আয়ন তৈরি করে।

$$RCOOH \;+\; H_2O \rightleftharpoons RCOO^- \;+\; H_3\overset{+}{O}$$

সুতরাং কার্বক্সিলিক এসিড অম্ল ধর্ম প্রদর্শন করে। কার্বক্সিলিক এসিডের অম্লধর্ম সমর্থনে নিম্নরূপ রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলো উল্লেখযোগ্য :

১। লিটমাসের উপর ক্রিয়া : অ্যালিফ্যাটিক কার্বক্সিলিক এসিডের জলীয় দ্রবণ **নীল লিটমাসকে লাল** করে।

২। ধাতুর সঙ্গে বিক্রিয়া : কার্বক্সিলিক এসিড তড়িৎ-রাসায়নিক শ্রেণিতে উপরের দিকে অবস্থিত ধাতুগুলো যেমন– সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ইত্যাদির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস এবং কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ উৎপন্ন করে। যেমন–

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{2R-COOH} + 2Na \longrightarrow \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ}}{R-COONa} + H\uparrow$$

৩। ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া : কার্বক্সিলিক এসিড ক্ষারের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ ও পানি উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-COOH} + NaOH \longrightarrow \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ}}{R-COONa} + H_2O$$

৪। ধাতব কার্বনেট ও বাইকার্বনেটের সঙ্গে বিক্রিয়া : কার্বক্সিল এসিড ধাতব কার্বনেট ও বাইকার্বনেটকে বিয়োজিত করে কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ ও কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত করে।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{2R-COOH} + Na_2CO_3 \longrightarrow \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ}}{2R-COONa} + CO_2\uparrow + H_2O$$

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-COOH} + NaHCO_3 \longrightarrow \underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিডের লবণ}}{R-COONa} + CO_2\uparrow + H_2O$$

৫। অ্যামোনিয়ার সঙ্গে বিক্রিয়া : কার্বক্সিলিক এসিড অ্যামোনিয়ার সাথে বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়াম লবণ উৎপন্ন করে।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{2R-COOH} + NH_3 \longrightarrow \underset{\text{অ্যামোনিয়াম লবণ}}{R-COONH_4}$$

(খ) হাইড্রোক্সিল গ্রুপের প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া : কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের $-OH$ গ্রুপটি অ্যালকক্সি $(-OR)$, অ্যামিনো $(-NH_2)$, ক্লোর $(-Cl)$ ও অ্যাসাইলক্সি $(-OCOR)$ গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হলে যথাক্রমে এস্টার, অ্যামাইড, এসিড ক্লোরাইড ও এসিড অ্যানহাইড্রাইড উৎপন্ন করে। যেমন–

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + \underset{\text{অ্যালকোহল}}{R'-OH} \underset{\text{গাঢ় } H_2SO_4 \text{ বা শুষ্ক HCl}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{এস্টার}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-R'} + H_2O$$

যেমন– $\underset{\text{অ্যাসিটিক এসিড}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + \underset{\text{প্রোপানল}}{CH_3CH_2OH} \underset{\text{গাঢ় } H_2SO_4 \text{ বা শুষ্ক HCl}}{\rightleftharpoons} \underset{\text{ইথাইল অ্যাসিটেট}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OCH_2CH_3} + H_2O$

১। এস্টার গঠন : উপযুক্ত প্রভাবক যেমন– গাঢ় H_2SO_4 বা শুষ্ক HCl-এর উপস্থিতিতে কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালকোহল বিক্রিয়ায় এস্টার উৎপন্ন হয়। এস্টার গঠনের এই বিক্রিয়াটিকে বলা হয় **এস্টারিফিকেশন** বলে। এ বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক এসিডের $-OH$ গ্রুপটি অ্যালকোহলের অ্যালকক্সি $(-OR)$ গ্রুপ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়।

এস্টার গঠন বিক্রিয়ায় কার্বক্সিলিক এসিডগুলোর সক্রিয়তার ক্রম হলো :

$$R_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH < R_2CH-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH < RCH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH < CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH$$

অ্যালকোহলগুলোর সক্রিয়তার ক্রম হলো : **টারসিয়ারি অ্যালকোহল< সেকেন্ডারি অ্যালকোহল < প্রাইমারি অ্যালকোহল**

২। এসিড অ্যামাইড গঠন : কার্বক্সিলিক এসিডের সঙ্গে অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়ায় উৎপন্ন অ্যামোনিয়াম লবণকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে এসিড অ্যামাইড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + NH_3 \longrightarrow \underset{\text{অ্যামোনিয়াম লবণ}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONH_4} \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{এসিড অ্যামাইড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2} + H_2O$$

যেমন– $$\underset{\text{প্রোপানয়িক এসিড}}{C_2H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + NH_3 \longrightarrow C_2H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_4 \xrightarrow{\Delta} \underset{\text{প্রোপান্যামাইড}}{C_2H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-NH_2} + H_2O$$

৩। এসিড ক্লোরাইড গঠন: কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সঙ্গে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড (PCl_5) বা ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড (PCl_3) বা থায়োনিল ক্লোরাইডের $(SOCl_2)$ বিক্রিয়ায় এসিড ক্লোরাইড উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + PCl_5 \longrightarrow \underset{\text{এসিড ক্লোরাইড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl} + POCl_3 + HCl$$

যেমন– $$\underset{\text{ইথানয়িক এসিড}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + PCl_5 \longrightarrow \underset{\text{ইথানয়িল ক্লোরাইড}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-Cl} + POCl_3 + HCl$$

৪। এসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠন : কার্বক্সিলিক এসিডকে ফসফরাস পেন্টক্সাইড (P_2O_5) সহযোগে উত্তপ্ত করলে এসিড অ্যানহাইড্রাইড উৎপন্ন হয়। প্রতি দুই অণু কাবক্সিলিক এসিড থেকে এক অণু পানি নির্গত হওয়ার ফলে এসিড অ্যানহাইড্রাইড গঠিত হয়।

$$\underbrace{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + HO-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R}_{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}} \xrightarrow{P_2O_5,\,\Delta} \underset{\text{এসিড অ্যানহাইড্রাইড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-R} + H_2O$$

যেমন– $$\underbrace{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH + HO-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3}_{\text{ইথানয়িক এসিড}} \xrightarrow{P_2O_5,\,\Delta} \underset{\text{ইথানয়িক অ্যানহাইড্রাইড}}{CH_3-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-O-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-CH_3} + H_2O$$

(গ) কার্বনিল গ্রুপের বিক্রিয়া : বিজারণ বিক্রিয়া : কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের তীব্র বিজারক দ্রব্য যথা লিথিয়াম টেট্রাহাইড্রিডো অ্যালুমিনেট ($LiAlH_4$) অথবা কপার ক্রোমাইট ($CuCr_2O_4$) প্রভাবকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা বিজারিত করলে প্রাইমারি অ্যালকোহল উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{কার্বক্সিলিক এসিড}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + 4[H] \xrightarrow{LiAlH_4 \text{ or } CuCr_2O_4} \underset{\text{প্রাইমারি অ্যালকোহল}}{R-CH_2OH}$$

$$\underset{\text{প্রোপানয়িক এসিড}}{C_2H_5-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-OH} + 4[H] \xrightarrow{LiAlH_4 \text{ or } CuCr_2O_4} \underset{\text{প্রোপানল}}{C_2H_5-CH_2OH}$$

(ঘ) কার্বক্সিল গ্রুপের বিক্রিয়া: ডিকার্বক্সিলেশন বিক্রিয়া অর্থাৎ কার্বক্সিল গ্রুপের অপসারণ :

১। ফরমিক এসিড ছাড়া অন্যান্য কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডালাইম সহযোগে উত্তপ্ত করলে কার্বন ডাই-অক্সাইড নির্গত হয় এবং অ্যালকেন উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন অ্যালকেনে প্রারম্ভিক কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের অপেক্ষা একটি কার্বন পরমাণু কম থাকে।

$$\underset{\text{সোডিয়াম কার্বক্সিলেট}}{R-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa} + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} \underset{\text{অ্যালকেন}}{R-H} + Na_2CO_3$$

$$\underset{\text{সোডিয়াম প্রোপানয়েট}}{CH_3CH_2-\overset{\overset{O}{\|}}{C}-ONa} + NaOH \xrightarrow{CaO,\ \Delta} \underset{\text{ইথেন}}{CH_3-CH_3} + Na_2CO_3$$

১০.৬ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন (Aromatic Hydrocarbons)

অ্যারোমেটিক (aromatic) শব্দটির উৎপত্তি গ্রিক শব্দ অ্যারোমা (aroma, সুমিষ্ট গন্ধ) হতে। সাধারণভাবে বেনজিন এবং বেনজিনের সমধর্মী অর্থাৎ বেনজিনের ধর্ম এবং আকৃতি সদৃশ সকল যৌগই অ্যারোমেটিক যৌগ হিসেবে পরিচিত। প্রাচীন সংজ্ঞা অনুযায়ী, যে সকল জৈব যৌগ সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত এবং গঠনে অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন হতে ভিন্ন প্রকৃতির তাদের **অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন** (aromatic hydrocarbon) বলে। পূর্বে মৌরীর নির্যাস, অয়েল অব উইন্টার গিন (oil of wintergreen) প্রভৃতি সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত হওয়ায় এদেরকে **অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন** বলা হতো। আধুনিক ধারণা অনুযায়ী, **বেনজিন ও বেনজিনের জাতক ও বিশেষ ধরনের অসম্পৃক্ততা বিশিষ্ট বলয়াকার সমধর্মী জৈব যৌগসমূহকে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বলে।** যেমন– বেনজিন, ন্যাপথালিন ইত্যাদি।

বেনজিনের সাধারণ প্রস্তুত প্রণালি :

১। সোডিয়াম বেনজয়েটকে সোডালাইম দ্বারা পাতন করলে বেনজিনকে পাতিত তরল হিসেবে পাওয়া যায়।

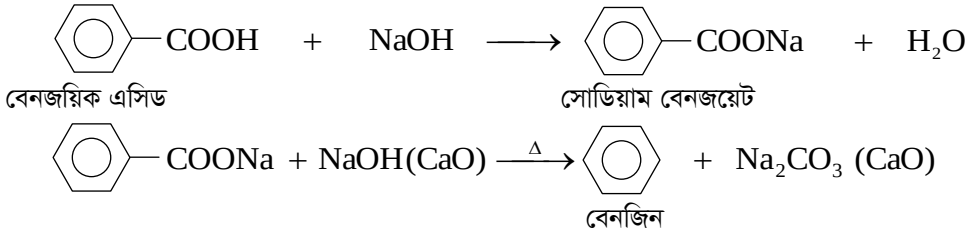

২। ফেনলকে Zn-চূর্ণের সাথে পাতন করলে বেনজিন উৎপন্ন হয়।

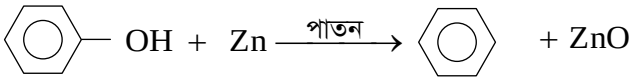

বেনজিন

অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of aromatic hydrocarbon)

১। যৌগগুলি অবশ্যই চাক্রিক ও সমতলীয় হতে হবে। যেমন–

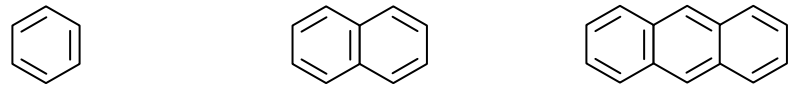

বেনজিন ন্যাপথালিন অ্যানথ্রাসিন

২। এ জাতীয় যৌগের অসম্পৃক্ততা বিশেষ ধরনের। অর্থাৎ অ্যারোমেটিক অসম্পৃক্ততা অ্যালকিনের মতো নয়। বিশেষ শর্তে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন H_2, X_2 বা O_3-এর সাথে সংযোজন বিক্রিয়া করলেও অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের মতো HX, HOX বা H_2SO_4 এর সংযোজন বিক্রিয়া ঘটে না। অ্যালকিন বা অ্যালকাইনের মতো অ্যারোমেটিক যৌগসমূহ ক্ষারীয় $KMnO_4$-এর সাথে বিক্রিয়া করে না।

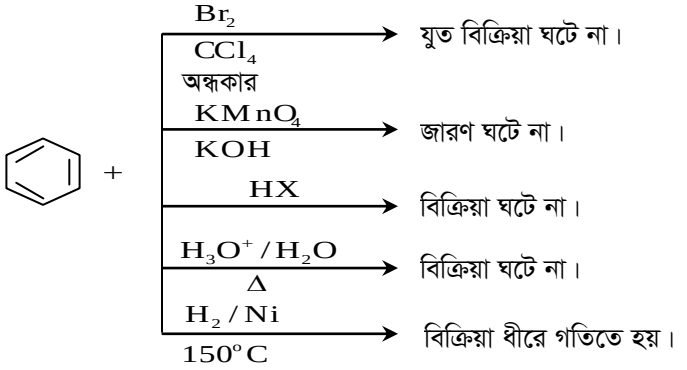

৩। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনসমূহে π আণবিক অরবিটাল থাকে।

৪। হাকেল নীতি অনুসারে, এই π–আণবিক অরবিটালে অবশ্যই $(4n+2)$ সংখ্যক π (পাই) ইলেকট্রন থাকে। এখানে n-এর মান 1, 2, 3..... ইত্যাদি পূর্ণ সংখ্যা। নিচে হাকেল নীতি প্রয়োগ করে কোনো চাক্রিক যৌগ অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন তা ব্যাখ্যা করা হলো (সারণি ২.৮)।

সারণি : জৈব যৌগের ওপর হাকেল নিয়মের প্রয়োগ

জৈব অণু বা আয়নের গাঠনিক সংকেত	অণুতে π ইলেকট্রন সংখ্যা	জৈব অণু বা আয়নের ওপর হাকেল নিয়মের প্রয়োগ	মন্তব্য
বেনজিন	6	$4n + 2 = 6$ বা $4n = 6-2 = 4$ বা $n = 1$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
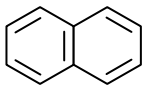 ন্যাপথালিন	10	$4n + 2 = 10$ বা $4n = 10-2 = 8$ বা $n = 2$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন

সাইক্লোবিউটাডাইন	4	$4n + 2 = 4$ বা $4n = 4-2 = 2$ বা $n = \frac{1}{2}$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নয়।
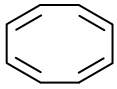 সাইক্লোঅকটাটেট্রাইন	8	$4n + 2 = 8$ বা $4n = 8-2 = 6$ বা $n = 1\frac{1}{2}$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নয়।
সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল অ্যানায়ন	6	$4n + 2 = 6$ বা $4n = 6-2 = 4$ বা $n = 1$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন
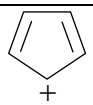 সাইক্লোপেন্টাডাইনাইল ক্যাটায়ন	4	$4n + 2 = 4$ বা $4n = 4-2 = 2$ বা $n = \frac{1}{2}$	অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নয়।

৫। অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন রেজোন্যান্স দেখায়। যেমন,

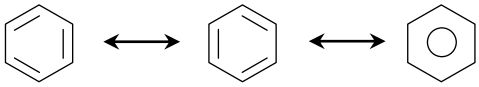

৬। সকল অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন যৌগের উৎস পেট্রোলিয়াম বা কয়লা।

সকল অ্যারোমেটিক যৌগ সুগন্ধবিশিষ্ট নয়। আবার সকল অ্যালিফেটিক যৌগ বিশ্রী গন্ধযুক্ত নয়। অর্থাৎ কিছু সংখ্যক অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন বিশ্রী গন্ধবিশিষ্ট এবং কিছু সংখ্যক অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন সুগন্ধবিশিষ্ট হয়ে থাকে। তাই অ্যারোমেটিক শব্দটির আভিধানিক অর্থের চেয়ে তাদের বৈশিষ্ট্য অ্যারোমেটিক যৌগের ক্ষেত্রে বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

অ্যারোমেটিক যৌগের প্রথম সদস্য হলো বেনজিন। তাই বেনজিনের সাধারণ প্রস্তুতি ও কিছু ধর্ম বর্ণনা করা হলো।

ভৌত ধর্ম : বেনজিন একটি তরল পদার্থ। এর স্ফুটনাংক 80^oC। অন্যান্য অ্যারিনসমূহ বেশ বিষাক্ত এবং ক্যান্সার সৃষ্টিকারক। বেনজিন প্রধানত ইকেট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে। এছাড়া উপযুক্ত শর্তে সংযোজন বিক্রিয়াও প্রদর্শন করে ।

ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া (Electrophilic substitution reaction)

বেনজিন ও অন্যান্য অ্যারোমেটিক যৌগ ইলেক্ট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।

বেনজিন চক্রে চার প্রকার প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া ঘটে। যথা : (১) নাইট্রেশন, (২) সালফোনেশন, (৩) হ্যালোজেনেশন ও (৪) ফ্রিডেল-ক্র্যাফট বিক্রিয়া (Friedel-Craft reaction)।

১। নাইট্রেশন : যে বিক্রিয়ায় বেনজিন অণুর হাইড্রোজেন পরমাণুকে নাইট্রোমূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করে নাইট্রো যৌগে পরিণত করা হয় তাকে নাইট্রেশন বলে।

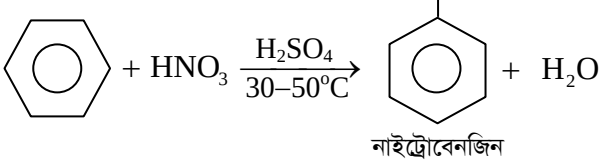

নাইট্রোবেনজিন

নাইট্রেশন তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়। যথা :

(i) ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক, নাইট্রোনিয়াম আয়ন (NO_2^+) গঠন :

$$H^+ + HSO_4^- = H_2SO_4$$

$$HNO_3 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons NO_2^+ + H_3O^+ + 2HSO_4^-$$

এখানে, H_2SO_4, নাইট্রিক এসিড অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী অম্ল হওয়ায় নাইট্রিক এসিডকে প্রোটন দেয়। এ প্রোটনের উদ্দেশ্যে HNO_3 হাইড্রক্সিল আয়ন ত্যাগ করে এবং নাইট্রোনিয়াম আয়ন গঠিত হয়।

(ii) কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন : গঠিত নাইট্রোনিয়াম আয়ন একটি ইলেকট্রন-আকর্ষী বিকারক। এটি বেনজিনের সঞ্চরণশীল ইলেকট্রন বলয় দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তার সঙ্গে যুক্ত হয় এবং একটি অন্তবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন করে।

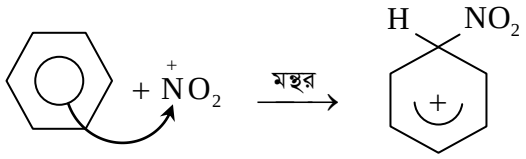

(iii) কার্বোনিয়াম আয়ন থেকে প্রোটন অপসারণ : উৎপন্ন মধ্যবর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন প্রোটন ত্যাগ করে নাইট্রোবেনজিনে পরিণত হয় এবং অপসারিত প্রোটন HSO_4^- এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পুনরায় H_2SO_4, গঠন করে।

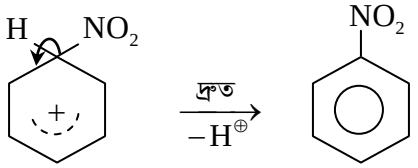

নাইট্রোবেনজিন

২। সালফোনেশন (Sulphonation) : বেনজিন অণু থেকে $-H$ কে $-SO_3H$ মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপন করার প্রক্রিয়াকে **সালফোনেশন** বলে।

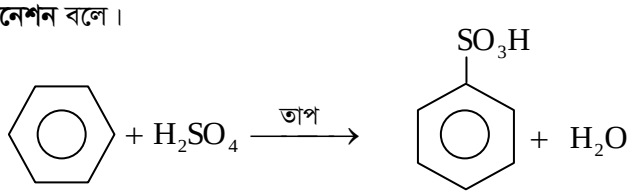

বেনজিন বেনজিন সালফোনিক এসিড

৩। হ্যালোজেনেশন : যে বিক্রিয়ায় বেনজিন চক্রের $-H$ কে $-Cl$ বা $-Br$ দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয় তাকে হ্যালোজেনেশন বলে। তিনটি ধাপে হ্যালোজেনেশন বিক্রিয়া ঘটে।

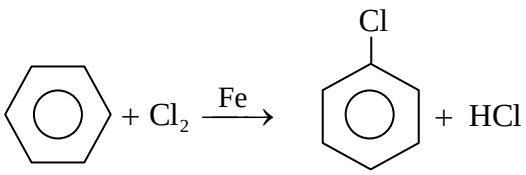

ক্লোরোবেনজিন

৪। **ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া (Friedel-Craft Alkjlation reaction) :** যে বিক্রিয়ায় বেনজিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি অ্যালকাইল মূলক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে অ্যালকাইল বেনজিন যৌগে পরিণত হয় তাকে **ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যালকাইলেশন বিক্রিয়া** বলে। এ বিক্রিয়ায় R দ্বারা H পরমাণুর প্রতিস্থাপন হয়। এখানে লুইস এসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকাইল হ্যালাইডের সাথে বেনজিনের বিক্রিয়া ঘটানো হয়। উদাহরণস্বরূপ, মিথাইল ক্লোরাইডের সাথে বেনজিন যোগ করে অনার্দ্র $AlCl_3$-এর উপস্থিতিতে বিক্রিয়ায় মিথাইল বেনজিন বা টলুইন প্রস্তুত করা যায়।

$$\overset{\delta+}{Cl} \mid \overset{\delta-}{Cl} + FeCl_3 \rightleftharpoons \underset{\text{ক্লোরোনিয়াম আয়ন}}{Cl^+} + FeCl_4^-$$

(ক) অ্যালকাইলেশন (alkylation) বিক্রিয়ার কৌশল : নিম্নের তিনটি ধাপে বিক্রিয়াটি ঘটে।

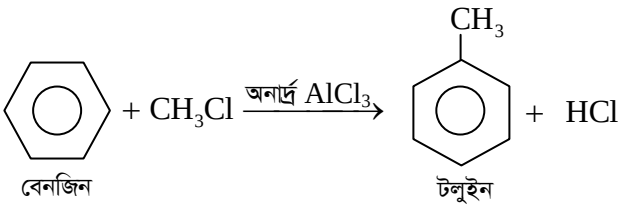

(i) ইলেকট্রন-আকর্ষী বিকারক গঠন : অ্যালকাইল হ্যালাইড ও লুইস এসিডের $(AlCl_3, FeBr_3)$ বিক্রিয়ায় ইলেকট্রন-আকর্ষী বিকারক R^+ গঠিত হয়।

$$R-Cl + AlCl_3 \rightleftharpoons R^+ + \bar{Al}Cl_4$$

(ii) কার্বোনিয়াম আয়ন গঠন : বেনজিন চক্রে ইলেকট্রনাকর্ষী বিকারক R^+ এর আক্রমণ দ্বারা কার্বোনিয়াম আয়ন গঠিত হয়।

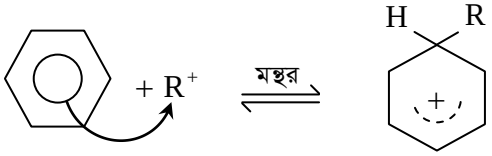

(iii) বেনজিন বলয় থেকে প্রোটন অপসারণ : অন্তর্বর্তী কার্বোনিয়াম আয়ন থেকে প্রোটন অপসারিত হয়ে অ্যালকাইল প্রতিস্থাপিত জাতক উৎপন্ন হয়।

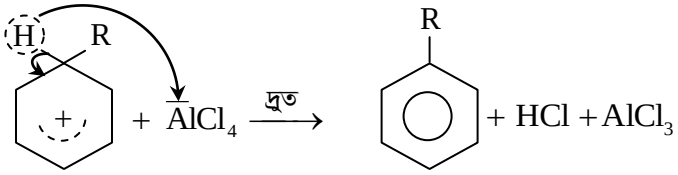

ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া : দ্বিতীয় প্রকারের ফ্রিডেল-ক্রাফট বিক্রিয়ার উদাহরণ হলো **ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া**। অনার্দ্র লুইস এসিডের উপস্থিতিতে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বনের সাথে অ্যালকাইল হ্যালাইডের বিক্রিয়ায় অ্যাসাইল মূলক প্রতিস্থাপিত হলে তাকে **ফ্রিডেল-ক্রাফট অ্যাসাইলেশন বিক্রিয়া** বলে। উদাহরণস্বরূপ বেনজিনের সাথে মিথাইল কার্বনিল ক্লোরাইড অনার্দ্র $AlCl_3$ প্রভাবকের উপস্থিতিতে অ্যাসিটোফেনোনে পরিণত হয়।

(ii) অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক যুত বিক্রিয়া

(i) হাইড্রোজেন সংযোজন : 200^0C তাপমাত্রায় সূক্ষ্ম নিকেল চূর্ণের সংস্পর্শে বেনজিন বাষ্প তিনটি হাইড্রোজেন অণু সংযোজিত করে সাইক্লোহেক্সেন উৎপন্ন করে।

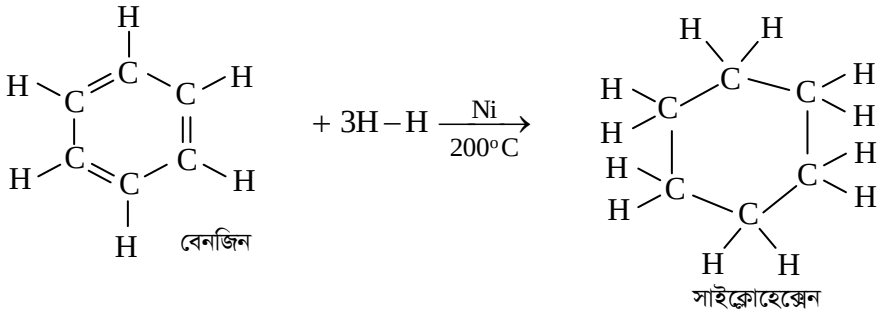

বেনজিন

সাইক্লোহেক্সেন

(ii) হ্যালোজেন সংযোজন : উজ্জ্বল সূর্যালোকে অথবা অতিবেগুনী রশ্মির উপস্থিতিতে বেনজিন অণু তিনটি ক্লোরিন অণুকে সংযোজিত করে বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড নামক তীব্র জীবাণুনাশক উৎপন্ন করে।

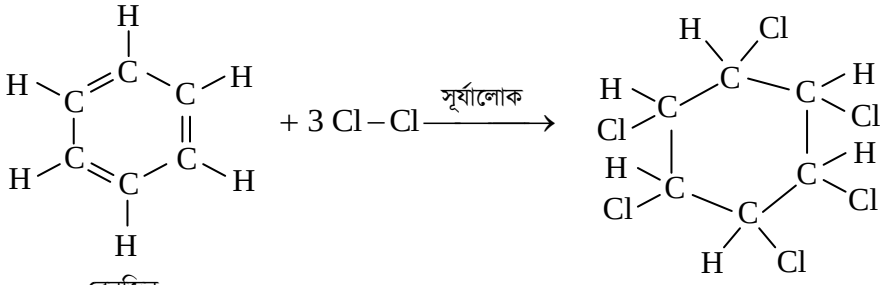

বেনজিন

বেনজিন হেক্সাক্লোরাইড

(iii) ওজোনীকরণ : এক অণু বেনজিন তিন অণু ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে বলে বেনজিন অণুতে তিনটি কার্বন-কার্বন দ্বিবন্ধন রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। বেনজিন প্রথমে ওজোনের সাথে বিক্রিয়া করে বেনজিন ট্রাই-ওজোনাইড গঠন করে। পরবর্তীতে ওজোনাইড যৌগটি আর্দ্র-বিশ্লেষিত হয়ে গ্লাইঅক্সাল গঠন করে।

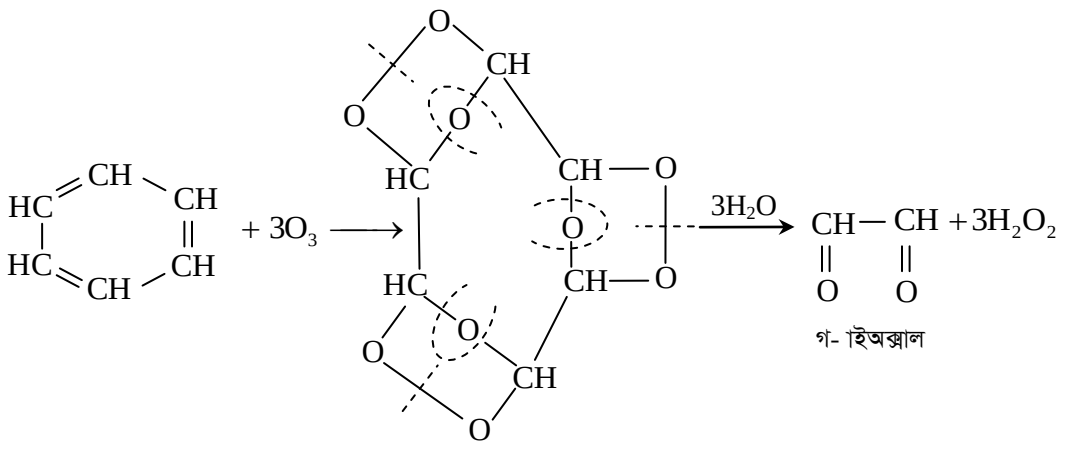

বেনজিনট্রাইওজোনাইড

গ- াইঅক্সাল

উপরিউক্ত তিনটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় যে, বেনজিন অণুতে **তিনটি** কার্বন-কার্বন দ্বি-বন্ধন বিদ্যমান।

সক্রিয়কারী ও নিষ্ক্রিয়কারী মূলক (Activating and Deactiving Groups)

প্রতিস্থাপিত বেনজিন যৌগে বিদ্যমান প্রতিস্থাপকের প্রভাবে অ্যারোমেটিক যৌগের ইলেকট্রোফিলিক প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া সংঘটিত হয়।

যে সকল মূলক বেনজিন চক্রে ইলেকট্রন দান করে চক্রে ইলেকট্রনের ঘনত্ব বৃদ্ধি করে, তাদেরকে **সক্রিয়কারী মূলক** বলে। যথা, $R-$, $-NH_2$, $-OH$ ইত্যাদি। চক্র-সক্রিয়কারী মূলকের উপস্থিতির দরুন যৌগটির অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় বলে ঐ সকল মূলককে **'o – এবং p – নির্দেশক মূলক'ও** বলে।

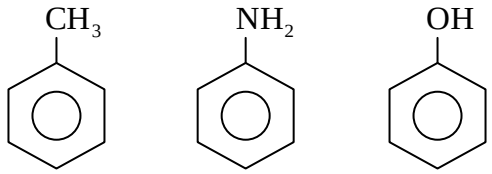

টলুইন অ্যানিলিন ফেনল

; o এবং p অবস্থানের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়ে উৎপাদ তৈরি হয়।

নিষ্ক্রিয়কারী মূলক

প্রতিস্থাপিত বেনজিন যৌগে বিদ্যমান মূলক বা পরমাণু যারা চক্রে বিদ্যমান থেকে চক্র থেকে ইলেকট্রন নিজের দিকে টেনে চক্রের ইলেকট্রন ঘনত্ব হ্রাস করে তাদের **নিষ্ক্রিয়কারী মূলক** বলে। যথা, $-COOH, -CN, -SO_3H, -NO_2$ ইত্যাদি। চক্র নিষ্ক্রিয়কারী মূলকের উপস্থিতির দরুন চক্রের মেটা অবস্থানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি থাকে বলে এদের **মেটা-নির্দেশক মূলক** বলে। তখন রাসায়নিক বিক্রিয়াকালে m -অবস্থানে ইলেকট্রোফাইল এই অবস্থানে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপিত করে।

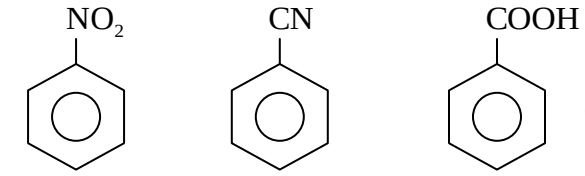

নাইট্রোবেনজিন সায়ানো বেনজিন বেনজয়িক এসিড

এরা m- অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ইলেক্ট্রন ঘনত্ব হ্রাস পায়। ফলে তুলনামূলকভাবে অবস্থানের হাইড্রোজেন প্রতিস্থাপক দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয় উৎপাদ তৈরি হয়।

সারণি ১০.৫ : অর্থো প্যারা এবং মেটা নির্দেশক

অর্থো ও প্যারা নির্দেশক	মেটা নির্দেশক
$-NH_2$ ($-NHR$, $-NR_2$),	$-NO_2, -\overset{+}{N}(CH_3)_3, -CN$
$-OH$ তীব্র সক্রিয়কারী গ্রুপ	$-COOH, -COOR, -SO_3H$
$-OCH_3$, OC_2H_5, $-NHCOCH_3$ মধ্যম মাত্রার সক্রিয়কারী গ্রুপ	$-CHO, -COR$
$-C_6H_5, -CH_3, -C_2H_5$ মৃদু সক্রিয়কারী গ্রুপ	$-F, -Cl, -Br, -I$,

তথ্যসূত্র এবং গ্রন্থপঞ্জি

Ajmatgir, W. M., Hossain, M. I., Islam, M. M., & Khanom, N. (2018). *Chemistry: Classes Nine-Ten*. Dhaka: National Curriculum and Textbook Board.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1989). Science for All Americans Online. Retrieved 27 October, 2007, from http://www.project2061.org/publications/sfaa/online/chap1.htm

Catherine, M. (2012). What is Science? In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 3-22). Sydney: Allen & Unwin.

Chowdhury, K., Ahmad, Q. K., Kabir, S. E., Shahidullah, K., Rashid, R. I. M. A., Halim, S., et al. (2010). *National Education Policy 2010*.

Goodrum, D., & Druhan, A. (2012).Teaching Strategies for science classroom. In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 63-82). Sydney: Allen & Unwin.

Hackling, M. W. (2012). Inquiry and Investigation in science. In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 104-121). Sydney: Allen & Unwin.

Hackling, M. W., & Fairbrother, R. W. (1996). Helping students to do open investigations in science. *Australian Science Teachers Journal, 42*(4), 26-33.

Halstead, J. M. (1996). Values and values education in schools. In J. M. Halstead & M. J. Taylor (Eds.), *Values in Education and Education in Values* (pp. 3-14). London: The Falmer Press.

Hassard, J. (2004). *The Art of Teaching Science: Inquiry and Innovation in Middle School and High School*. Oxford: Oxford University Press.

Johnstone, A. H., & Al-Shuaili, A. (2001). Learning in the laboratory; some thoughts from the literature. *University Chemistry Education, 5*, 42-50.

King, D. (2012). Planning in secondary science. In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 84-103). Sydney: Allen & Unwin.

Lederman, N. G., & Lederman, J. S. (2004).The nature of science and scientific inquiry. In V. Dawson & G. Venvile (Eds.), *The Art of Teaching Science* (pp. 2-17). Crows Nest: Allen & Unwin.

McComas, W. F. (1998). The nature of science in international science education standard documents. In W. F. McComas (Ed.), *The nature of science in science education: Rationales and Strategies* (pp. 41-52). Boston: Kluwer Academic Publishers.

National Curriculum and Textbook Board [NCTB]. (2012). *Science Curriculum*. Retrieved from www.nctb.gov.bd/index.php/curriculum-wing/.

O'Brien, G. E. (2006). Develping Inquiry Skills. In J. M. Peters & D. L. Stout (Eds.), *Science in Elementary Education: Methods, Concepts, and Inquiries* (pp. 81-109). Upper saddle river: Pearson, Merill, and Prentice Hall.

OECD. (2006). *Assessing Scientific, Reading and Mathematical Literacy*. from https://www.oecd-ilibrary.org/content/publication/9789264026407-en

Shulman, L. S. (1986). Those who understand: Knowledge growth in teaching. *Educational Researcher* 4-14. (AERA Presidential Address).

Smith, R. R. (2006). Just a Theory: Exploring the Nature of Science. *Journal of college science teaching*, *35*(5), 58.

Sultana, O., & Siddique, M. N. A. (2014).Teachers' Understanding and views on teaching science outside classroom.*Teachers' World*, *40*, 35-46.

Treagust, D., & Duit, R. (2012).Conceptual change learning and teaching.In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 41-61). Sydney: Allen & Unwin.

Tytler, R. (2012). Constructivist and socio-cultural views of teaching and learning. In G. Venvile & V. Dawson (Eds.), *The Art of Teaching Science for middle and secondary school* (pp. 23-40). Sydney: Allen & Unwin.